রবীন্দ্র রচনা
প.বাংলা সরকার

কৈফিয়ৎ

এ-গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি নানান বিদেশী পুস্তক থেকে, তার তালিকাটি বৃহৎ এবং তার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। যে কয়জন লেখক বা প্রকাশকের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী তাঁদেরই উল্লেখ শুধু করলাম। বিভিন্ন বৈমানিক, বিশেষজ্ঞ বা পাইলটের কথা আমি বলেছি গল্পের ছলে—বলাবাহুল্য ঘটনার সংস্থাপন, সংলাপ ইত্যাদি আমাকে অনেক ক্ষেত্রে কল্পনা করে নিতে হয়েছে। তা বলে কোন ঐতিহাসিক তথ্য আমি জ্ঞাতসারে বিকৃত করিনি, কথা-সাহিত্যের খাতিরে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে স্বর্গতঃ বৈমানিক ক্যাপ্টেন হিলারীর উদ্দেশে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার আছে। তাঁর অমর গ্রন্থ থেকে আমি যেভাবে তথ্য সংকলন ও পরিবেশন করেছি সেটা তাঁর স্মৃতিচারণের মূল সুরের সঙ্গে সুর মেলানো নয়। তাঁর গ্রন্থে বস্তুত নায়িকা ছিলেন পীটার পীস্-এর বাগ্‌দত্তা বধূ ডেনেস। সেই আশ্চর্য মহিলা চরিত্রটির নাম পর্যন্ত আমি উল্লেখ করিনি। যাঁরা রিচার্ড হিলারীর জীবনদর্শনের কথা জানতে চান তাঁরা দয়া করে মূল গ্রন্থটি পড়বেন। এখানে একটি আপাতঃ অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি: The Last Enemy গ্রন্থের প্রকাশক বিলাতের ম্যাকমিলিয়ান কোম্পানী। বইটির প্রথম প্রকাশকাল ১৯৪২। আমি দীর্ঘদিন পূর্বে পড়েছিলাম তার দশম সংস্করণ, ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত। আশ্চর্যের কথা, ঐ বিশ্ব-বিশ্রুত প্রকাশক লেখকের কোন পরিচয় দেননি, এটা কল্পিত উপন্যাস, না বাস্তব স্মৃতিচারণ তা পর্যন্ত কোথাও বলেন নি। এমন কি একথাও বলতে ভুলেছেন যে, হিলারী এ-গ্রন্থ লিখেছেন মাত্র তেইশ বছর বয়সে, সম্ভবত এটি তাঁর একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ এবং লেখক ১৯৪৩-এ বিমান-যুদ্ধে মারা যান। এ সংবাদগুলি জানা না থাকায় প্রথম পাঠকালে আমার কাছে এর রস পূর্ণ উপলব্ধি হয়নি। এ তথ্য জেনেছি তিন বছর পরে, Readers Digest কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ... সং ... Stories of the War, Vol. 1, page 70 থেকে। ... ক ফিরে

বিদেশী নাম বাঙলা বানানে আমি যেভাবে লিখেছিলাম আগে সেভাবে তাঁদের নাম উচ্চারিত হয় না। এ ত্রুটি আমার। জানা না থাকায় এই ত্রুটি হয়ত আমার অজ্ঞাতসারে এ-গ্রন্থে ...

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

(১) The Last Enemy, Richard Hillary, Macmillian & Co. London 1942 (হিলারীর কাহিনী)

(২) The One that Got Away, Kendal Burt and James Leasor (ভন ওয়েরা)

(৩) Death on a D vine Wind, Capt. R Inogudin and Commander T. Nakagima, V. S. Naval Institute, Annapolis Maryland (এ্যাডমিরাল ডানশীর কাহিনী)

(৪) The First Man Across the Channel, Russel A. J (ব্লেরিয়োর কাহিনী)

(৫) The First Man to Fly the Atlantic, Beaumont (এ্যালকক ও ব্রাউন)

(৬) Hers of the Squadron of Death, Astov C C. (ডিক গ্রেস)

(৭) Aircraft Aircraft

(৮) Junior Pictorial Endycloperia, Word, Lock & Co.

(৯) Fifty Great Advantures that Thirlled the World, The Home Libray Club, Bombay

(১০) স্বপ্ন, গিরীন্দ্রশেখর বসু, সাহিত্য পরিষদ

নারায়ণ সান্যাল

২. ১১. ৬৩

'বিহঙ্গ বাসনা'র অগ্রজ :

গজমুক্তা

বকুললতা পি. এল. ক্যাম্প

বল্মীক

ব্রাত্য

মনামী

অন্তর্লীনা

নৈমিষারণ্য

দণ্ডকশবরী

বাস্তু-বিজ্ঞান

নীলিমায় নীল

অলকানন্দা

মহাকালের মন্দির

পথের মহাপ্রস্থান

সত্যকাম

নাগচম্পা

পাষণ্ড পণ্ডিত

অপরূপা অজন্তা

আবার যদি ইচ্ছা কর

তাজের স্বপ্ন

কলিঙ্গের দেবদেউল

'আমি নেতাজীকে দেখেছি'

'আমি রাসবিহারীকে দেখে

নেতাজী রহস্য সন্ধা

জাপান থেকে ফিরে

ওপার বাংলার আগে

কালো কালো

শার্লক

BIHANGA BASANA

A

Bengali Novel

By

Narayan Sanyal

উড়ন্ত মানুষ—জার্মানীর অটো লিলিয়েন্থাল পৃষ্ঠা

রাইট-ব্রাদার্স-এর প্রথম সাফল্য—১৭ ১২.১৯০৩ পৃষ্ঠা—৪৯

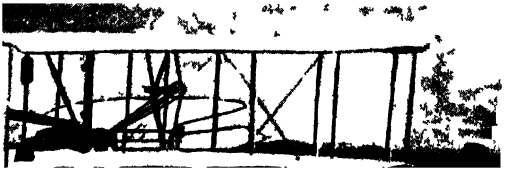

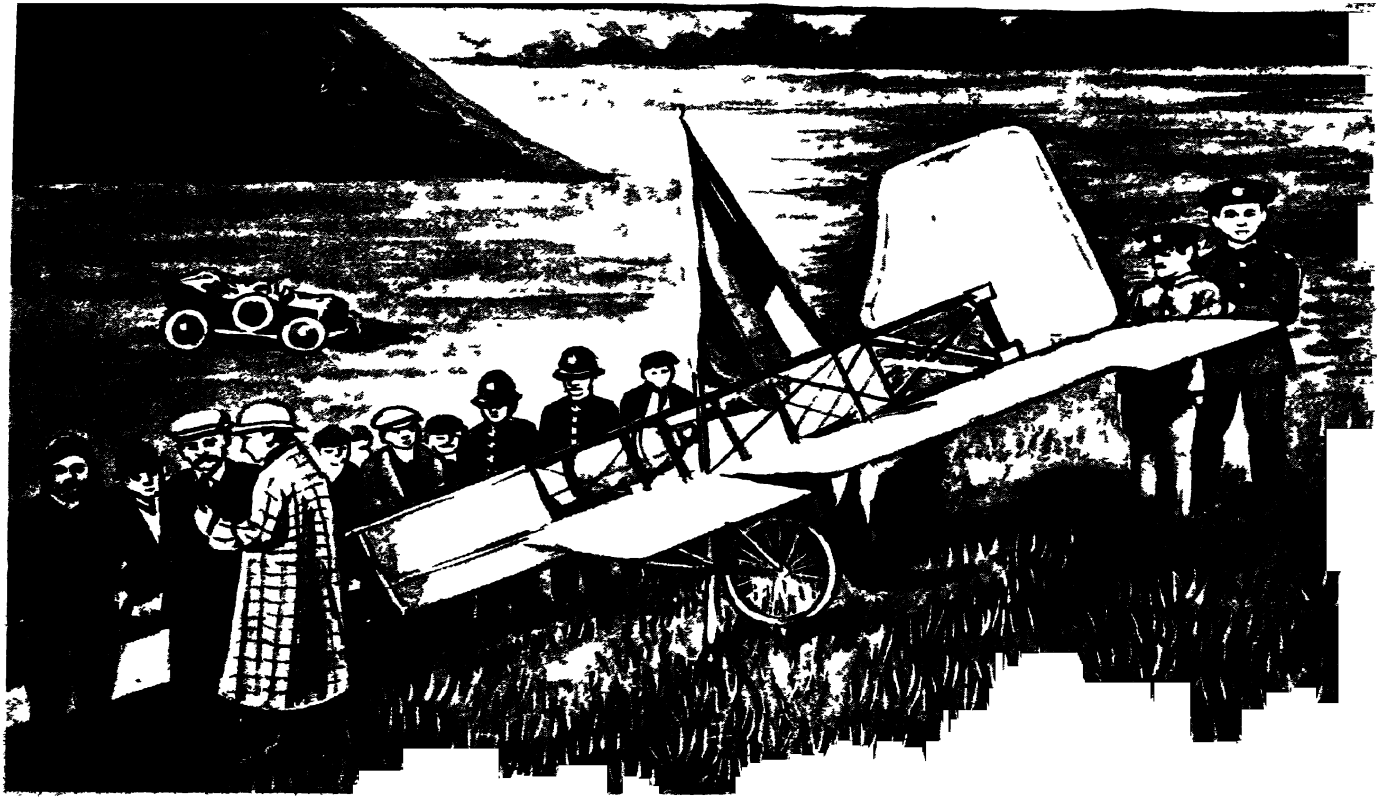

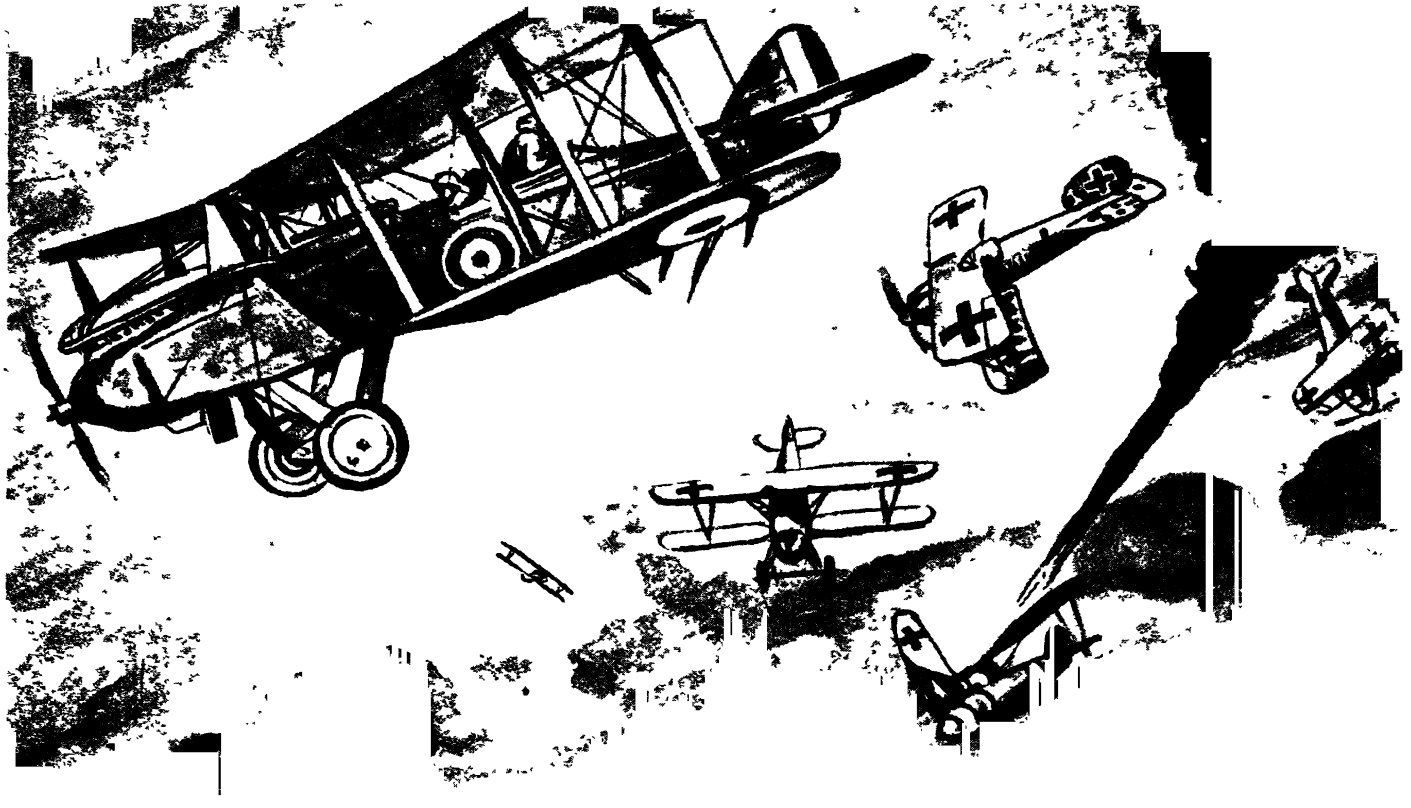

লণ্ডন এয়ারপোর্টে অতলান্তিক মহাসাগর বিজয়ী

[illegible] এবং [illegible] ৫-প্রতি পৃষ্ঠা

In blossom today, then scattered:

Life is so like a delicate flower.

How can one expect the fragrance

To last for ever?

আজ যে ফোটে কাল সে তো হয় লীন,

জীবন-সে যে ফুলের মতো ক্ষীণ!

ভাবছ কি তার গন্ধ অম্লান

রইবে চিরদিন?

জাপানী সেনাপতি তাকিজিরো ওনিশীর লেখা সর্বশেষ তানাকা - হারাকিরি করার পূর্ব-মুহূর্তে রচিত। পৃষ্ঠা -১৭৬

ওমন বেম'নিব—ফাঙ্ক ভন ওযেব

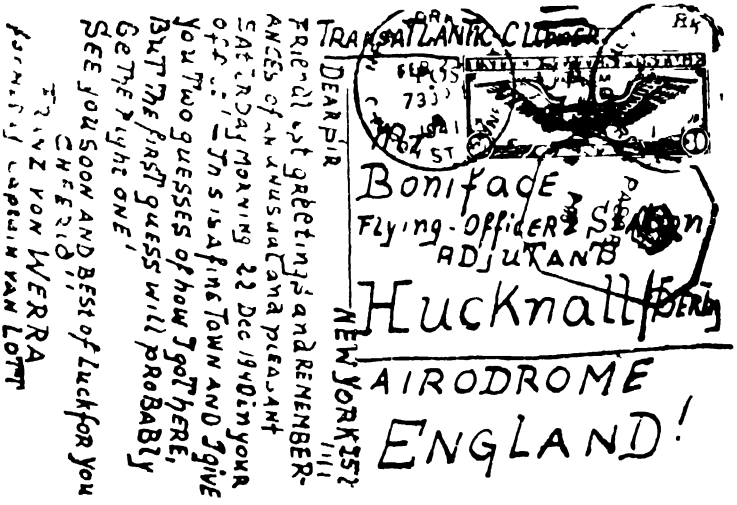

বন্দীশিবিব থেকে পালিযে যাবাব পব
শত্রুপক্ষেব অধিনাযককে লেখা ভন ওযেবাব
নিবাপদ পৌছানোব সংবাদ—পোস্টকার্ড। পৃষ্ঠা—১৮৩

চন্দ্রলোকে পৌঁছে গেল ১১ একটি ছবি চন্দ্রে। (মূল)

আচ্ছা, তোমরাও এমন স্বপ্ন দেখ ?

আমি দেখি। কেমন জান ? দেখি—কোন একটা পাহাড়ের চূড়া কিংবা উঁচু বাড়ির কার্নিস থেকে যেন ঝাঁপ খেয়ে পড়লাম—মাটিতে পড়লাম না কিন্তু। হাল্‌কা একটা মেঘের মত, কিংবা নরম কবুতরের মত বাতাসে দোল খেতে খেতে উড়ে গিয়ে বসলাম একটা উঁচু গাছের মগডালে। একবার নয়, বারে বারে এমন স্বপ্ন দেখি আমি। আমি একাও নয়, আমার জানাশোনা অনেকেই। ব্যাপারটা আমার মনে হয়েছে—হিংটিংছট!

মনস্তত্ত্ববিদ্ বন্ধু বললেন, আকাশে উড়বার একটা গোপন বাসনা লুকিয়ে আছে তোমার মনে, স্বপ্নে তারই তির্যক-প্রকাশ হচ্ছে! অবদমিত কামেচ্ছা!

যতসব বুজরুকি! অমন অদ্ভুত বিহঙ্গবাসনা আমার অবচেতন মনে লুকিয়েই বা থাকতে যাবে কোন্ দুঃখে ? মাটির উপরেই তো দিব্যি আছি, আকাশে উঠে কোন্ চতুর্বর্গ লাভ হবে ?

বৈজ্ঞানিক বন্ধু বললেন, আসলে ব্যাপারটা কি জান—এত সুপ্ত-বাসনা তুমি সজ্ঞানে লাভ করনি। যুগ-যুগান্তের এ একটাত্ত জন্মাতীত কামনা। পনের-বিশ কোটি বছরের—

আমি ধমক দিই, কী বকছ পাগলের মত! পনের-বিশ কোটি বছর! তার মানে বোঝ ?

বন্ধু বলেন, ধৈর্য ধরে শোন আগে। পনের-বিশ কোটি বছর আগে মানুষ তো ছাড়, আদিমতম স্তন্যপায়ী জীব প্যাণ্টোথেরিয়াই আবির্ভূত হয়নি এ পৃথিবীর বুকে। সেটা জুরাসিক যুগ। বড় বড় ডাইনোসরের—ডিপলোডকাস, ইগুয়ানোডন, স্টেগোসরাস-দের যুগ। সেই তাদের এক জ্ঞাতিভাই আকাশে উড়তে শিখল, তারা ক্রমে হল পাখী; আর এক জ্ঞাতিভাই ডিমপাড়া বন্ধ করে বাচ্ছাকে দুধ খাওয়াতে শিখল—তারা হল

স্তন্যপায়ী। এই দ্বিতীয় শাখার এক মগডালে ক্রমে জন্ম নি
মানুষ। সেই মানুষ আকাশে উড়তে পারে না, কিন্তু পনের-বি
কোটি বছর আগে তার এক জ্ঞাতিভাই যে দক্ষতা অর্জন করেছি
সেটা নাকি সে আজও ভুলতে পারেনি। মাংসাশী জীবের নাগ
থেকে পাখীরা কিভাবে ফুরুৎ করে উড়ে পালিয়ে যায়
সে দেখেছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছে—নিজেও অমনভাবে উড়তে
চেয়েছে। পারেনি। সেই অচরিতার্থ বাসনার বীজ কো
অজানা ক্রমোসমের গুপ্তপথে জন্ম-জন্মান্তরের চক্রাবর্তনে কোটি
কোটি বছর ধরে টিকে আছে মানুষের মনে। কাব্যকথা নয়.
নিতান্ত জৈবিক কারণে, বিবর্তনের পর্যায় হিসাবেই, শত্রুর
হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার তাগিদেই মানুষ ঐ বলাকার পাখার
স্পন্দনে শুনেছে তার হৃদস্পন্দনের অনুরণন, চেয়েছে—'ঐ
শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশেহারা। আকাশের খুঁজিতে
কিনারা'।

মেনে নিতে পারলে এ ব্যাখ্যা? আমি তো পারিনি। কী
হবে আকাশে উড়ে? কী আছে ঐ নিঃসীম নিলীমায়, যা নেই
আমার এই অতিপ্রিয়, অতিপরিচিত মাটির পৃথিবীতে? আমাদের
মূল লক্ষ্য তো আকাশ নয়, এই পৃথিবীই!

তা হোক। মূল লক্ষ্যস্থলটা থাকে তীর্থপথের একেবারে শেষ
প্রান্তে। সেটার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাক আর না থাক পায়ে
পায়ে পথ মাড়িয়ে যাত্রীদলকে ক্রমাগত এগিয়ে চলতে হয় তীর্থের
পথে। শেষ লক্ষ্য নয়, তাকে প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখতে হয় পরবর্তী
পদক্ষেপ। প্রতিটি সোপানই এ যাত্রায় তুল্যমূল্য। যে কোন
ধাপেই পদস্খলন একই মূল্যমানের। এমনিভাবে যাত্রীদল চলেছে
সামনের দিকে। মানবসভ্যতা, মানবসমাজ উন্নততর হতে চায়,
আরও আনন্দঘন করতে চায় তার জীবনের ভোগ। তারই
একটা পর্যায়, একটা বিশেষ সোপান—এই মাটি ছেড়ে আকাশে
ওঠার প্রয়াস। তা উঠেছে, অনেকটা উঠেছে এতদিনে। মাটি ছেড়ে

আকাশে, আকাশ ছেড়ে মহাকাশে—গ্রহ ছেড়ে উপগ্রহে! সেই হিসাবটাই খতিয়ে দেখতে বসেছি:

মানুষ আজ আকাশে উড়ছে। প্রচণ্ডভাবে উড়ছে। প্রতিনিয়ত উড়ছে। সারা পৃথিবীতে আজ দিনে-রাতে প্রতি তিন সেকেণ্ডে একটা-না-একটা যাত্রীবাহী আকাশযান মাটির বন্ধন ছিঁড়ে আকাশের কিনারা খুঁজতে বের হচ্ছে! উপরে উঠতে উঠতে সে চাঁদে পৌঁছে গেছে—অচিরে হয়তো সে লিখতে বসবে 'স্পেস ওডিসি'-র মহাকাব্য। যাবে অন্যান্য গ্রহে! না হোক দশ লক্ষ যাত্রী আজ দৈনিক আকাশে পাড়ি জমাচ্ছে। প্রতি মাসে সারা পৃথিবীর যাত্রীবাহী প্লেন চার হাজার কোটি মাইলের উপর আকাশ-পথ পাড়ি দিচ্ছে। চার হাজার কোটি মাইল! দূরত্বটা আন্দাজ হল? সাদা বাঙলায় তার মানে দাঁড়াল প্রায় হাজার বার চাঁদে যাতায়াতের রিটার্ণ টিকিট! প্রতি মাসে!

কিন্তু এটা তো এই বিংশ শতকেব শেষপাদের খতিয়ান। তার আগে? তার আগে মানুষ যে কতবার উড়বার চেষ্টা করে ঘাড় গুঁজবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তার হিসাব কে রাখে? আজ যে দুর্লভ সৌভাগ্য তুমি-আমি ভোগ করছি, জাম্বো-জেটের আরামদায়ক আসনে সিনেমা দেখতে দেখতে রাতারাতি মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছি তার পিছনে কত মানুষের কত পরিশ্রম, কত রক্তক্ষয়ী বীভৎস মৃত্যুর ইতিহাস জমা হয়ে আছে আমরা কি তা খতিয়ে দেখি? সকলের সবকথা ইতিহাসেও লেখা নেই—তবু যাঁদের কথা খুঁজে পাচ্ছি তাঁদের কথাই বলা যাক:

কিন্তু ইতিহাসের আগে বলতে হয় পুরাণ আর মহাকাব্যের কথা। এয়ার-মার্শাল ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে 'ইরম্মদ' নামে হাইড্রোজেন বোমা ছুঁড়তেন; গরুড়ের পিঠে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে স্বয়ং নারায়ণ মর্ত্যলোকে ট্যুরে আসতেন; শ্রীরামচন্দ্র সস্ত্রীক কলম্বো এয়ারপোর্ট থেকে পুষ্পকরথে আসতে আসতেই নাকি বলেছিলেন

নবকুমার কর্তৃক উদ্ধৃত সেই অনবদ্য শ্লোকটি : দূরাদয়শ্চক্রনিভস্তন্বী তমালতালী বনরাজী নীলা—

শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর নানান দেশের প্রাচীন সভ্যতার লোকগাথায় আকাশে ওড়ার বর্ণনা আমরা পেয়েছি। চীনে, মিশরে, গ্রীসে। ক্রীটদ্বীপের রাজা মিনস্-এর কারাগার থেকে বন্দী পিতাপুত্র কী-ভাবে আকাশপথে সিসিলিতে উড়ে আসবার চেষ্টা করেছিলেন তার বর্ণনা রেখে গেছেন এক গ্রীক কথাকোবিদ। সে বর্ণনায় দেখা গেছে পিতা দায়েদালাস নিরাপদে গন্তব্যস্থলে উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু পুত্র ইকারাস তা পারেননি। ইকারাস উড়তে উড়তে নাকি সূর্যের খুব কাছাকাছি গিয়ে পড়েন—ফলে তাঁর পাখা পুড়ে যায়, তিনি সমুদ্রগর্ভে সলিল-সমাধি লাভ করেন। অর্থাৎ গ্রীক উপকথার সংখ্যাতত্ত্ব ইঙ্গিত দিচ্ছে—আকাশমার্গে বিচরণের সম্ভাবনায় শতকরা পঞ্চাশভাগ সাফল্য আশা করা চলে!

দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐতিহাসিক যুগে ঐ শতকরা সাফল্যের হার বজায় রইল না। পিতার চেয়ে পুত্রের ভাগ্যই যেন ওদের বেশি করে টানত। ধরা যাক গ্রেট-ব্রিটেনের একটি প্রাচীন লোকগাথার কথা। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে ইংল্যাণ্ডের এক পৌরাণিক রাজা—মহারাজ ব্লাদুদ নাকি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই ব্লাদুদই নাকি বাথ-নগরী স্থাপন করেন এবং লিঙ্কনশায়ারের স্টামফোর্ডে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। সে আমলে লণ্ডন-শহরের যা নাম ছিল তা শুনলে মনে হবে লণ্ডন বুঝি দক্ষিণ-ভারতের কোন গণ্ডগ্রাম! লণ্ডনের তদানীন্তন নাম: ত্রিনাভেণ্ডাম। সেখানে ছিল অ্যাপোলো-দেবের এক সুউচ্চ মন্দির। তার চুড়োয় একদিন উঠলেন রাজা। তাঁর দুই কাঁধে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল পাখীর পালক দিয়ে বানানো দুটো ডানা। রাজামশাই নাকি উড়বেন! বহু দর্শক সমবেত হল মন্দির-চত্বরে। মদের পাত্র হাতে নিয়ে রাজা-মহারাজার দল সর্বযুগেই হামেহাল উড়েছেন; কিন্তু এমন আক্ষরিক অর্থে কোন

রাজাকে কে কবে উড়তে দেখেছে? তাই ভীড়টা হয়েছে প্রচণ্ড। সর্বসমক্ষে মন্দিরশীর্ষ থেকে রাজামশাই লাফ দিলেন—আকাশে দুই ডানা মেলে দিয়ে। দুর্ভাগ্য তাঁর—তুমি-আমি স্বপ্নে যেভাবে উড়ে যাই সেভাবে উড়তে পারলেন না! সোজা নেমে এসে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়লেন মন্দির-চত্বরের কঠিন পাষাণে। পাত্রমিত্র লোকজন ছুটে এসে দেখল রাজার মৃত্যু হয়েছে মুহূর্তমধ্যে! তবে নাকি ইংলণ্ডেশ্বরের মৃত্যু নেই, তাই তৎক্ষণাৎ অ্যাপোলো মন্দিরের ইন্দ্রকোষের ভিতর থেকে নকিব ঘোষণা করল: দ্য কিং ইস ডেড! লঙ লীভ দ্য কিং!

সিংহাসনে উঠে বসলেন ব্লাদুদের পুত্র লীয়র।

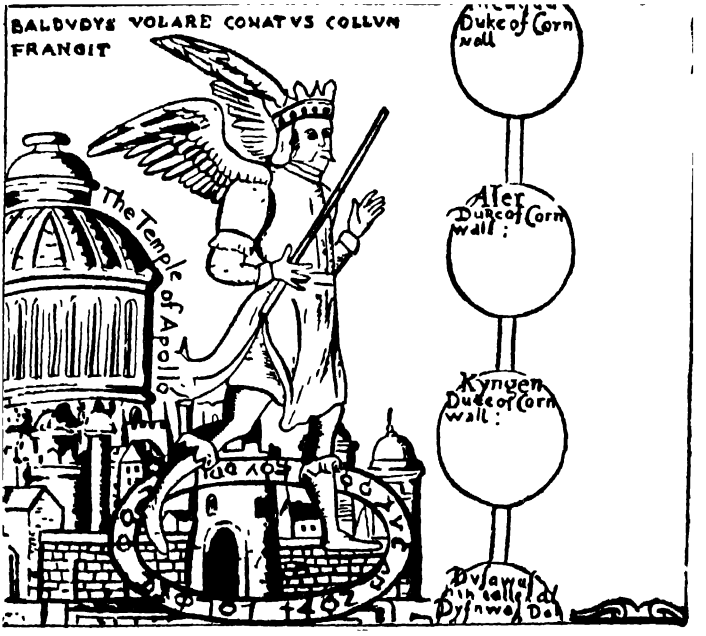

চিত্র—১

উড্ডীয়মান ইংলণ্ডেশ্বর ব্লাদুদ

আমাদের অপরিচিত নন এই নবাগত রাজা। সেক্সপীয়রের কল্যাণে সারা দুনিয়া আজ জানে কিং লীয়রের নাম।

গ্রীকবীর ইকারাসের অলৌকিক গল্প বাদ দিলে পৌরাণিক যুগের ঐ কিং লীয়রের পিতা রাজা ব্লাদুদই আকাশ-জয়ের পথে প্রথম শহীদ। এঁর কথাও হয়তো আমরা জানতে পারতাম না, জেনেছি সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ-কবি জন টেলারের কল্যাণে। কবি একটি সুপ্রাচীন রেকর্ডে ইংলণ্ডেশ্বরের এই মর্মান্তিক উল্লম্ফনের চিত্র দেখতে পেয়ে একটি গীতিকবিতা রচনা করেছিলেন। সেই দুর্লভ প্রাচীন চিত্রটির একটি অনুলিপি করে দিলাম এখানে আগের পৃষ্ঠায় (চিত্র—১)। বেশ বোঝা যায়, চিত্রকর অন্তত পঞ্চদশ শতাব্দীর পরের যুগের মানুষ; কারণ অ্যাপোলোর মন্দিরে মিকেলাঞ্জালো পরিকল্পিত সেণ্ট পীটারের গীর্জার ছাপ স্পষ্ট। তিন হাজার বছর আগে ইংলণ্ডেশ্বরের হেপাজতে এমন মন্দির থাকতেই পারে না। তা সে যা-ই হোক, জন টেলর এই মর্মবিদারক কাহিনীটি বর্ণনা করে উপসংহারে প্রাজ্ঞ-জনোচিত একটি নীতিবাক্য যোগ করেন। কবিতার মর্য্যাল : 'মরাল হবার চেষ্টা কর না!' তার এ্যান্টিক্লাইম্যাক্সটুকু মনে রাখবার মত :

"On high the tempests have much power to wreck,
Then best to bide beneath and safest for the neck!"

যার নির্গলিতার্থ :

ঊর্ধ্বে যে উদ্যত বজ্র বিধ্বংসী ঝঞ্ঝার!
অধই উত্তম বন্ধু! মটকাবে না ঘাড়॥

আকাশ-জয়ের স্বপ্নে বিভোর অশান্ত মানুষ কিন্তু কবির এই সাবধানবাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনি। ব্লাদুদের মৃত্যুর দু-হাজার বছর পরে, বস্তুত ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ রাজা ক্যানিউট যখন সমুদ্র শাসন করছেন, সেই আমলে একজন ইংরাজ পাদরী সাল্‌স্‌বেরির অলিভার আবার ঠিক একইভাবে দুই কাঁধে দুই ডানা বেঁধে একটি উঁচু মিনার থেকে ঝাঁপ খেলেন। উড়তে তিনিও পারেননি—তবে প্রাণে মারাও যাননি। প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের একটি পাবলিক হাউসের গায়ে ঐ পাদরীর

দুঃসাহসিক অভিযানের কথা লেখা আছে—বাড়িটার নামও দেওয়া হয়েছে 'দ্য ফ্লাইং মংক'—আকাশচারী পাদরী।

একই সময়ে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে কন্সটান্টিনোপলের একজন দুঃসাহসী বীর নাকি একইভাবে আকাশে উড়বার চেষ্টা করে শহীদ হন। সেই অজ্ঞাতনামা দুঃসাহসী কিন্তু কাঁধে ডানা বাঁধেননি—বেঁধেছিলেন ছাতার মত একটা কিছু, অনেকটা আধুনিক প্যারাসুট জাতীয় কিছু হবে হয়তো। অনেক পরবর্তী যুগে আমেরিকার ক্লেম্ সোহন এবং ফরাসীদেশের লিও ভ্যালেণ্টাইন ঐ-জাতীয় বাদুড়ের ডানা-দিয়ে-তৈরি ছাতার সাহায্যে উঁচু থেকে লাফ মেরে দেখিয়েছিলেন পূর্বসূরী কন্সটান্টিনোপলের বীর কিছু পাগলামী করেননি। তুরস্ক বিশ্বাস করে তাদের একজন অতীতকালের আকাশচারী—হেজার্ফেন সেলেবি সপ্তদশ শতাব্দীতেই একটি গ্লাইডারের সাহায্যে কয়েক কিলোমিটার ভেসে গিয়েছিলেন আকাশে। অতদিন আগে তাঁর ঐ একক কীর্তি মেনে নেওয়া শক্ত, যদিও ১৯৫০ সালে তাঁর কীর্তি স্মরণ করে 'ইস্তাম্বুল সিভিল অ্যাভিয়েশান কংগ্রেস' উপলক্ষে তুরস্ক একটি ডাকটিকিটও প্রচলন করে।

এরপর পর্যায়ক্রমে বলতে হয় রেনেসাঁ-যুগের দিকপাল মনীষী লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির কথা। অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন তিনি। শুধুমাত্র মোনালিসা আর লেনা-উলর্তিমা (লাস্ট সাপার) ছবি আঁকার জন্যই তিনি মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতে পারতেন; কিন্তু লিওনার্দো ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতিবিদ, শরীরতত্ত্ববিদ, যুদ্ধাস্ত্র বিশারদ এবং বিজ্ঞানী। আকাশে উড়বার উপযুক্ত কিছু যন্ত্রের স্কেচ ও ড্রইং তিনি রেখে গেছেন উত্তরকালের উদ্দেশে। অনেকে বলেন তিনিই আকাশযানের প্রথম পরিকল্পনাকার। কথাটা ঠিক নয়। বীরপূজায় অভ্যস্ত আমরা অনেক সময় এমনভাবে মানুষকে বাড়াবার চেষ্টা করি। মনুষ্যদেহে রক্ত-চলাচলের সম্ভাবনাময় কিছু স্কেচও তো তিনি রেখে গেছেন;

কিন্তু রক্ত-চলাচলের প্রকৃত আবিষ্কারক হিসাবে আমরা স্মরণ করি উইলিয়াম হার্ভের নাম। তেমনি আকাশযানের প্রথম পরিকল্পনাকারের সম্মানও দেওয়া যায় না লিওনার্দোকে। তার মানে এ নয় যে, এই সীমিতক্ষেত্রে লিওনার্দোর কোনও অবদান নেই। তা আছে। এ-ক্ষেত্রে তাঁর দান হচ্ছে এই: তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন কাঁধে ডানা জুড়ে বাহুবলের সাহায্যে মানুষ কোনদিনই উড়তে পারবে না। তার বাহুর মাংসপেশী সেভাবে তৈরি নয়। অর্থাৎ যান্ত্রিক সহায়তা ছাড়া আকাশে ওড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মানুষের দেহ আকাশে উড়বার উপযুক্ত নয়। আকাশে উড়বার সময় চড়াইপাখীর হৃদস্পন্দনের হার হয় প্রতি মিনিটে আট শ' বার; সেক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন মিনিটে মাত্র সত্তর বার। লিওনার্দো ছবি এঁকে এবং নোট লিখে বোঝাতে চাইলেন -- যান্ত্রিক সহযোগিতা ছাড়া আকাশে ওড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এজন্য মানুষকে এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে যা প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে নেই। মাটির বুকে গতির ক্ষেত্রে যেমন মানুষ তার পেশীর সাহায্যে হরিণ-ঘোড়া-বাঘের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি— কিন্তু হারও মানেনি; সে উদ্ভাবন করেছে চাকা, যা নাকি প্রকৃতিতে ছিল না! ঠিক তেমনিভাবে মাথা খাটিয়ে তাকে এমন একটা কিছু বার করতে হবে যাতে সে আকাশপথে ঈগল-বাজপাখী-এ্যালবাট্রসদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। সেই 'এমন একটা কিছু' যে বাস্তবে 'এয়ারফয়েল' এবং এয়ারো-ডায়েনামিক্সের গূঢ় বিজ্ঞান কিংবা 'ইণ্টারনাল কম্বাস্‌শান এঞ্জিন' এমন কথা জানা ছিল না লিওনার্দোর। শুধু তিনি কেন, তাঁর পরে আরও সাড়ে চারশ' বছর ধরে সেটা কেউ জানতেই পারেনি। তা না পারুক, তবু হয়তো লিওনার্দোর সাবধানবাণীতেই কাঁধে-ডানা-বেঁধে ঝাঁপ খাওয়ার প্রয়াস কিছুটা কমে গেল। সেটাই বা কি কম?

কিন্তু কল্পনা করতে দোষ কি? বিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত দিলেও কথাসাহিত্যিকের দল থামলেন না। হেরফোর্ডের বিশপ ফ্রান্সিস

গডউইন তাঁর উপন্যাসে নায়ক গঞ্জালেসকে আকাশে ওড়ালেন সুশিক্ষিত একদল হাঁসের সাহায্যে। গঞ্জালেসের হাতে পালের রশি। একটি চিত্রও তিনি সংযুক্ত করে দিলেন তাঁর উপন্যাসে (চিত্র—২)।

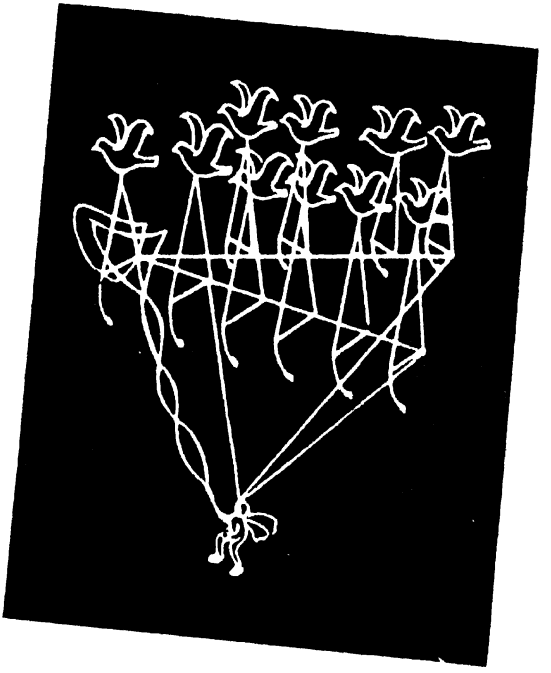

চিত্র—২

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজী উপন্যাসে হাঁসের সাহায্যে ওড়ার পরিকল্পনা

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক অটো ভন গেরিখ্ আবিষ্কার করলেন বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র। সেটা দেখে ফরাসী পাদরী ফ্রাঁসেসকো দে-লানা তেরজির মাথায় এল একটা নতুন পরিকল্পনা। তাঁর মনে পড়ে গেল আর্কিমিডিস-এর সেই 'ইউরেকা-ইউরেকা' চিৎকার। তিনি ভাবলেন, চারটে বড় বড় কাঁসার গোলককে যদি বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুশূন্য করে ফেলা যায় তাহলে সেগুলি একটা হাল্কা নৌকাকে নিয়ে নিশ্চয়ই

আকাশে উড়তে পারবে। ঐ নৌকায় যদি একটা জবর পাল খাটিয়ে দেওয়া যায় তাহলে একেবারে—'কোন দেশেতে যাওরে বন্ধু সাধের ডিঙা বাইয়া।'

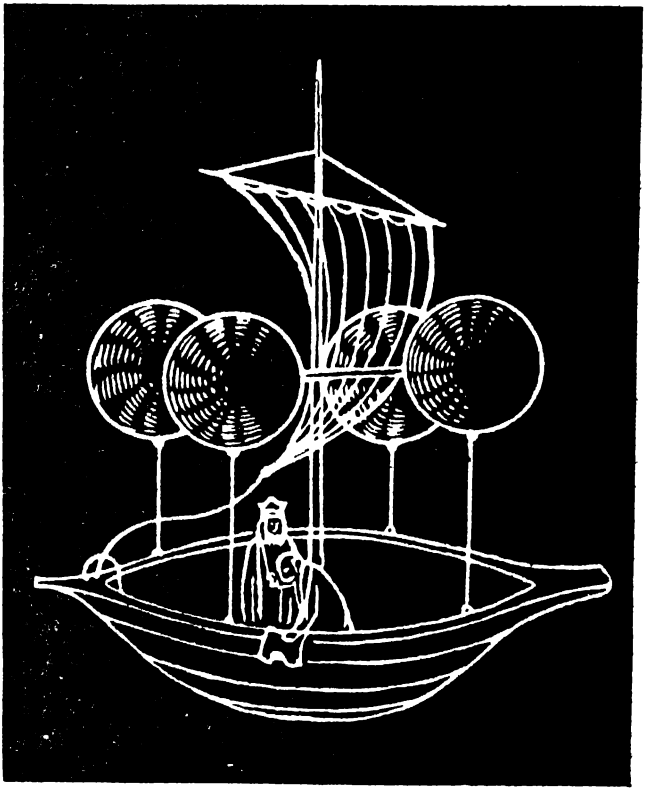

চিত্র—৩

দে-লানার কল্পলোকের গগন-নৌকা

দে-লানার কল্পলোকের নৌকার একটি অনুলিপিও এখানে দেওয়া গেল (চিত্র—৩)।

বাস্তবে কিন্তু সাধের ডিঙা বাতাসে ভাসল না। কাঁসার গোলক-গুলি ভারী চাদরে তৈরি করলে বায়ু-নিষ্কাশন সত্ত্বেও সেটা যথেষ্ট

ভারী থাকে, আবার পাতলা চাদর দিয়ে তৈরি করলে বায়ু-নিষ্কাশনের সময় সেগুলি চুপ্‌সে যায়, তুবড়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন না দে-লানা। পাদরী সাহেব হতাশ হলেন শেষ পর্যন্ত। তবে তিনি ছিলেন ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মভীরু মানুষ; তাই তাঁর দিনপঞ্জিকায় লিখলেন "ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয় যে, এমন একটি স্বর্গীয় নৌকা বাস্তবায়িত হ'ক। ঠিকই তো। এটা তৈরি করা গেলে হয়তো মনুষ্যজাতির ক্ষতিই হত বেশি। এমন একটা নৌকায় চেপে হয়তো কোন দিগ্বিজয়ী রণোন্মাদ শান্ত জনপদের উপর উড়ে গিয়ে মারণাস্ত্র বর্ষণ করত। ধ্বংসলীলায় মত্ত হত মানুষ। তার চেয়ে এ ভালই হল।"

দে-লানাকে উড়োজাহাজের পরিকল্পনাকাবদের দলে ঠাঁই দিতে হয়তো আপত্তি হবে অনেকের। আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করেননি তিনি। তা হোক, তবু এ তালিকায় তাঁর নামটা থাকা উচিত। আকাশ-জয়ের পথিকৃৎ না হলেও আকাশ-জয়ের ফলশ্রুতি বিষয়ে এমন নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী আব কে করেছে অত আগে?

আকাশ-জয়ের পথে বলতে গেলে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বেলুন।

এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারের প্রায় সওয়া শ'বছর আগেকার কথা। দে-লানার ভবিষ্যদ্বাণীরও প্রায় সওয়া শ'বছর পরেকার কথা। এবার সেই বেলুন আবিষ্কারের কথা বলি:

বেলুনের আবিষ্কর্তা হিসাবে সাধারণতঃ উল্লিখিত হয় দুজন ফরাসী ভদ্রলোকের নাম—জোসেফ আর এতিন্ মগফ (Etinne Moutgolfier)। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। এ সম্মান তাঁরা নিরঙ্কুশভাবে পেতে পারেন না। কেন, সেটা বোঝা যাবে আমার গল্পটা শেষ হলেই। মগফ-ভ্রাতৃদ্বয়ের এ সাফল্যের তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩। কিন্তু তাঁদের সাফল্যের বিবরণ দেওয়ার আগে

এ বিষয়ে তাঁদের পূর্বসূরী পর্তুগালের লর্যাস দে-গামা (Laurenco de Gusmao)-এর নাম উল্লেখ করতে হয়। ১৭০৯ সালে দে-গামা একটি বিচিত্র আকাশযানের মডেল তৈরি করে উপস্থিত হলেন পর্তুগালের রাজার দরবারে। আকাশযানের নাম 'পাসারোলা', যার আক্ষরিক অনুবাদ 'বিরাট পক্ষী', ভাবার্থে নামকরণ হতে পারে: মহাগরুড়।

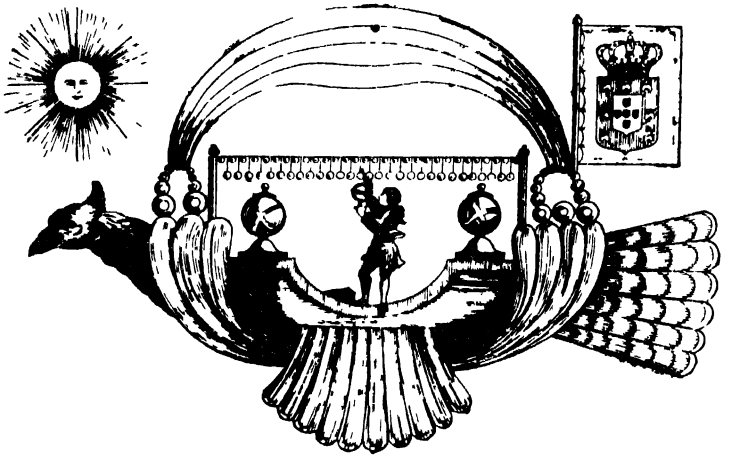

চিত্র—৪

দে-গামা পরিকল্পিত—'মহাগরুড'

এই মডেলের একটি বিচিত্র ছবি (চিত্র—৪) পর্তুগাল-রাজের মহাফেজখানায় সযত্নে রাখা আছে। দে-গামা আশা করেছিলেন কাপড়ের বেলুনে গরম হাওয়া ঢুকিয়ে দিলে সেটা ফুলে উঠবে এবং শেষবেশ নৌকাটাকে নিয়ে আকাশে উড়বে। পাসারোলাতে এ-ছাড়া দূরবীণ, কম্পাস, রকেট ইত্যাদি আরও অনেক আনুষঙ্গিক রাখার পরিকল্পনা ছিল। বাস্তবে কিন্তু এটি আকাশে ওড়েনি, ওড়াবার আদৌ চেষ্টাই করা হয়নি। তা হলে এ কথার উল্লেখ করছি কেন? করছি এ জন্য যে, গরম বাতাস যে সাধারণ বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা, সেটা বায়ুস্তর ভেদ করে উপরে উঠতে চায় এটুকু কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন ঐ দে-গামাই। সেটুকু

সম্মান তাঁর প্রাপ্য বইকি। কারণ সেই সূত্র ধরেই আরও প্রায় পঁচাত্তর বছর পরে বাস্তবে বেলুন আকাশে উড়ল।

ওঁরা দু-ভাই—জোসেফ আর এতিন ছিলেন ফ্রান্সের লিওঁ অঞ্চলের বাসিন্দা। কাগজ তৈরির ব্যবসা ছিল দু-ভাইয়ের। এক শীতের সন্ধ্যায় দু-ভাই বৈঠকখানায় বসে লক্ষ্য করে দেখলেন—ফায়ার-প্লেসের আগুনের টানে উত্তপ্ত হাওয়া আর ধোঁওয়া যখন চিমনি দিয়ে উপরে উঠে যায় তখন তার আকর্ষণে পোড়া কাগজের টুকরা, শুক্‌নো গাছের পাতাও চিমনি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। এর কারণটা কি? ওঁদের খেয়াল হল—গরম হলে হাওয়া নিশ্চয় হাল্‌কা হয়ে যায়, তাই হাল্‌কা হাওয়া ভারী হাওয়াকে ঠেলে উপর দিকে ওঠে। খুব সম্ভবত ওঁরা দে-গামা অথবা দে-লানার নামও শোনেন নি। তবু একটা সিল্কের ব্যাগের নিচে আগুন জ্বেলে ওঁরা ঐ গরম হাওয়াটাকে ধরলেন। ব্যাগটা ছেড়ে দিতেই সেটা উপরে উঠে ঘরের সিলিঙে আটকে গেল। দু-ভাই লাফিয়ে ওঠেন ওঁদের সাফল্যে। কাগজের ব্যবসা প্রায় লাটে ওঠার জোগাড়। একটা মস্ত সিল্কের ব্যাগ নিয়ে তাঁরা আবার ঐ পরীক্ষাকার্যটা করে দেখলেন, এবারও সাফল্য লাভ করলেন। তারপর গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে সর্বসমক্ষে আটত্রিশ ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট বিরাট একটি সিল্কের ব্যাগে ওঁরা গরম হাওয়াকে আবার পাকড়াও করলেন। যখন নিচে আগুন জ্বেলে গরম হাওয়া ধরা হচ্ছিল তখন ব্যাগটা ছিল দড়ি দিয়ে বাঁধা। দড়ি কেটে দিতেই সেটা হু-হু শব্দে উঠে গেল আকাশে। গাঁয়ের লোকেরা তো থ। এ কী তাজ্জব ব্যাপার! মুখে মুখে রটে গেল এই অলৌকিক সংবাদ। দু-ভাই বীরের সম্মান পেতে থাকেন।

শেষে অনেকে এসে ওঁদের পরামর্শ দিল এ বাহাদুরীটা স্বয়ং ফ্রান্সের মহান অধিপতিকে দেখাতে। কে বলতে পারে, আকাশে ওড়ার বিষয়ে হয়তো এটাই হবে প্রথম পদক্ষেপ? গ্রামবাসীদের আশঙ্কা তাড়াহুড়া না করলে এ কায়দা অন্য কেউ দেখিয়ে আগে-

ভাগে বাহাদুরীটা দাবী করে বসবে। ওদের গাঁয়ের নাম আর তাহলে ইতিহাসে লেখা হবে না।

কথাটা ওঁদের মনে লাগল; কিন্তু মহারাজকে চিঠি লেখা কি সোজা কথা? শেষে গাঁয়ের মাস্টারমশায় অনেক মুসাবিদা করে, অনেক কাগজ ছিঁড়ে পরম ভট্টারক শ্রীল শ্রীযুক্ত ফরাসী অধিপতির উপযুক্ত একটি চিঠির খসড়া খাড়া করলেন। দু-ভাই তাতে সই দিলেন। চিঠিটা পাঠানো হল মহারাজকে।

মহারাজ আর কেউ নন—স্বয়ং গ্র্যাণ্ড মনার্ক ষোড়শ লুই! ভার্সাই প্রাসাদে মহারাজ চিঠিখানি পড়ে উৎসাহিত হলেন। সিল্কের ব্যাগ আকাশে উড়বে! এ ম্যাজিক দেখা দরকার। চিঠি-খানি উনি পড়তে দিলেন মন্ত্রী মহোদয়কে। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ চিঠিখানা পাঠিয়ে দিলেন প্যারীর বিজ্ঞান-পরিষদে। পরিষদ পত্রখানি আবার পাঠিয়ে দিলেন বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী জে. চার্লসকে। পরিষদ কিছু অর্থ বরাদ্দও করলেন, যাতে অধ্যাপক চার্লস এ দাবীর সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন।

কিছুদিন পরেই গ্র্যাণ্ড মনার্কের খেয়াল হল—কৈ, সেই ব্যাগ ওড়ানোর ম্যাজিকের কি হল?

মন্ত্রী সবিনয়ে জানালেন, য়োর এক্সেলেন্সি, ব্যাপারটা নিয়ে বিজ্ঞান-পরিষদের পক্ষ থেকে প্রফেসার চার্লস পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁর ফলাফল যথারীতি আপনাকে জানানো হবে।

গ্র্যাণ্ড মনার্ক হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: তোমার বিজ্ঞান-পরিষদ আর তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চুলোর দোরে যাক! আমি ওসব বাজে কথায় ভুলবার লোক নই। অবিলম্বে ঐ দু-ভাইকে ডেকে পাঠাও। ওরা এসে আমার প্রাসাদ-সংলগ্ন মাঠে কেরামতিটা দেখাক! সব বড় বড় সভাসদকে নিমন্ত্রণ জানাও! আগামী উনিশে সেপ্টেম্বর! রাত্রে সবাই এখানেই ভোজ খাবে!

মহারাজের আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হল। নির্ধারিত তারিখের সাত দিন আগেই দু-ভাই এসে হাজিরা দিলেন ভার্সাই

প্রাসাদে। স্বয়ং মহারাজ এবার দর্শক। ব্যবস্থাটা নিখুঁত হওয়া চাই। দু-ভাই মিলে প্রকাণ্ড একটা ফানুস বানালেন। এবার সিল্কের নয়, কাগজের। কাগজ সিল্কের চেয়ে হাল্‌কা। ফানুসটা গ্র্যাণ্ড মনার্কের উপযুক্ত বটে—সত্তরফুট খাড়াই তার। নির্ধারিত সময়ের দিনসাতেক আগে সরেজমিনে একটা পরীক্ষা করতে বসলেন দু-ভাই। গরম হাওয়ায় ওটা কতটা ফোলে, দড়িতে কতটা টান পড়ে সেটা যাচাই হওয়া দরকার। তা হল—তলায় আগুন জ্বেলে দিতেই ফুলে-ফেঁপে উঠল অতিকায় বেলুনটা, দড়িতে টান পড়ল।

কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। কোথাও কিছু নেই বিনা মেঘে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল আচমকা। ব্যস! কাগজের ফানুসটা ভিজে ন্যাতা হয়ে গেল! আঠা গেল গলে, কাগজ গেল ফাৎড়াফাই হয়ে!

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন দু-ভাই। এখন উপায়? রাজানুগ্রহ তো দূরের কথা এবার গর্দান না যায়! কিন্তু ভয়েরই বা কি আছে! সাত দিন সময় তো রয়েছে হাতে! দিবারাত্র পরিশ্রম করে ওঁরা বানিয়ে ফেললেন দ্বিতীয় একটি ফানুস। এবার আর ফাঁকা মাঠে নয়। ছাদের নিচে রাখা হল সেটাকে।

নির্ধারিত দিনে অমাত্য-বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সাড়ম্বরে এসে উপস্থিত হলেন গ্র্যাণ্ড মনার্ক ষোড়শ লুই আর তাঁর ধর্মপত্নী। তাঁর নামটা নথীবদ্ধ করা হয়নি, সম্ভবত তিনি সেই ইতিহাস-বিখ্যাত মেরি আয়েতাঁ—সেই যিনি বলেছিলেন, 'রুটির জন্য ওরা চিৎকার করছে কেন? রুটি না থাকলে ওরা কেক খেয়েই তো সন্তুষ্ট হতে পারে।'

মাঠে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

ফানুসের নিচে একটা চুবড়ি বেঁধে দেওয়া হল। তাতে বসিয়ে দেওয়া হল একটা ভেড়া, একটা মোরগ আর একটা হাঁস। গ্র্যাণ্ড মনার্ক তাঁর রুমাল নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। তৎক্ষণাৎ ফানুসের দড়ি কেটে দেওয়া হল। আশ্চর্য! অদ্ভুত! ঝুড়িসমেত ফানুসটা উঠে

গেল আকাশে। উঁচুতে আরও উঁচুতে। হাঁস-মুরগীর আকাশ-চারণ এর আগেও দেখা আছে, কিন্তু তাই বলে ভেড়া! আনন্দে সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে। গ্র্যাণ্ড মনার্ক চারিদিকে ঝুঁকে কার্টসী-বাও করলেন। যেন কৃতিত্বটা একা তাঁরই!

পুরো আট মিনিট পরে ঝুড়ি-সমেত ফানুসটা নেমে এল মাটিতে, হাঁস-মুরগী-ভেড়া সকলেই অক্ষত। তাজ্জব!

নিজ সাফল্যের আনন্দে সে রাত্রে গ্র্যাণ্ড মনার্ক ঐ হাঁস-মুরগী-ভেড়ার রোস্ট বানিয়ে খেয়েছিলেন কিনা সে-কথাটা অবশ্য লিখতে ভুলেছেন ইতিহাসকার।

আকাশ-জয়ের পথে সে এক চিহ্নিত খণ্ডকাল—১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৩।

তখন স্বতঃই প্রশ্ন উঠল—ভেড়া নয়, মানুষকে উড়তে হবে এবার।

কিন্তু প্রথম আকাশচারী মানুষ কে হবে? গ্র্যাণ্ড মনার্ক বিচক্ষণ ব্যক্তি। বললেন, এ সম্মানের প্রথম দাবীদার ঐ দুজন—জোসেফ আর এতিন্! ধরে নিয়ে এস ওঁদের।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ওঁরা দু-ভাই এতবড় সম্মান স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারলে বাঁচেন! যেটুকু মাতামাতি তাঁদের নিয়ে হচ্ছে তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। আকাশপথে প্রথম শহীদ হবার বাসনা তাঁদের মোটেই নেই! মনুষ্যবাহী ফানুস তাঁরা বানিয়ে দিতে রাজী আছেন, বাদবাকি কেরামতিটুকু বরং আর কেউ দেখাক।

এ কেমন কথা? ফানুস উড়বার জন্য তৈরি, গ্র্যাণ্ড মনার্ক দেখবার জন্য তৈরি অথচ মরবার উপযুক্ত মানুষ নেই! যাকেই বলা হয় সেই মাথা চুলকায়। রাজার শালা চন্দ্রকেতুর মত গাঁইগুঁই করে বলে: "মারতে চাও তো ডাকাও নাকো জল্লাদ। গন্ধ শুঁকে মরতে হবে এ আবার কোন্ আল্লাদ!"

সব বৃত্তান্ত শুনে গ্র্যাণ্ড মনার্ক ফরমান জারী করলেন, ঠিক হ্যায়! বাস্তিল কারাগার থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এস কোন

জিয়ানো কই মাছ! যে বেটা কোতল হবার হুকুম পেয়ে শেষ দিনের হিসাব গুনছে। ও ব্যাটা যদি স্বেচ্ছায় উড়তে রাজী থাকে তো উড়ুক। জ্যান্ত ফিরে এলে বেটাকে বেকসুর মাপ করে দেব আমি!

গ্র্যাণ্ড মনার্কের মতই কথা বটে! এর চেয়ে সুবিচার আর কি হতে পারে!

মহাকাল বোধকরি এ ফরমান শুনে মুখ টিপে হেসেছিলেন—কারণ ঐ আদেশ জারী করার বছর দশেক পরে স্বয়ং ষোড়শ লুই নিজেই হয়েছিলেন অমন একজন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত জিয়ানো কই মাছ!

সে যাইহোক, এমন সুব্যবস্থাতেও বাদ সাধলেন ওঁর অমাত্যবর্গ। তাঁরা বললেন, য়োর ম্যাজেস্টি এ কেমন কথা? হাজার হাজার বছর ধরে মানুষে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখছে। এই দুর্লভ সম্মান লাভ করবে শেষ পর্যন্ত একটা দাগী খুনী আসামী!

তাও তো বটে! কথাটা তো এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। গ্র্যাণ্ড মনার্ক বিচলিত হয়ে পড়েন।

এই সময়েই সমস্যার মূর্তিমান সমাধানের মত এগিয়ে এলেন জঁা ফ্রাঁসোয়া। তিনি ছিলেন পিলাৎ-এর রোজিয়ে [Jean Francois Pilatre de Rozier]। আজ্ঞে না।—মহারাজের নব্বই বছর বয়সের বৃদ্ধ নাজির নন, ঊনত্রিশ বছর বয়সের একজন তরুণ পদার্থ-বিজ্ঞানী। উপযুক্ত লোক বটে।

ততদিনে জোসেফ আর এতিন বানিয়ে ফেলেছেন মানুষ বইবার উপযুক্ত একটি প্রকাণ্ড ফানুস। শুধু প্রকাণ্ড নয়, দর্শনধারীও বটে। তার কিছুটা অংশ আকাশের মত নীল, কিছুটা সূর্যের আলোর মত সোনালী। তার গায়ে বিচিত্র সব নক্শাকাটা—সূর্যমূর্তি, ঈগলপাখী এবং গ্র্যাণ্ড মনার্ক ষোড়শ লুইয়ের রাজ-সরকারের মোহর-ছাপ।

ঐ একই বছর পনেরই অক্টোবর কয়েক হাজার দর্শককে সাক্ষী রেখে পৃথিবীর বুক থেকে শূন্যে উঠে গেলেন দ্য-রোজিয়ে। পৃথিবীর

ইতিহাসে আকাশচারী প্রথম মানব শিশু। প্রায় সাড়ে চার মিনিট তিনি আকাশে ছিলেন, তারপর ফানুসের গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আপনা থেকেই নিরাপদে নেমে এলেন ভূপৃষ্ঠে।

এ পরিচ্ছেদের প্রথমেই বলা হয়েছে বেলুন আবিষ্কারের সম্মান পান মগফ-ভ্রাতৃদ্বয়—জোসেফ আর এতিন। কিন্তু আসলে এ সম্মানের ভাগীদার হওয়া উচিত পদার্থ-বিজ্ঞানী জে. এ. সি. চার্লস-এর—সেই যে অধ্যাপকটিকে প্যারীর বিজ্ঞান-পরিষদ মগফ-ভ্রাতৃদ্বয়ের পত্রখানি পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিলেন। চার্লস ছিলেন পদার্থ-বিজ্ঞানী ; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মগফরা যা দিয়ে বেলুনটা ভর্তি করেছে তা উত্তপ্ত বাতাস ছাড়া আর কিছু নয়। চিঠিতে তাঁরা লিখেছিলেন যে, বাতাসকে উত্তপ্ত করলে সেটা নাকি একটা হাল্‌কা 'গ্যাস'-এ রূপান্তরিত হয়—ওঁরা তার নামও দিয়েছেন —'মগফ-গ্যাস'। অধ্যাপক চার্লস জানতেন এটা একটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক উক্তি। গরম হলে বাতাস বাতাসই থাকে, কোনও গ্যাসে রূপান্তরিত হয় না। তিনি ভেবে দেখলেন বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা কোন 'গ্যাস' দিয়ে বেলুনটা যদি ফোলানো যায় তবে সেটা আরও কার্যকরী হবে। 'মগফ-গ্যাস' অর্থাৎ উত্তপ্ত বাতাস উপরের শীতল বায়ুস্তরে পৌঁছে সহজেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়—ফলে তখন সেটা ঘন ও ভারী হয়ে পড়ে—তাই বেলুন তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসে। এজন্য তিনি বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা কোন গ্যাসের সন্ধানে রইলেন।

সন্ধান পাওয়া গেল। ব্রিটিশ-বিজ্ঞানী হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ দস্তা আর হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের সাহায্যে সম্প্রতি একটা অদ্ভুত গ্যাস নাকি আবিষ্কার করেছেন, যা নাকি খুবই হাল্‌কা। তখন তার নাম ছিল 'দাহ্য-বাতাস'। হাজার ঘনফুট বাতাসের ওজন যেখানে ছিয়াত্তর পাউণ্ড, ঐ 'দাহ্য-বাতাসের' ওজন সেখানে মাত্র সওয়া পাঁচ পাউণ্ড। আর্কিমিডিস-এর নীতি অনুসারে—অধ্যাপক চার্লস্ বুঝলেন—এই হাল্‌কা গ্যাস দিয়ে বেলুনটাকে ভর্তি করলে

সেটা হু-হু শব্দে আকাশে উঠে যাবে আর দু-চার মিনিটের ভিতর নেমে আসবে না।

যে কথা সেই কাজ। রবার্ট-ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে তিনি একটি রবার-মিশ্রিত সিল্কের বেলুন বানিয়ে ফেললেন—তের ফুট ব্যাসের। জোসেফ আর এতিন যেদিন ভার্সাই-প্রাসাদে গ্র্যাণ্ড মনার্কের সামনে তাঁদের বেলুন উড়িয়ে সবার হাততালি পেলেন তার তিন সপ্তাহ আগে ২৭শে আগস্ট তারিখে অধ্যাপক চার্লস্ এই বেলুনটিকে প্যারীর উপকণ্ঠ থেকে উড়িয়ে দিলেন। প্যারী বিজ্ঞান-পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আশপাশের গ্রামে একটি সরকারী ঘোষণা ঢেড়া পিটিয়ে জারী করা হয়েছিল। ঢেড়াদার গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘোষণা করে এল ঃ এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী সাতাশে আগস্ট বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় আকাশে উড্ডীয়মান অবস্থায় রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের আকারে একটি উড়ন্ত গোলক দেখা যাইবেক। ইহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামাত্র বটেক। ঐ উড়ন্ত গোলকটিকে কোথাও পতিত হইতে দেখিলে নিকটস্থ থানাদারকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিতে হইবেক।

অধ্যাপক চার্লস-এর বেলুনে যে 'দাহ্য বাতাস' গ্যাস ভরা হল—পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন—সেটা আর কিছু নয়, হাইড্রোজেন গ্যাস। বেলুনের দড়ি কেটে দেওয়ামাত্র সেটা বাঁই-বাঁই শব্দে আকাশে উঠে গেল। প্রফেসার চার্লস্-এর প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল দিগন্তে!

প্যারী থেকে মাইল পনের দূরে একটি ঝিমন্ত জনপদে সেটা একসময় নেমে এল। গ্রামটার নাম 'Gonesse'। ফরাসী উচ্চারণ যাই হোক না কেন আমি বাঙলায় গ্রামটাকে 'গণেশ' নামে ডাকার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। গণেশ-গাঁয়ের সরল মানুষেরা থাকে শহর থেকে দূরে—পাক্কা পনের মাইল দূরে। সরকারী ঘোষণা তারা আদৌ শোনেনি। এতদূরে যে বেলুনটা উড়ে আসতে পারে

সেটা কেউই আন্দাজ করেনি। সুতরাং আকাশে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মত উড়ন্ত গোলক দেখা গেলে কী করতে 'হইবেক' তা তারা জানত না। মেঘলা আকাশ ভেদ করে বিরাট একটা গোলাকৃতি দৈত্যকে নেমে আসতে দেখে গ্রামে চীৎকার চেঁচামেচি লেগে গেল। হাঁস-মুরগী মায় বাচ্ছাদেরও ঢুকিয়ে দেওয়া হল খোঁয়াড়ে। লাঠি, সড়কি, বন্দুক হাতে গণেশ-গাঁয়ের বাহাদুরের দল দৈত্যের মহড়া নিতে প্রস্তুত হল। আসুক ব্যাটা আকাশ থেকে নেমে!

দৈত্যটা আকাশ থেকে নামল। পড়ল মাটিতে! পড়েই উড়ল! আবার পড়ল! খোলা হাওয়ায় ফাঁকা মাঠের মাঝখানে দাপাদাপি জুড়ে দিল। কিন্তু গণেশ-গাঁয়ের বীরেরাও কম যায় না। তারা তিনদিক থেকে ঘিরে ধরল দৈত্যটাকে। ওটা ড্রাগন, গর্গন না মেডুসা বোঝা গেল না; কিন্তু তার আগেই একজন দেগে দিল তার বন্দুক: দ্রুম!

এক গুলিতেই কেমন যেন চুপসে গেল বেটা! ফোঁস্-স্ করে একটা শেষ নিঃশ্বাস ফেলে নেতিয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু সাবধানের মার নেই! উপর্যুপরি আরও পাঁচ-সাতটা গুলি করা হল সেটাকে। আর মাথা তুলতে পারল না দৈত্যটা। তখন শুরু হল লাঠি পেটা। সে কী মার! তবু ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। দৈত্যটার দেহাবশেষ বেঁধে দিল পাঁচ-সাতটা ঘোড়ার ল্যাজে। চাবুকের চোটে ঘোড়াগুলো যখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সারা মাঠে দাপাদাপি জুড়ে দিল তখন দেখা গেল দৈত্যটার দেহাবশেষ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

হুঁ-হুঁ বাবা! গণেশ-গাঁয়ের মানুষের সাথে চালাকি!

এই কৌতুককর ঘটনার একটি চিত্র সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটি অনুকৃতি এ-গ্রন্থের প্রথম দিকে দেওয়া হয়েছে (প্লেট—১)।

দৈত্যটার এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে কিন্তু দুঃখিত হলেন না অধ্যাপক চার্লস্। ওঁর প্রথম প্রচেষ্টাতেই যে বেলুনটা পনের মাইল

পথ অতিক্রম করতে পারবে এটা ছিল তাঁর স্বপ্নের অগোচর। দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি দ্বিতীয় একটি দৈত্যকে জন্ম দিলেন—আকারে আরও বড়—এবার সাড়ে সাতাশ ফুট ব্যাসের। গণেশ-গাঁয়ের লড়াইয়ের মাসখানেক পরে, পয়লা ডিসেম্বর চার্লস্ নিজে এবং মারি-নোয়েল রবার্ট (Marie-Noel Robert) আকাশে উঠলেন সেই বেলুনে। কিন্তু দু-দুজন মানুষের ভারে এবার সেটা বেশি উঁচুতে উঠতে পারল না। তাতে হতাশ হয়ে অধ্যাপক চার্লস্ তাঁর সঙ্গীকে বেলুন থেকে নামিয়ে দিয়ে এবার একাই উড়লেন।

এবার যে কাণ্ডটা ঘটল সেটাও তিনি আশঙ্কা করেননি। হঠাৎ ওজন অর্ধেক হয়ে যাওয়ায় বেলুনটা নক্ষত্রবেগে আকাশে উঠে গেল। উপরে—আরও উপরে! বস্তুতপক্ষে নয় হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছিল সেটা—মানে আমাদের দার্জিলিঙের টাইগার-হিলের মাথা ছাড়িয়ে! প্রচণ্ড শীতে এবং কানে ধাপ ধরায় রীতিমত কষ্ট পেয়েছিলেন অধ্যাপক চার্লস্—কিন্তু তিনি ছিলেন সাঁচ্চা বৈজ্ঞানিক! দিশেহারা হয়ে পড়েননি মুহূর্তের জন্যও। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি তাঁর যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে গেছেন।

নেমে এলেন যখন মাটিতে তখন আকাশের অনেক তথ্য স্থান পেয়েছে তাঁর নোটবইতে।

এর পর থেকে অনেকেই বেলুন নিয়ে আকাশে উড়তে শুরু করেন। এটা ক্রমে হয়ে পড়ল একটা দুঃসাহসিক খেলা। কেটে গেল আরও এক বছর। সতের শ' পঁচাশি সালের সাতই জানুয়ারি ফ্রান্সের জাঁ পীয়ের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ জন জেফারি আর একধাপ এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সমুদ্র অতিক্রম করতে হবে বেলুনে চেপে! বাতাস যখন উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে বইছে তখন যদি ওঁরা একটা বেলুনে চেপে ডোভার থেকে আকাশে ওড়েন তবে অনিবার্যভাবে উড়ে যাবেন ইউরোপ ভূ-খণ্ডের দিকে। মাইল পঁচিশেক পাড়ি দিতে পারলেই পৌঁছে যাবেন ফ্রান্সে!

কে যেন বললে, আর ইতিমধ্যে যদি বাতাসের গতিমুখ ঘুরে যায় ?

ঃ ঘুরলেই হল ? এতবড় কাণ্ডটা দেখতে ফ্রান্সের তটরেখায় হাজার হাজার লোক জমায়েত হবে। ভগবানের একটা আক্কেল নেই !

তা বটে ! বিশেষত ডাক্তার জেফরির স্ত্রী এবং জাঁ-পীয়রের প্রণয়িনী দুজনেই প্যারীতে আছেন। ঘটনার দিন তাঁরা নিশ্চয়ই ক্যালের কাছাকাছি উপস্থিত থাকবেন উড়ন্ত প্রণয়ীকে বরণ করতে। সেটুকু অন্তত ভগবানের খেয়াল হবে !

ডোভারের সাদা চখ-পাহাড়ের মাথায় মাথায় অগণিত লোক জমায়েত হয়েছে। ইংলিশ চ্যানেলে নেমেছে অসংখ্য নৌকা। ওরা যেন ওভার-বাউণ্ডারী রুখ্‌নেবালা বাউণ্ডারী-ঘেঁষা ঊর্ধ্বমুখ ফিল্ডার। তেমন-তেমন অবস্থা হলে গোটা বেলুনটাকে ক্রিকেট বলের মত লুফে নিয়ে চিৎকার করে উঠবে—হাউস্ দ্যাট ?

শুরু হল যাত্রা। বেলুনের দড়ি কেটে দিতেই বিদ্যুৎবেগে সেটা উঠে গেল নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে। আবহাওয়াবিদ ঠিকই বলেছেন, বাতাসের টানে বেলুনটা ভেসে চলল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। তীরের উপর দাঁড়ানো অসংখ্য মানুষ ওঁদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

কিন্তু বেলুনের ঐ এক ধরন—দুজনের ভার বইতে নারাজ। তখনও তার সে-ক্ষমতা হয়নি। অনতিবিলম্বেই বেলুনটা সমুদ্রের দিকে নেমে আসতে শুরু করল। অভিযাত্রীরা সভয়ে লক্ষ্য করে দেখলেন, সমুদ্রতীরে যে অসংখ্য নৌকা দেখা গিয়েছিল তার একটিও ধারে-কাছে নেই। বেলুন এত জোরে ছুটে এসেছে যে, নৌকার দল তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। সর্বনাশ ! বাঁচবার উপায় ওজন কমানো। তাই করলেন তাঁরা। প্রথমে গেল খাদ্য, তারপর পানীয়, গায়ের কোট, বাইবার দাঁড়—প্রতিবারেই বেলুন লাফিয়ে ওঠে কিছুটা, তারপর আবার নেমে আসতে থাকে। সমুদ্রটা যেন

একটা হাঁউ-মাউ-খাউ রাক্ষস। যা হয় কিছু একটা ছুঁড়ে দিলেই সে বেলুনটাকে ছেড়ে দিয়ে সেটাকেই চর্বন করতে ব্যস্ত থাকছে। তারপর খাওয়া হয়ে গেলেই অনিবার্য আকর্ষণে তার ব্যাদিত-বদন মুখ-বিবরের দিকে টানছে তাকে। ওঁরা হাতের কাছে যা পেলেন তাই ফেলে দিলেন—মায় জুতো-জোড়া, সমুদ্রে যা সবচেয়ে-প্রয়োজনীয় বস্তু লাইফ-সেভিং বেল্ট। শেষ পর্যন্ত আণ্ডার-ওয়ার-সর্বস্ব হয়ে, এমন কি প্যাণ্ট-জোড়াও।

শেষ-বেশ ওঁরা এসে পৌঁছলেন ক্যালের তটভূমিতে। সেখানে অসংখ্য লোক জমায়েত হয়েছে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে—তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অনেক মহিলাও।

এতক্ষণে ওঁদের মনে হল খবরটা আগেভাগে সবাইকে না জানালেই ভালো হত! আণ্ডার-ওয়ারধারী দুই অর্ধ-নগ্ন দুঃসাহসী বীরকে অভিনন্দন জানাতে সুবেশিনী মহিলার দল ছুটে আসছেন। কী লজ্জা!

বোঝা গেল ভগবানের শুধু আক্কেল নয়, সূক্ষ্ম রসবোধও আছে!

ওদের নিয়ে যে মাতামাতি শুরু হল তা আর বলার কথা নয়।

সংবাদপত্রে সেই বিবরণ পড়ে এবার উৎসাহিত হলেন জাঁ-ফ্রাঁসোয়া। পাঠক আশাকরি ইতিমধ্যে জাঁ-ফ্রাঁসোয়াকে ভুলে যাননি। ইনি সেই বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী, যিনি বাস্তিলের কোন ফাঁসীর আসামীকে রেহাই দিতে স্বেচ্ছায় প্রথমে বেলুনে উঠে আকাশ পাড়ি দিয়েছিলেন।

এখন তাঁর বয়স একত্রিশ। উনি স্থির করলেন, এবার ফ্রান্স থেকে উল্টোমুখো ইংল্যাণ্ড আসতে হবে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে। আর একজন দুঃসাহসী সঙ্গীকে নিয়ে তিনি উল্টোমুখে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে আকাশে উড়লেন একই বছর পনেরই জুন।

নিতান্ত দুর্ভাগ্য জাঁ-ফ্রাঁসোয়ার। সশরীরে তিনি আর ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁছতে পারেননি। এবারেও ডোভারে জমায়েত হয়েছিল অসংখ্য দর্শক—নরনারী, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। এবারেও অসংখ্য জেলে প্রস্তুত ছিল প্রয়োজনবোধে ওঁদের উদ্ধার করতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বাতাসে ভাসতে ভাসতে তাঁরা চলে গেলেন সকলের নাগালের বাইরে, অতলান্তিকের দিকে! দুদিন পরে জেলেরা উদ্ধার করল তাঁদের। প্রাণহীন দুটি দুঃসাহসী।

আকাশ মানুষকে হাতছানি দিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। যে দুঃসাহসী বীর প্রথম ধরেছিলেন আকাশের সেই বাড়িয়ে দেওয়া হাত, সেই তিনিই হলেন আকাশচারী দলের প্রথম শহীদ।

জাঁ-ফ্রাঁসোয়া পিলাৎ দ্য রোজিয়ে তাই অমর হয়ে আছেন এ্যাভিয়েসানের ইতিহাসে।

আকাশ-জয়েব পরবর্তী অধ্যায় এয়ারোপ্লেন। বেলুন থেকে এয়ারোপ্লেন।

না। ভুল বলেছি। জাঁ-ফ্রাঁসোয়ার মৃত্যু থেকে রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়ের সাফল্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সওয়া শ' বছর। তাই আকাশ-জয়ের আলোচনায় বেলুন থেকে সরাসরি এয়ারোপ্লেনের প্রসঙ্গে এলে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ লাফিয়ে যেতে হবে। উপেক্ষিত হয়ে থাকবে আব একটি প্রাসঙ্গিক অধ্যায়—যার নাম গ্লাইডার। বেলুন আর এয়ারোপ্লেনেব মাঝখানে ছোট্ট হাইফেন-এর মত অনিবার্যভাবে আছে এই 'গ্লাইডার'। তার কথা এবার বলতে হয়ঃ

১৭৮৩ সালে প্রফেসর চার্লস্ প্রথম যে চালকহীন বেলুনটিকে উড়িয়েছিলেন—সেই যে দৈত্যটাকে বধ করেছিল গণেশ-গাঁয়ের বীরপুরুষের দল—সেটার কথা আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। সেদিন দর্শকদলে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন মুলুকের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। বেলুনটা যখন হু-হু শব্দে আকাশে উঠে গেল তখন তাঁর পাশে দাঁড়ানো দর্শকটি তাঁকে ডেকে নাকি বলে ওঠেন, —আচ্ছা মশাই, এমন খামকা আকাশে বেলুন উড়িয়ে কার কি ফয়দা হবে বলতে পারেন? অথচ সবাই এমন হাততালি দিচ্ছে যেন উনি রাজা-উজির বধ করেছেন!

বৈজ্ঞানিক ফ্র্যাঙ্কলিন ঊর্ধ্ব-আকাশে বিলীয়মান একটি বিন্দুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ সম্বিত পেয়ে বলে ওঠেন, তা যা বলেছেন! আঁতুড়ঘরের একরত্তি একটা ছেলেকে দিয়ে কার কোন্ ফয়দা হবে?

ফ্রাঙ্কলিনের এই ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ রসিকতার মর্মার্থ ঐ বিজ্ঞ দর্শকটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা প্রত্যক্ষদর্শী সে-কথাটা আর লেখেননি।

ঐ দিন ভীড়ের মধ্যে ছিল আরও একটি বাচ্ছা ছেলে—বছর দশেক বয়স তখন তার। সেও বৃদ্ধ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের মত অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল বিলীয়মান বেলুনটিকে। বৃদ্ধ ফ্র্যাঙ্কলিনকে সেও হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, স্যার, বেলুনটা আকাশে উড়ল কেমন করে?

ফ্র্যাঙ্কলিন তাকিয়ে দেখলেন সপ্রতিভ ছেলেটির দিকে। ফরাসী বাচ্ছা, নেহাৎ স্কুলে-পড়া ছেলে। তার প্রশ্নে মনে ভরসা পেলেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। কই, এ ছেলেটি তো অমন বোকার মত ভাবছে না এটা নেহাৎই একটা হৈ চৈ? তিনি হেসে বললেন, ঐ বেলুনটাতে ভরা আছে একটা গ্যাস—সেটা খুব হাল্‌কা। গ্যাসসমেত-ফোলানো ঐ বেলুনটা সম-আয়তন বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা। তাই ওটা বায়ুস্তর ভেদ করে আকাশে উঠে গেল।

ছেলেটি ভ্রূ-কুঁচকে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছে দেখে ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, বুঝতে পারলে না, নয়? আচ্ছা তুমি আর্কিমেডিস্-এর নাম শুনেছ?

ছেলেটি বললে, হ্যাঁ স্যার, আমি সে-কথা ভাবছিলাম না। আমি ভাবছিলাম—তাহলে ঘুড়ি কেমন করে আকাশে ওড়ে? কাগজ আর কল-কাঠির যা ওজন তা তো সম-আয়তন বাতাসের চেয়ে বেশি!

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ফ্র্যাঙ্কলিন। ছেলেটির পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, আমি জানি না। তবে কথাটা ভাববার। তুমি ভেব। ঐ ঘুড়ির কথা ভাবতে ভাবতে আমি একটা জানবার মত জিনিস জেনেছি। ঘুড়ির মাধ্যমেই জেনেছি। তুমি এটা ভেবে বার কর দেখি!

ছেলেটির নাম জর্জ ক্যালে।

স্কুল ছেড়ে সে কলেজে উঠল। শুনল, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের নাম। জানল, বছর ত্রিশেক আগে একটা ঘুড়ি উড়িয়ে উনি আবিষ্কার করেছিলেন কেমন করে আকাশের বিদ্যুৎকে ঘরে টেনে আনা যায়। জর্জ ক্যালে ওঁর উপদেশটা ভুলতে পারে না। সেও মাতল ঘুড়ি নিয়ে। বিদ্যুৎ নয়, সে ঘুড়ি ওড়ার কায়দাটা বুঝে নেবে।

বছর পঁচিশ বয়সে উনি বুঝলেন ঘুড়ি আকাশে উড়ছে তিনটে বলপ্রয়োগের ফলশ্রুতি হিসাবে। মাধ্যাকর্ষণ তাকে টানছে খাড়া মাটির দিকে, সুতো টানছে একদিকে আর বাতাস ঠেলছে অন্যদিকে। এই তিনটি বলের মিলিত ফলশ্রুতিতেই ঘুড়ি আকাশে ভাসছে। উনি আরও লক্ষ্য করে দেখলেন আকাশে ঘুড়িটা ঠিক খাড়া হয়ে থাকে না। সুতোর টানে সেটা একটু বাঁকা হয়ে থাকে।

ছাব্বিশ বছর বয়সে উনি তৈরি করলেন একটা উড়বার উপযুক্ত [১]-প্রথম গ্লাইডার। সেটা ১৭৯৯ সালের কথা। অর্থাৎ উড়িয়েছিলে[চার্লস্-এর বেলুন ওড়ানোর ষোলো বছর পরে এবং বীরপুরুষের দ আবিষ্কারের প্রায় একশ' বছর আগেকার ঘটনা। সেদিন দর্শকদ[থা—এই প্রথম মডেলেই এমন কতকগুলি গুণ ছিল যা

এয়ারোপ্লেন তৈরির পরিকল্পনার পক্ষে ছিল অনিবার্য। তার কারণ জর্জ ক্যালে অনাগত এয়ারোপ্লেনের আকাশে-ওড়ার মূল তত্ত্বটা বুঝতে পেরেছিলেন। ওঁর তৈরি মডেলে উনি তিনটে অংশ জুড়ে দিলেন—ডানা, মধ্যমাংশ আর ঘুড়ির লেজুড়। একশ' বছর পরে যে এয়ারোপ্লেন আবিষ্কৃত হবে তার মূল কাঠামোর তিনটি প্রধান অংশের বীজ যেন বপন করলেন তিনি এই মডেলে। সে তিনটি অংশ হবে—উইং, ফিউসিলেজ আর টেইল! (চিত্র—৫)

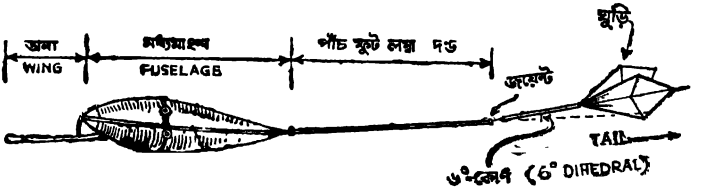

চিত্র—৫

জর্জ ক্যালের প্রথম গ্লাইডার (১৭৯৯)

জর্জ ক্যালে এ তত্ত্ব অনুধাবন করেছিলেন যে, বাতাসের চেয়ে ভারী কোন আকাশযান তখনই সাফল্যমণ্ডিত হবে যখন সে তিনটি সমস্যার সমাধান করতে পারবে। প্রথমত স্থিতিস্থাপকতা—অর্থাৎ শূন্যে তাকে ভাসতে হবে। দু নম্বর : নিয়ন্ত্রণ—অর্থাৎ ইচ্ছামত তাকে ডাইনে-বাঁয়ে উপর-নিচে চালিত করা যাবে আর তিন নম্বর : গতির উৎস, অর্থাৎ তাকে ক্রমাগত সামনের দিকে ঠেলতে হবে। সাইকেল যেমন যতক্ষণ চলে ততক্ষণই চলে, দাঁড়ালেই পড়ে যায়,—আকাশযানও তেমনি চলতে-চলতেই শুধু উড়বে। অর্থাৎ গতিই আকাশে স্থিতির মূল প্রেরণা!

বস্তুত প্রথম দুটি সমস্যা সমাধানের খুব কাছাকাছি পৌঁছে-ছিলেন তিনি, কিন্তু তৃতীয় সমস্যা অর্থাৎ গতির উৎস বিষয়ে কোন কূল-কিনারা করে উঠতে পারেননি। তাই আপাতত তিনি মাধ্যাকর্ষণকেই গতির উৎস হিসাবে ধরে কাজ করে যেতে চাইলেন। তার মানে নিচে থেকে উপরে ওঠা নয়, জমির সমান্তরালে ভেসে

চলাও নয়—আকাশ-জয়ের প্রথম সোপান হচ্ছে সাবধানে এবং ধীরে ধীরে উপর থেকে নিচে নামা। সেই যন্ত্রই আগে বানাতে হবে—সেটাই হবে অনাগত আকাশযানের ভগীরথ। এই ভগীরথটিই হচ্ছে—গ্লাইডার। যা নিয়ে সারাটা জীবন মেতেছিলেন জর্জ ক্যালে।

বছর পাঁচেকের মধ্যেই ঐ প্রাথমিক মডেলের একটা বৃহত্তর সংস্করণ বানিয়ে ফেললেন তিনি। তার ডানার বিস্তার ছিল পাক্কা তিনশ' ফুট—আমাদের আজকের দিনে ছোটখাটো বিমানে যে ডানা থাকে তার প্রায় দ্বিগুণ। উঁচু টিলার উপর থেকে ঐ আকাশযানের সাহায্যে বাতাসে ভাসতে ভাসতে অনায়াসে নেমে আসা যেত। পুরো একটা মানুষের ভার বইতে পারত না সেটা, তবে ছোট ছোট ছেলেদের ভার বইতে পারত। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই জর্জ ক্যালে তাঁর পাড়ার বাচ্ছাদের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরে—'আমি চাপব, আমি চাপব'। জর্জ ক্যালে বৈজ্ঞানিক—বেহিসাবী কাজ করবেন না; তিনি একটা রেজিস্টার খুলে ছেলেদেরই সেটা রাখতে বললেন। কার পরে কার পালা আসবে তার হিসাব রাখত সে-পাড়ার ফ্যানি-ম্যাগি-জর্জি-বব্ আর ফ্রেড। জর্জ ক্যালে তাঁর দিন-পঞ্জিকায় লিখেছেন:

"ছোট ছোট বাচ্ছাদের নিয়ে আমার সাধের যন্ত্রটা যখন বিরাট একটা ঈগল পাখীর মত টিলার উপর থেকে নিচের বালুকাস্তূপের উপর নেমে আসত, তখন আমি বসে বসে ভাবতাম—আগামী দিনে নিশ্চয় এর বৃহত্তর আর উন্নততর সংস্করণ কেউ বানাবে। পূর্ণবয়স্ক মানুষ নির্ভয়ে নেমে আসবে আল্পস পর্বতের চূড়া থেকে। —ঘোড়ার পিঠে পাকদণ্ডী পথে দীর্ঘ চক্রাকার অবরোহণ হবে নিষ্প্রয়োজন।"

এর চেয়ে বেশি সেদিন তাঁর মত বৈজ্ঞানিকও আশা করতে পারেননি।

এই গ্লাইডারই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান নিধিধ্যাসন। ক্রমাগত পরীক্ষা চালাতে চালাতে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ১৮৫৩ সালে স্যার জর্জ (এতদিনে তিনি 'স্যার' হয়েছেন) একটি নূতন মডেল বানালেন। তার নাম দিলেন 'নয়া আকাশযান' (New Flyer)। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস—এবার সেটা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে নিয়ে টিলার উপর থেকে নিচে নামতে পারবে। দশবছর বয়সে প্রফেসার চার্লস্-এর বেলুন উড়তে দেখে জীবনের ব্রত স্থির করেছিলেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে বানিয়েছিলেন প্রথম মডেল—এখন সেই স্যার জর্জ আশীবছরের বৃদ্ধ। নিজে তো আর এ বয়সে পরীক্ষায় নামতে পারেন না। কে ওঁর হয়ে ওটা পরখ করবে? শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাঁর ব্রুহাম গাড়ির চালককে পাকড়াও করলেন। তারও বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দীর্ঘদিন স্যার জর্জের গাড়ি হাঁকাচ্ছে। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। সে তো আজ ত্রিশ বছর ধরে দেখছে বুড়োকর্তার কাণ্ডকারখানা। ঐ ওড়ার যন্ত্রই যে তাঁর প্রাণ! এতদিন পরীক্ষা করে যন্ত্রটা উনি বার করলেন অথচ সাহসী লোকের অভাবে সেটা ওঁর জীবদ্দশায় পরীক্ষা করা যাবে না? 'যা থাকে বরাতে' বলে কোচম্যান রাজী হয়ে গেল।

টিলার নিচে ঊর্ধ্বমুখে বসে আসেন পলিতকেশ বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। কোচম্যান যন্ত্রটা নিয়ে টিলার উপর উঠল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। বৃদ্ধ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। লাফ দেবার পূর্ব মুহূর্তে সে 'রাম রাম' বলেছিল, না 'রহিম রহিম' বলেছিল ইতিহাসে সে-কথা লেখা নেই, কিন্তু ভূমি স্পর্শ করা মাত্র সে যা বলেছিল তা স্যার জর্জের দিন-পঞ্জিকায় লেখা আছে। লোকটা ভাসতে ভাসতে নেমে এসে যেই মাটিতে পড়ল অমনি ছুটে এলেন স্যার জর্জ। দেখতে এলেন তার কোন আঘাত লেগেছে কিনা। কোচম্যান উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে প্রথমেই বলেছিল, স্যার জর্জ! আমাকে

মাপ করতে হবে। আমি আপনার কোচম্যানের চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছি। আমাকে আপনি নিযুক্ত করেছিলেন ব্রুহাম গাড়ি চালাতে, এমন বেমক্কা আকাশে উড়তে নয়।

স্যার জর্জ প্রশ্ন করেন, নামবার সময় কি তোমার শরীরের মধ্যে কোনও অস্বস্তি হয়েছিল ?

: না স্যার।

: মাটিতে পড়বার সময় কি কোন ব্যথা পেয়েছ ?

: আজ্ঞে না।

: তবে উড়তে তোমার এত আপত্তি কিসের ?

মাথা চুলকে কোচম্যান বলে, কি জানেন স্যার, বারে বারে এমন উড়লে বৌ আমার কাছে শোবে না। ভাববে আমি দৈত্য-দানো।

: তোমার স্ত্রীকে ব'ল—এ্যাঞ্জেলরাও আকাশে ওড়ে।

আকাশ-জয়ের ইতিহাসে এই অজ্ঞাতনামা কোচম্যান হচ্ছে প্রথম উড্ডীয়মান এ্যাঞ্জেল।

স্যার জর্জ ক্যালের বিষয়ে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হচ্ছে এই যে, তাঁর আবিষ্কারের প্রকৃত মূল্য সেদিন কেউ বুঝতে পারেনি। সমসাময়িকরা তো নয়ই, এমন কি পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে বৈজ্ঞানিকরাও সেটা বুঝতে পারেননি। স্যার জর্জ অর্থ পেয়েছেন, প্রতিপত্তি পেয়েছেন, নাইটহুড পেয়েছেন—কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় পাননি। সেটা আজকের যুগের বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে দিচ্ছেন : 'আকাশ-জয়ের জনক'—এই খেতাব। সেদিন যদি তাঁর আবিষ্কারের মূল সূত্রটা কেউ ধরতে পারত তাহলে পরবর্তী দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এমন ভুল পথে রাস্তা হাতড়াতেন না। অসংখ্য উত্তরসূরী এভাবে মৃত্যুবরণ করতেন না। স্যার জর্জের মূল সূত্রটার কোন্ গূঢ়তত্ত্ব আর পাঁচজন বুঝতে পারেন-নি সেটা আলোচনা করাই হবে আমাদের পক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন :

তা করতে হলে আমাদের একটু অঙ্ক বুঝতে হবে। না, না, অঙ্কের নাম শুনেই পাতা ওল্টাবার দরকার নেই—দেখাই যাক্ না ব্যাপারটা বোঝা যায় কিনা :

এয়ারোপ্লেন যে আকাশে উড়ে যায় তার জন্য শেষ-বেশ চার-মুখো চারটে 'ফোর্স' বা বল কাজ করে। মাধ্যাকর্ষণের অনিবার্য টানে সেটা খাড়া নিচের দিকে নেমে আসতে চায়, সেটাকে বলা যাক W ; প্রপেলারটা যন্ত্রের সাহায্যে শোঁ-শোঁ শব্দে ঘুরছে বলে প্লেনটা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়, সেটাকে ধরা যাক F। এ দুটো তো সহজেই বুঝলাম। কিন্তু এ দুটি ছাড়া আরও একটি 'ফোর্স' বা বল তার উপর প্রভাব বিস্তার করছে—যাকে বলি বাতাসের প্রতিবন্ধকতা। ধরা যাক সেটা হচ্ছে P। ডানাটি যদি বিমানের গতিপথ থেকে একটু বাঁকা হয়ে থাকে তবে ঐ P-বলটা ডানার উপর লম্ব হয়ে পড়বে। এই P-বলটাকে দু-ভাগে ভেঙে আমরা বলতে পারি সেটা গতিমুখের বিপরীত দিকে P_2 এবং ঊর্ধ্বমুখে P_1 বলপ্রয়োগ করছে। এখন যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যখন $P_1 = W$, তখন আকাশযানটা উপরেও উঠবে না, নিচেও নামবে না। সেটা ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে $F - P_2$ বলের ফলশ্রুতি হিসাবে (চিত্র—৬)।

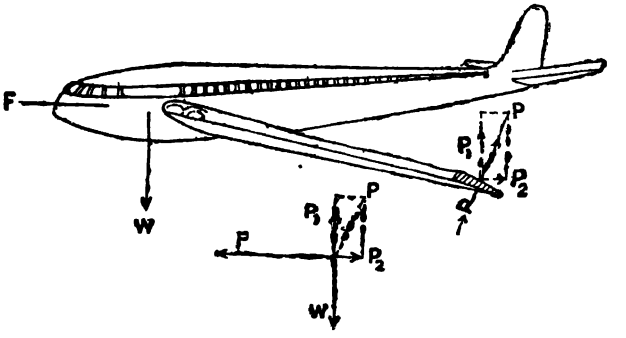

চিত্র—৬

আকাশযান কেন ওড়ে

এই ব্যাখ্যা শুনে আপনাদের মনে অনেকগুলি প্রতি-প্রশ্ন

জাগতে পারে। আপনারা বলতে পারেন, শুধু কি ডানাতেই বাতাসের প্রতিবন্ধকতা আছে, অন্যত্র নেই? প্রশ্ন করতে পারেন, —সব বলপ্রয়োগ কি বস্তুটার কেন্দ্রবিন্দুতে হচ্ছে? না হলে তো একটা ভ্রামক তৈরি হবে, প্লেনটা উল্টে যাবে, জিজ্ঞাসা করতে পারেন—প্লেনের ডানা তো বাস্তবে অমন বেঁকে থাকে না।

জবাবে আমি বলব, অত সূক্ষ্মবিচার এ-পর্যায়ে আমাদের না করলেও চলবে। প্লেনের ডানার গোটাটা অমন বেঁকে থাকে না বটে, কিন্তু ডানার শেষাংশ অমনভাবে বাঁকানোর ব্যবস্থা প্রায় সব প্লেনেই থাকে। সোজা কথায় ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, বাতাসের প্রতিবন্ধকতাটাকে কাজে লাগাতে—ঐ মাধ্যাকর্ষণের টানটাকে প্রতিহত কবতে, ডানাটাকে অল্প বাঁকানো হয়। এব বাঙলা প্রতিশব্দ কি হবে তা জানি না, ইংরাজিতে একে বলে dihedral। ঐ বাঁকানোর জন্য গতিপথের সঙ্গে যে কোণটি তৈরি হল তাকে বলি 'এ্যাঙ্গেল অফ ইন্সিডেন্স'।

এইবার পাঠককে স্যার জর্জ ক্যালেব প্রথম মডেলটিকে আর একবার দেখতে বলি। সেই যেটা তিনি ছাব্বিশ বছব বয়সে তৈরি কবেছিলেন। চিত্র ৫-এ দেখুন তিনি তাঁর সেই প্রথম মডেলেই ৬° ডিগ্রি 'এ্যাঙ্গেল অফ ইন্সিডেন্স' দিয়েছেন। এই গূঢ় তত্ত্বটা বুঝতেই লেগে গেল পঞ্চাশ বছব। অথচ সকলের চোখের সামনেই তাঁর প্রথম মডেলে পড়েছিল গুপ্তধনের চাবিকাঠি—'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা!'

রাধার সাড়া দিতে সময় লাগল পঞ্চাশ বছব!

কালানুক্রমিকভাবে স্যার জর্জের উত্তরসূরী হচ্ছেন উইলিয়াম স্যামুয়েল হেনসন আর জন স্ট্রীংফেলো। ওঁরা দুজনে মিলে একটা প্রকাণ্ড আকাশযান বানালেন ১৮৪৩-এ। নাম দিলেন 'এরিয়াল স্টিম ক্যারেজ'। তার ডানার বিস্তার ছিল দেড়শ' ফুট। পরবর্তী যুগের এয়ারোপ্লেনের সঙ্গে এর আকারগত সাদৃশ্য যথেষ্ট। তার

একটি ছবি চিত্র ৭-এ দেওয়া হল। এই প্রথম আকাশযানে এক জোড়া বাষ্পীয় এঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হল প্রপেলারটাকে ঘোরাতে। হেনসন আর স্ট্রীংফেলোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যন্ত্রটা

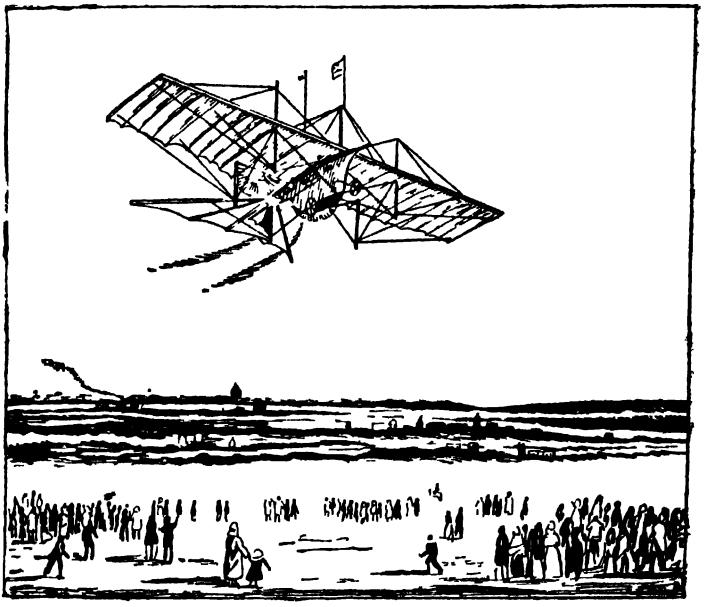

চিত্র—৭

হেনসন আর স্ট্রীংফেলোর পরিকল্পনায় উড্ডীয়মান 'এরিয়াল ক্যারেজ'

নির্ঘাত আকাশে উড়বে। যন্ত্রটা পরীক্ষা করা হল ১৮৪৭-এ। ঢালু পথ বেয়ে চালকবিহীন ঐ আকাশযান নেমে এল—কোলাব্যাঙের মত দু-একটা লাফও দিল বটে, কিন্তু আকাশে উড়ল না।

কেন যে সেটা আকাশে উড়ল না সেটা ওঁরা সেদিন বুঝতে পারেননি। আজ আমরা সেটা সহজেই বুঝি। প্রথমত অতবড় একটা যন্ত্রকে আকাশে ওড়াতে গেলে যত শক্তিশালী এঞ্জিনের প্রয়োজন তা ছিল না সেটায়। দ্বিতীয়ত জর্জ ক্যালে যে 'ডাইহেড্রাল'-এর ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তা লক্ষ্য করেননি ওঁরা।

একবার মাত্র ব্যর্থ হয়েই রণে ভঙ্গ দিলেন উইলিয়াম হেনসন। তার কারণ ছিল। সাফল্য সম্বন্ধে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে, পরীক্ষার আগেই সংবাদপত্রে কতকগুলি বিবৃতি দিয়ে বসেছিলেন তিনি। এমন কি প্যাসেঞ্জারবাহী একটা বিমান-সংস্থা খুলবার ইচ্ছা নিয়ে কাগজে কতকগুলি বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। সে বিজ্ঞাপনে লণ্ডন, প্যারী, এমন কি পিরামিডের উপর দিয়ে তাঁর প্লেন উড়ে যাচ্ছে এমন ছবিও জুড়ে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রথম ব্যর্থতাকে উপলক্ষ্য করে খবরের কাগজগুলো এমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ জুড়ে দিল যে, ব্যর্থ-মনোরথ হেনসন চিরদিনের মত ইউরোপ ত্যাগ করে আমেরিকায় চলে যান।

ওঁর বন্ধু স্ট্রীংফেলো কিন্তু ইয়োরোপে থেকেই আরও অনেক বছর পরীক্ষা চালিয়ে যান।

ঐ দুই বন্ধুর পরে এ পথের পথিকৃৎ হিসাবে যাঁদের নাম স্মরণীয় তাঁরা হচ্ছেন ফরাসীদেশীয় দুজন—দু তাহনপ্ল্ এবং ক্লিমেণ্ট এ্যাদের আর রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক আলেকজেণ্ডার মোজাইস্কি। সংক্ষেপে তাঁদের কথা বলি :

প্রথমত দু তাহনপ্ল্ ফরাসী নৌ-বিভাগের অফিসার ছিলেন। তিনি ছিলেন 'ক্রয়'-এর মানুষ; অর্থাৎ বিখ্যাত চিত্রকরের মত তিনিও ছিলেন 'দে-লা-ক্রয়ে', ক্রয়-এর মানুষ। ভারতবর্ষে যে বছর সিপাহী বিদ্রোহ হয়, সেই বছর তিনি একটি আকাশযানের মডেল তৈরি করলেন। এবার তিনি তার ডানায় দিয়েছেন 'ডাইহেড্রাল' অর্থাৎ বাঙ্কিত বঙ্কিমতা। প্রপেলারটাকে পিছন থেকে সরিয়ে এনেছেন সামনে। অর্থাৎ হেনসন-স্ট্রীংফেলো যে ভুল করেছিলেন সে ভুল দুটিকেই ওঁরা শুধরেছেন। যন্ত্রটার নিচে লাগিয়েছেন ট্রাই-সাইকেলের মত তিনটে চাকা। ডানাও ছিল তিনটে—অনেকটা তিনপাখা-ওয়ালা সিলিং ফ্যানের মত। এটা খুব কার্যকরী হল না বটে, কিন্তু সতের বছর পরে এরই একটা পরিবর্তিত মডেল কিছুটা সাফল্যলাভ করল। ঢালু জমিতে সবেগে নেমে

এসে একটা ব্যাঙের মত বার কয়েক থপ্ থপ্ করে লাফালো। তাকে 'আকাশে ওড়া' বলা চলে না—কিন্তু এই প্রথম মানুষ নিয়ে যন্ত্রচালিত একটি আকাশযান মাটি ছেড়ে বার-কতক লাফ তো মেরেছে।

দ্বিতীয়ত রাশিয়ার আলেকজাণ্ডার মোজেইস্কি। রাশিয়ানরা দাবী করে ১৮৮৪-তেই তাদের তৈরি একটা আকাশযান গুলোবেড্ নামে একজন পাইলট সমেত মাটি ছেড়ে আকাশে উঠেছিল। সেটা নাকি মাটি ছেড়ে কয়েকটা লাফও মারে। তাঁর আকাশযানের ওজন ছিল তিন টন আর তাতে ছিল তিন-তিনটে বাষ্পীয় এঞ্জিন।

তৃতীয়ত ফরাসী বৈজ্ঞানিক ক্লিমেণ্ট এ্যাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি দুটি মডেল আমদানি করেন। তাদের নাম ইয়োল (Eole) এবং আভিয় (Avion III)। দ্বিতীয় মডেলটা যেন হুবহু বাদুড়। তার ছবি প্রকাশ করেছিলেন যে ফরাসী সম্পাদক, তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন : আকাশে ওড়াব বিষয়ে যেটা ছিল মূল প্রতিবন্ধকতা সেটার সমাধান করেছেন মসিয়ে এ্যাদের। সেই পর্তুগীস দ্য গামার 'প্যাসারোলা' থেকে আজ পর্যন্ত সবাই পাখীকে আদর্শ করে চলতে চেয়েছেন ; কিন্তু তাঁরা খেয়াল করে দেখেননি—পাখি ডিম পাড়ে, তার পালক আছে—সে স্তন্যপায়ী নয়। মসিয়ে এ্যাদের তাই

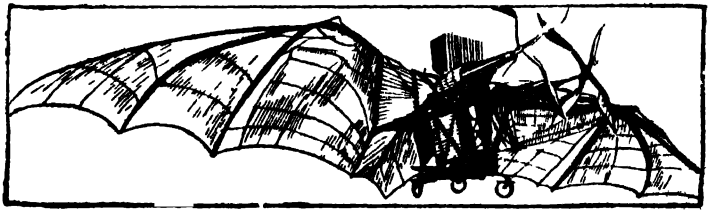

চিত্র—৮

এবার স্তন্যপায়ী বাদুড়কে তাঁর আদর্শ করেছেন। এইবার আকাশযান নির্ঘাৎ উড়বে। (চিত্র—৮)

এ ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হল না। ইয়োল অথবা এ্যাভিয়ঁ আকাশে উড়ল না। তবে হ্যাঁ, এ্যাভিয়ঁ-তিন একটা প্রকাণ্ড লাফ মেরেছিল—পাক্কা দেড়শ' ফুট।

আমরা ইতিমধ্যে কালানুক্রমিকভাবে এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। এতদিনের ব্যর্থতা এবার সফল হল বলে। কিন্তু সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা বলার আগে আর একটি লোকের নাম অনিবার্যভাবে করতে হবে। শিবমন্দিরের সম্মুখে নন্দীর মত, বিষ্ণুমন্দিরের সামনে গরুড়-স্তম্ভের মত এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারের ব্যূহমুখে আছেন এই দুর্ধর্ষ বেপরোয়া মানুষটি— যাঁকে বলা হয় 'এয়ারোপ্লেনের কারিগরি-বিদ্যার জনক'। জার্মানীর অটো লিলিয়ঁাথাল। অথচ মজার কথা, তিনি সত্যিকারের 'যন্ত্রচালিত' আকাশযান তৈরি করার কোন চেষ্টা আদৌ করেননি। লিলিয়ঁাথাল তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন—বাষ্পীয় এঞ্জিনে এয়ারোপ্লেন কোনদিনই আকাশে উড়বে না। ততদিনে পেট্রোল-এঞ্জিন, যাকে বলে 'ইণ্টারনাল কম্‌বাশ্‌শান এঞ্জিন' তা আবিষ্কৃত হয়েছে। পেট্রোল-চালিত ছোটখাটো মটোর তৈরি হয়েছে—কিন্তু মানুষের ওজন-সমেত কোন আকাশযানকে চালাতে হলে যতখানি শক্তির প্রয়োজন সে-আমলের পেট্রোল-এঞ্জিনের তা ছিল না। লিলিয়ঁাথাল একথাও জানতেন যে, অমন পেট্রোল-এঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়নি বটে, তবে হল বলে। উনি প্রায়ই বলতেন—শুধু এঞ্জিন হলেই তো চলবে না, আরও অনেকগুলি সমস্যার সমাধান চাই। সে সমস্যার সমাধান আপাতত করতে পারে গ্লাইডার।

তাই জর্জ ক্যালের অসমাপ্ত কাজ নূতন করে শুরু করলেন তিনি। অসংখ্য গ্লাইডারের মডেল তৈরি করলেন। দীর্ঘ ছ' বছর ধরে। একাদিক্রমে কয়েক হাজারবার পাহাড়ের মাথা থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। তাঁর নামই হয়ে গেল—'উড়ন্ত মানুষ'। (প্লট—২)

উনি না হয় গ্লাইডার নিয়ে মেতেছেন, কিন্তু আর পাঁচজন তো তখনও যন্ত্রচালিত এয়ারোপ্লেনের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের

বার বার ছুটে আসতে হত তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে, তাঁর ঝাঁপ মারা দেখতে। লিলিয়াঁথাল তাঁর বিভিন্ন মডেলের আকার ও আকৃতি বদলে, 'ডাইহেড্রাল' বাড়িয়ে-কমিয়ে, ল্যাজে ও ডানায় সুতো বেঁধে, টেনে ও ঢিল দিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা করে যাচ্ছেন আর তার ফলাফলগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে যাচ্ছেন তাঁর নোটবুকে। কেউ দেখতে চাইলেই দেখাতেন।

ইংল্যাণ্ডের পার্সি পিলচার তখন একটা আকাশযান বানাবার পরিকল্পনা করছেন। তিনি এলেন লিলিয়াঁথাল-এর সঙ্গে দেখা করতে। সসঙ্কোচে বললেন, আপনার পরীক্ষার ফলাফলগুলি একবার দেখতে পারি?

লিলিয়াঁথাল হেসে বলেছিলেন, আপনি ভুল করেছেন। আমি এয়ারোপ্লেন আবিষ্কার করবার ব্রত নিয়ে এ-কাজ করছি না। আমি সেই আবিষ্কারের পথ পরিষ্কার করবার ব্রত নিয়েই কাজ করছি। আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, মিঃ পিলচার। আমার সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল তো আপনাদের জন্যই।

নিরভিমানী বৈজ্ঞানিকের এ-কথা শুনে পিলচার অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, কী আশ্চর্য! এতবড় প্রতিভা নিয়ে আপনি এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারের চেষ্টাই করছেন না? আপনি কি বোঝেন না—আপনার এ পরীক্ষার কোন দাম দুনিয়া দেবে না—আর এয়ারোপ্লেনের আবিষ্কারকের উদ্দেশ্যে সারা দুনিয়া একদিন মাথার টুপি খুলবে?

লিলিয়াঁথাল এবারও হেসে বলেছিলেন, জানি বন্ধু। সারা দুনিয়ার মানুষ যে মানুষটির উদ্দেশ্যে মাথার টুপি খুলবে সেই মানুষটিই আমার উদ্দেশ্যে মাথার টুপি খুলবে। তার পাথেয় সে যে পাবে আমার কাছেই।

তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। আপনি আমি লিলিয়াঁথালের কথা ভুলতে পারি—এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারক তাঁকে কোনদিনই ভোলেননি।

১৮৯৬ সালের ৯ই আগস্ট—অর্থাৎ এয়ারোপ্লেন আবিষ্কৃত হবার মাত্র সাত বছর আগে এমনি এক ঝাঁপ দিতে গিয়ে প্রাণ হারালেন অটো লিলিয়াঁথাল। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়নি, হয়েছিল তার পরদিন, হাসপাতালে। নিরভিমান বৈজ্ঞানিকটি কোন ক্ষোভ নিয়ে যাননি। তাঁর শেষ কথা ছিল: তা কিছু লোককে তো মরতে হবেই। দাম না দিলে কি কিছু পাওয়া যায়?

লিলিয়াঁথাল ক্রমাগত গ্লাইডার নিয়ে ঝাঁপ দিচ্ছেন, এয়ারোপ্লেন তৈরির চেষ্টাই করছেন না। তার মানে এ নয় যে, কেউ তা করছে না। ঐ সময় পৃথিবীর তিন প্রান্তে তিনজন,—তিনজন নয়, চার-জন, সেই চেষ্টাই করছিলেন। একজনের কথা আগেই বলেছি—ইংলণ্ডের পার্সি পিলচার, যিনি লিলিয়াঁথালের সঙ্গে দেখা করতে বার্লিনে এসেছিলেন। দ্বিতীয় জন—ফ্রান্সের স্যামুয়েল পিয়ারপণ্ট ল্যাংলে। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং প্যারীর স্মিথ্‌সোনিয়ান ইন্সটিট্যুশানের সেক্রেটারী। তাঁর অর্থও ছিল যথেষ্ট, বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানও ছিল প্রচুর। তৃতীয় দল হলেন মার্কিন-মুলুকের দুই ভাই—উইলবার আর অরভিল রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়। বার্লিন হাসপাতালে লিলিয়াঁথাল যখন শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন দাদা উইলবারের বয়স উনত্রিশ আর ছোটভাই অরভিলের বয়স পঁচিশ।

এ-ছাড়াও আরও কয়েকজন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন—জার্মানীর কার্ল জাথো, অস্ট্রেলিয়ার লরেন্স হারগ্রেভ কিংবা ইংলণ্ডের ব্রাউন। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল চরম সাফল্যের সম্মুখীন হবেন ঐ প্রথমোক্ত তিন দলের কেউ একজন—পিলচার, ল্যাংলে অথবা রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়। প্রতিযোগিতা এখন ত্রি-মুখী হয়েছে—ফাইনাল খেলায় কে যেতে তাই দেখার জন্য সমগ্র বিজ্ঞান-জগৎ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রহর গুনছে।

তিন প্রতিযোগীকে আর একটু কাছ থেকে দেখা যাক।

পিলচার ছিলেন নৌ-বিভাগের অফিসার। অল্প বয়স, প্রচণ্ড উৎসাহী। লিলিয়াঁথালের নোটবই ঘেঁটে যাবতীয় তথ্য লিখে এসেছেন। একের পর এক পরীক্ষা করে যাচ্ছেন গ্রেট ব্রিটেনে তাঁর একান্ত পরীক্ষাগারে। ল্যাংলে একজন স্বনামধন্য লোক—বয়সে কিছু বড়—জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত। প্যারীতে বসে তিনি পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। অপরপক্ষে রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় থাকেন সুদূর আমেরিকার ওহিও প্রদেশের ডেটন-এ। সেখানে দু-ভাইয়ের ছিল একটা সাইকেলের দোকান। রাইট-ভাইরা সঙ্কল্প করেছিল আকাশে ওড়ার যন্ত্র তারাই সর্বপ্রথম তৈরি করবে। কিন্তু এ নিয়ে তাদের তাড়াহুড়া ছিল না। ধীর-স্থিরভাবে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল সঙ্কল্পের দিকে। দীর্ঘ তিন-চার বছর ধরে তারা পূর্বসূরীদের মডেলগুলি পুনরায় বানিয়ে পরীক্ষা করেছিল, নূতন নূতন মডেল বানিয়ে আকাশে উড়েয়েছিল। ১৮৮০ নাগাদ পেট্রোল-এঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে তিন দলই জানতেন—অচিরে উপযুক্ত এঞ্জিন পাওয়া যাবে অথবা তৈরি করে নেওয়া যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে আকাশযানটাকে কি করে আয়ত্বের মধ্যে রাখা যায়—ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকানো যায়, উপরে-নিচে ওঠানো-নামানো যায়! কি করে মাটি থেকে ওঠা যায়, যাকে বলে 'টেক্-অফ' ; কি করে নিরাপদে নামা যায়, যার নাম—'ল্যাণ্ডিং'!

রাইট-ভাইয়েরা সংবাদ পেলেন অকটেভ শ্যালুট নামে একজন আমেরিকান একটি বই লিখেছেন "Progress in Flying Machine"। তাতে নাকি তিনি ধারাবাহিকভাবে সে পর্যন্ত ঐ প্রচেষ্টায় কে কী করেছেন তার বিবরণ লিখে গেছেন। বিভিন্ন মডেলের ছবি দিয়েছেন, তাদের কার্যকারিতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন—এমন কি লিলিয়াঁথাল তাঁর নোটবইতে যা কিছু উপদেশ ভবিষ্যত আবিষ্কারকদের উদ্দেশে রেখে গেছেন তাও সঙ্কলন করেছেন। হাতে স্বর্গ পেলেন ওঁরা। আমেরিকায় ইতিপূর্বে এ নিয়ে তেমন কেউ

চর্চা করেননি। পরীক্ষা যা হয়েছে তা অধিকাংশই ফ্রান্স অথবা জার্মানীতে। সুদূর আমেরিকায় বসে সব কিছু খুঁটিনাটি সংবাদ ওঁরা পাচ্ছিলেন না। অকটেভ-এর লেখা ঐ "আকাশযানের ক্রমোন্নতি" গ্রন্থখানি ওঁদের বাইবেল হয়ে উঠল। দুভাই সেটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে ফেললেন, নোট নিলেন, নানান ছোটখাটো মডেল তৈরি করে যাচাই করলেন। এমন কি লেখকের সঙ্গে পত্রালাপ করে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করলেন। দাদা উইলবার তাঁর ভাইকে বললেন, হাজার যাইহোক মানুষ কয়েক শ' বছর ধরে উড়বার চেষ্টা করেছে, পারেনি। তাড়াহুড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন আর আমাদের প্রতিযোগী কেউ নেই এ দুনিয়ায়। আমরাই সর্বপ্রথম উড়ব।

ভাই বললেন, তা, ঠিক।

দুভাই বোধকরি জীবনে একটি ভুলই করেছেন। তা ঐ সিদ্ধান্ত।

ব্রিটেনে পার্সি পিলচারের কথাই ধরা যাক। লিলিয়াঁথালের কাছ থেকে ফিরে এসে পিলচার মেতে উঠলেন একটা যন্ত্র বানাতে। লিলিয়াঁথালের গ্লাইডারের মতই দেখতে—চালককে অমনিভাবে ঝুলতে হবে যন্ত্রটা থেকে। কিন্তু উনি তার নিচে এবার চাকা লাগালেন, যাতে সেটা অনায়াসে মাটিতে টেনে নেওয়া যায়। ডানায় 'ডাইহেড্রাল' দিলেন, ল্যাজের প্রান্তটা তার দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে টেনে বাঁকাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু লিলিয়াঁথালের মত গ্লাইডার বানাচ্ছেন না তিনি। তাঁর লক্ষ্য—যন্ত্রচালিত আকাশযান। সুতরাং এবার ওটাতে একটা এঞ্জিন বসাতে হয়। বাজারে অনেক ঘোরাঘুরি করেও উপযুক্ত এঞ্জিন পেলেন না। তা না পাওয়া যাক —উদ্যোগী পুরুষসিংহের কাছে কোন বাধাই বাধা নয়। তিনি নিজেই একটি পেট্রোল-এঞ্জিন বানাতে লেগে গেলেন। সব কথা তিনি লিলিয়াঁথালকে চিঠি লিখে জানালেন। জার্মানী থেকে লিলিয়াঁথাল প্রত্যুত্তরে প্রচুর উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, যন্ত্রটা দেখতে পারলে হত।

অতবড় যন্ত্র নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে জার্মানী যাওয়া যায় না। তাই পার্সি পিলচার অটো লিলিয়াঁথালকে একটি চিঠি লিখলেন—ইংলণ্ডে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে। চিঠিতে তিনি লিখলেন, আমি এই যন্ত্রটার নাম দিয়েছি 'দ্য হক' অর্থাৎ বাজপাখী। আপনি এখানে এসে আমার অতিথি হন। আমার ইচ্ছা আপনার উপস্থিতিতেই গ্লাইডার হিসাবে 'হক'-এর প্রথম পরীক্ষা হ'ক।

এ চিঠিখানি পিলচার ডাকে দেননি। ঘটনাটা ১৮৯৬-এর আগস্ট মাসের। চিঠি লেখার পরদিন সংবাদপত্রে খবর বার হল—বার্লিনে পরীক্ষা-নিরত লিলিয়াঁথাল মারাত্মক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন।

সারাদিন পিলচার অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। কোন কিছুতেই মন বসল না। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি। মনের ভারসাম্য ফিরে পেলেন পরের দিন সংবাদপত্র পড়ে। বার হয়েছে খবর। হাসপাতালে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন 'এয়ারো-প্লেনের জনক'! তাঁর শেষ কথা: "তা কিছু লোককে মরতে তো হবেই! দাম না দিলে কি কিছু পাওয়া যায়?"

পিলচার 'দ্য হক' গ্লাইডারের পরীক্ষা আর করলেন না। তিনি স্থির করলেন এঞ্জিন-যুক্ত করে ওটাকে নিয়ে এয়ারোপ্লেন হিসাবে পরীক্ষা করবেন সরাসরি। তৈরি করতে বসলেন পেট্রোল-চালিত 'ইণ্টারনাল কমবাশ্‌শান এঞ্জিন'—সোজাসুজি নিজের হাতে। দীর্ঘ তিন বছরের পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত তৈরি হল সেই এঞ্জিন। পরীক্ষা করে দেখা গেল তার ক্ষমতা চার অশ্বশক্তি। হিসাব করে দেখলেন, তাঁর আটচল্লিশ ইঞ্চি ব্যাসের প্রপেলারটাকে ঐ এঞ্জিনটা অনায়াসে ঘোরাতে পারবে। অঙ্কশাস্ত্রমতে আকাশযানের আকাশে ওঠার কথা।

উনি সব কথা জানিয়ে এবার একটি চিঠি লিখলেন হারবরোতে লর্ড ব্রায়েকে। লর্ড ব্রায়ে ওঁর পূর্ব-পরিচিত। পিলচার বোধকরি ভেবেছিলেন, তাঁর পরীক্ষার সময় একজন বিশিষ্ট সাক্ষী থাকা ভালো

—তাহলে সাফল্যলাভ সম্বন্ধে কেউ আর সন্দেহ করবে না। লর্ড ব্রায়ে রাজী হলেন। স্থির হল, তাঁর প্রাসাদের চত্বরে পিলচার তাঁর 'থ্য হক' নিয়ে পরীক্ষা করবেন। ইতিমধ্যে তিনি দ্বিতীয় আর একটি আকাশযানও বানিয়েছেন। সেটা আকারে কিছু বড়। দুটি আকাশযান আর এঞ্জিন নিয়ে পিলচার এলেন লর্ড ব্রায়ের প্রাসাদে ; তারিখটা হচ্ছে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯। অর্থাৎ জর্জ ক্যালের প্রথম গ্লাইডার-মডেল তৈরির ঠিক একশ' বছর এবং লিলিয়াঁথালের মর্মান্তিক মৃত্যুর তিন বছর পরে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন বৃষ্টি হল এক পশলা।

বড় 'বাজপাখী'টা বৃষ্টিতে ভিজে একশা!

অর্থাৎ সেটা আর কোনক্রমেই উড়বে না।

কিন্তু পিলচার তাঁর পরীক্ষাকার্য স্থগিত রাখতে রাজী হলেন না। প্রথম মডেল ছোট 'বাজপাখী'তেই এঞ্জিনটা লাগিয়ে তিনি উড়বার চেষ্টা করলেন। এই সময়ে লর্ড ব্রায়ের ব্যবস্থাপনায় একজন ক্যামেরাধারী একটি ফটো নিয়েছিল। ছবিতে দেখছি ছোট 'বাজপাখীর' প্রপেলারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন লর্ড ব্রায়ে। দুজনে দুদিক থেকে ধরে থাকায় পার্সি পিলচার বস্তুত শূন্যে ভাসছেন। যন্ত্রটায় দুটি চাকা আছে, সামনের প্রপেলারটা আটচল্লিশ ইঞ্চি নয়, ছোট। এটা বড় 'বাজপাখী' নয়। পিলচারের পায়ের সঙ্গে বাঁধা আছে অনেকগুলি দড়ি—যার অপরপ্রান্ত ডানা অথবা লেজের সঙ্গে যুক্ত।

প্রাথমিক গতি লাভ করার জন্য দুটি ঘোড়া দিয়ে আকাশযানটা টানা হল। দুর্ভাগ্য পিলচারের—দড়ি গেল ছিঁড়ে।

লর্ড ব্রায়ে বললেন, আজকের দিনটায় তোমার ভাগ্য খারাপ দেখা যাচ্ছে। আজ বরং থাক।

কিন্তু পিলচার তখন উৎসাহে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছেন। বললেন, না স্যার। আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

দ্বিতীয়বার এঞ্জিন চালু করলেন তিনি। প্রপেলারটা ঘুরছে।

অশ্বচালকের ইঙ্গিতমাত্র ছুটি ঘোড়া ছুটল সামনের দিকে। কিছুটা ছোটার পরেই বাজপাখীর চাকা মাটি ছেড়ে উঠল। পিলচার উঠে যাচ্ছেন শূন্যে! পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত! কিন্তু চরম দুর্ঘটনা ঘটল এইবার। একটা বাঁশের ডাণ্ডা গেল ভেঙে। সশব্দে মাটিতে আছড়ে এসে পড়লেন পিলচার!

মারাত্মক আঘাত লেগেছে তাঁর। তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। দুদিন বেঁচে ছিলেন তিনি। তৃতীয় দিন তিনি তাঁর পূর্বসূরী লিলিয়েঁথালের সঙ্গে মিলিত হলেন।

পার্সি পিলচারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিন প্রতিযোগীর একজন বাদ গেলেন। এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় গ্রেট-ব্রিটেনের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল ধূলিসাৎ হল তা।

বাকি রইল: ফ্রান্স আর আমেরিকা। ল্যাংলে, না রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়?

এবার স্যামুয়েল পিয়ারপণ্ট ল্যাংলের কথা বলি:

ফ্রান্সে ল্যাংলেও ব্যাপৃত ছিলেন তাঁর একান্ত সাধনায়। যে বছর পিলচার মারা যান সেই বছরই ল্যাংলের তৈরি একটি আকাশযান—তার নাম দিয়েছিলেন 'এয়ারোড্রোম'- বেশ কিছুটা উড়েছিল। দুই অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট এঞ্জিনের সাহায্যে ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে আকাশযানটা নাকি অনেকটা উড়ে যায়।

সংবাদটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হলে মার্কিন সরকার ল্যাংলেকে একটি আকাশযান বানিয়ে দিতে বললেন। ততদিনে (১৮৯৮) আমেরিকা স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে—মার্কিন সমর-নায়করা মনে করলেন কোন আকাশযানের সাহায্যে যদি শত্রুপক্ষের সৈন্যসমাবেশ নিরাপদ দূরত্ব থেকে দেখে আসা যায় তবে মন্দ হয় না। অর্থাৎ আকাশে ওড়ার স্বপ্ন সফল হওয়ার আগে থেকেই সমর-নায়কেরা যন্ত্রটার অপব্যবহারের কথা চিন্তা করছেন। দে-লানা তাহলে ঠিকই বলেছিলেন!

সে যাইহোক, ল্যাংলে এতে খুশিই হলেন। তাঁর পরীক্ষার খরচ এখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহন করবে। সেটাই তো একটা মস্ত লাভ।

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে গেল। ১৯০৩-এর সাতই অক্টোবর ল্যাংলে তাঁর 'এয়ারোড্রোম' নিয়ে প্রস্তুত হলেন প্রথম পরীক্ষাকার্যের জন্য। ডানা দুটিতে 'ডাইহেড্রাল' দেওয়া হয়েছে, লেজটা ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকানো যায়, আর তাতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটা চমৎকার ৫২ অশ্বশক্তির পাঁচ সিলিণ্ডারওয়ালা রেডিয়াল এঞ্জিন। এটা বানিয়ে দিয়েছিলেন যে এঞ্জিনিয়ার তাঁর নাম চার্লস ম্যান্‌লে।

ল্যাংলে উনসত্তর বছরের বৃদ্ধ। নিজে ঐ আকাশযানে উড়বার বয়স আর নেই। চার্লস ম্যান্‌লেই সেটা নিয়ে উড়তে রাজী হলেন। ওঁরা স্থির কবলেন মাটি থেকে নয়, আকাশযানটাকে ওড়ানো হবে নদীবক্ষ থেকে। এমন সিদ্ধান্ত কেন? ল্যাংলে বোধকরি ভেবেছিলেন নদীবক্ষে বাড়ি-ঘর-গাছ-পালা নেই, দ্বিতীয়ত, —পড়ে গেলে আঘাতটাও কম লাগবে। মোটকথা ঐ সাতই অক্টোবর তারিখে পোটোম্যাক নদীর দুই তীরে সেদিন কাতারে কাতারে দাঁড়ালো দর্শকেরা। ক্যামেরা নিয়ে প্রেস-ফটোগ্রাফারের দল এবং বলাবাহুল্য মার্কিন সমর-দপ্তরের তরফে কিছু অফিসার। একটা হাউস-বোটের উপর গুল্‌তির মতো একটি যন্ত্র বসানো হয়েছিল। আকাশযানটাকে প্রথমে টেনে সেটা সামনের দিকে ছেড়ে দেবে। যাকে ইংরাজিতে বলে 'ক্যাটাপুল্ট অপারেশন'।

ম্যান্‌লে চাপলেন ঐ 'এয়ারোড্রোমে'। এঞ্জিনটা চালু করা হল। প্রপেলারটা ঘুরছে। সবাই রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রহর গুন্‌ছে। ক্যাটাপুল্ট-এর ধনুক থেকে এবার নিক্ষিপ্ত হল আকাশযান। নিতান্ত দুর্ভাগ্য ওঁদের—সোজা পথে না গিয়ে একটু বেঁকে গেল যন্ত্রটা! আঘাত লাগলো হাউস-বোটের প্রান্তে একটি খুঁটিতে। আঘাত লেগে উল্টে পড়ল নদীতে। একেবারে চিৎ হয়ে! জখম

হল যন্ত্রটা। ম্যান্‌লের কোন আঘাত লাগেনি, শুধু কিছুটা নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছিল তাঁকে। দুর্ঘটনা অনেক বড় ধরনের হতে পারত। এটা তেমন কিছু মারাত্মক নয়। ল্যাংলে বসলেন তাঁর যন্ত্রটাকে সারাতে।

ওদিকে আমেরিকায় তখন কি খবর? রাইট-ভাইয়েরা কি করছেন?

তাঁরাও প্রায় তৈরি। একথা জানতেন না ল্যাংলে। রাইট-ভাইদের আকাশযান সাফল্যলাভ করেছিল ল্যাংলে সাহেবের ঐ দুর্ঘটনার মাত্র দুমাস দশদিন পরে—১৭ই ডিসেম্বর। অর্থাৎ ল্যাংলের কপালে সেদিন ঐ দুর্ঘটনা না ঘটলে—কে বলতে পারে--হয়তো ল্যাংলের নামই লিখিত হত এয়ারোপ্লেনের আবিষ্কারক হিসাবে! বস্তুত ল্যাংলেকেই এ সম্মান দেওয়া হয়েছিল প্রথম কয়েক বছর। রাইট-ভাইয়েদের বরাতে সম্মানটা জোটে বেশ কিছু দিন পরে। কেন, সেই গল্পই এবার শোনাব:

দীর্ঘ সাড়ে চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে রাইট-ভাইয়েরাও প্রায় তৈরি। তাঁরা পর পর তিনটি মডেল তৈরি করেন। ওঁরা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এক নির্জন প্রান্তরে এই পরীক্ষাকার্য করে দেখতে। নর্থ ক্যারোলিনার 'কিটি হক' অঞ্চলে। ওঁদের বাড়ি ওহিও প্রদেশ থেকে বেশ কিছুটা দক্ষিণে। সেখানে 'কিল ডেভিল হিল' বলে এক নির্জন স্থানে থানা গাড়লেন দুভাই। কেউ কেউ বলেছেন—গোপনে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই ওঁরা এমন নির্জন অন্তেবাসীর জীবন যাপন করেন। ওঁরা কিন্তু তা স্বীকার করেননি। বলেছিলেন—জায়গাটা পছন্দ হয়েছিল তিনটি কারণে। প্রথমত, বেশ কিছুটা বালি ছিল জমিতে—পড়ে গেলে আঘাতটা কম লাগবে; দ্বিতীয়ত, বছরের সব সময়েই এখানে মৃদু-মন্দ হাওয়া বয়, যা নাকি আকাশযান চালানোর পক্ষে সহায়ক। আর অস্বীকার করে কী লাভ—উদ্যত-লেখনী সংবাদপত্রের নিজস্ব

সংবাদদাতাদের কাছ থেকে অনিবার্য প্রাথমিক ব্যর্থতা গোপন করার উদ্দেশ্যও তাঁদের ছিল।

এক নম্বর মডেলটি নিয়ে ওঁরা পরীক্ষা করেন ১৯০৫ সালে। সেটা ছিল চালকহীন ঘুড়িরই উন্নত সংস্করণ—গ্লাইডার বিশেষ। পরের বছর আরও উন্নত ধরনের দু-নম্বর মডেলটির পরীক্ষা করা হল। আবার তাঁরা ফিরে গেলেন ওহিও-তে, নিজেদের ডেরায়। ইতিমধ্যে তাঁরা একটা চোঙা তৈরি করে তার মধ্যে কৃত্রিম বাতাস ফ্যানের সাহায্যে চালিয়ে প্লেনের ডানার উপর প্রতিক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করেছেন—যাকে বলে 'উইণ্ড-টানেল'। 'এয়ারোফয়েল' বা বাধা-প্রাপ্ত বাতাসের গতিপথের হেরফের তাঁরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে লিপিবদ্ধ করে নানান ছোট ছোট মডেল পরীক্ষা করে দেখেন। অবশেষে শত শত পরীক্ষার পর তাঁদের তিন নম্বর মডেলটি তৈরি হল। নাম দিলেন—'ফ্লায়ার'।

চমৎকার যন্ত্রটা। ডানার বিস্তার প্রায় চল্লিশ ফুট। এক এক দিকে দুটি ডানা, মানে বাই-প্লেন। এঞ্জিনটা হচ্ছে বারো-ঘোড়ার, চার সিলিণ্ডার-বিশিষ্ট পেট্রোল-এঞ্জিন। ম্যান্‌লের বাহান্ন-ঘোড়ার রেডিয়াল এঞ্জিনটা ছিল অনেক বেশি জোরালো এবং অনেক উন্নত ধরনের। তা হ'ক, দুভাই তাঁদের ঐ বারো-ঘোড়ার এঞ্জিনটা নিয়েই সন্তুষ্ট। তেমনি তাঁদের প্রপেলারটা ছিল অনেক বেশি উন্নত—তাতে ফ্যানের ব্লেডের মত কিছুটা বাঁক দেওয়া হয়েছিল যা নাকি ইতিপূর্বে কেউ দেননি।

১৯০৩-এর অক্টোবরে ওঁরা আবার ফিরে এলেন কিটি হক-এ। যাবার আগেই ওঁরা খবর পেলেন ফ্রান্সে ল্যাংলের আকাশযানটি আহত হয়ে নদী গর্ভে পড়েছে। দুভাই বুঝতে পারলেন অনতি-বিলম্বেই ল্যাংলে সেটি মেরামত করে ফেলবেন। তার মানে এখন যে তাড়াতাড়ি করতে পারবে সেই জিতবে। এ যেন অনেকটা সেই উত্তর মেরু জয়ের প্রতিযোগিতা; কিংবা বলতে পারেন চাঁদে পৌঁছানোর জন্য রাশিয়া আর আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

'ফ্লায়ার' নিয়ে প্রথম পরীক্ষাও সাফল্যলাভ করল না। এঞ্জিন চালু করা মাত্র সেটা 'ব্যাক-ফায়ার' করল—একটা প্রপেলার গেল মুচড়ে! দাদা উইলবার কিটি হক-এই রয়ে গেলেন, ভাই অরভিল ছুটলেন দেশের বাড়িতে। জখম খাওয়া প্রপেলারটা মেরামত করে আনতে। সেটা মেরামত করে উনি ফিরে এলেন (২০শে নভেম্বর)।

দুভাই নতুন প্রপেলারটাকে জুড়তে ব্যস্ত। দুটো প্রপেলারকে একটা সাইকেলের চেন দিয়ে সংযুক্ত করা হল। এই সময় একদিন সকালে ছোট ভাই অরভিল বললে, দাদা এই দেখ কাগজে কী বার হয়েছে! ল্যাংলে ৮ই ডিসেম্বর তাঁর যন্ত্রটা সারিয়ে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করেছেন।

দুভাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন খবরের কাগজটার উপর। খবর সত্য। বোস্টনের একটি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে বিস্তারিত বিবরণ। ল্যাংলে তাঁর আহত যন্ত্রটা সারিয়ে নদীবক্ষেই পুনরায় সেটা ওড়াবার চেষ্টা করেন—৮ই ডিসেম্বর। দুর্ভাগ্যবশত এবারও নৌকার গলুইয়ে লেগে আকাশযানটা নদীবক্ষে উল্টো হয়ে পড়ে। বোস্টন পত্রিকার সংবাদদাতা এ দুর্ঘটনায় কৌতুক বোধ করে একটি মর্মান্তিক পরিহাস করেছেনঃ "আমরা প্রফেসার ল্যাংলের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানী নই, তবে সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা তাঁকে একটা পরামর্শ দিতে পারি—এর পরের বার তিনি যেন উল্টো করে তাঁর যন্ত্রটা ছাড়েন; তাহলে সেটা নদীবক্ষে সোজা হয়ে পড়বে। চালক বেচারি ম্যান্‌লের আঘাতটা কম লাগবে!"

কাগজ থেকে মুখ তুলে দাদা উইলবার বললেন, প্রফেসার সাতদিনের মধ্যে এ ব্যঙ্গোক্তির জবাব দেবেন। আমাদের যা করতে হবে তা এই সপ্তাহের মধ্যেই করা দরকার।

অতলান্তিকের এ-পারে বসে উইলবার ও-পারের খবরটা ঠিকমত আন্দাজ করতে পারেননি। ল্যাংলে ইতিমধ্যে তাঁর শেষ কপর্দক পর্যন্ত খুইয়ে বসেছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ঘরে-বাইরে

আর মুখ দেখাতে পারছেন না। সংবাদপত্রের ঐ সুরসিক লেখকের শেষ আঘাতে তিনি সরে দাঁড়ালেন এ প্রতিযোগিতা থেকে। রাইট-ভাইয়েরা জানতেন না—সেদিন সারা বিশ্বে তাঁদের আর প্রতিযোগী কেউ ছিল না।

১৭ই ডিসেম্বর সকাল। দুভাই এসে দাঁড়াল কিটি হকের উন্মুক্ত প্রান্তরে। গুটি তিন-চার বন্ধুও হাজির। তাঁদের মধ্যে একজনের ছিল একটা ক্যামেরা। কে আগে চেষ্টা করবে দেখার জন্য দুভাই টস করল। টসে জিতল দাদা উইলবার। উঠে বসল সে বিমানে। চালিয়ে দিল এঞ্জিনটা। ভাইকে ইঙ্গিত করল দড়িটা আলগা করে দিতে। দড়ি খুলে দেওয়া হল। ফ্লায়ার এগিয়ে চলল সামনের দিকে। অমনি উইলবার সামনের 'এলিভেটারটাকে' দড়ি-টেনে দিল বাঁকিয়ে—যাতে সেটা আকাশে ওড়ে। এইখানেই ভুল হল তার। বিমানটা মাটিতে তখনও যথেষ্ট গতিবেগ লাভ করেনি। বড় তাড়াহুড়া করে ফেলেছে উইলবার, উত্তেজনার বশে। ঘাড় গুজড়ে পড়ল যন্ত্রটা। না—আঘাত লাগেনি চালকের ; বিমানেরও কোন ক্ষতি হয়নি।

দুভাই পরামর্শ করল। দুজনেই একমত—সময়ের কিছু আগে 'এলিভেটারটা'কে বাঁকানো হয়েছে। অরভিল বলে, আবার চেষ্টা করে দেখ দাদা।

উইলবার বললে, তা তো করতেই হবে। তবে এবার তো আমার দান নয়। আমি 'চান্স মিস্' করেছি। তুই এবার চালাবি।

সোৎসাহে অরভিল উঠে বসে বিমানে। এবার সে চালিয়ে দিল এঞ্জিনটা। এবার সে ইঙ্গিত করল দাদাকে। উইলবার দড়িটা কেটে দিল। ভাই এবার ভুল করেনি। ঠিক সময়েই বাঁকিয়ে দিল এলিভেটারটা। যন্ত্রটা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। ঠিক তখনই ওর বন্ধু ক্যামেরার সাটারটা এক লহমার জন্য খুলে দিল। বিশ্বের দুর্লভতম ফটোগুলির মধ্যে এটি অন্যতম (প্লেট—২)।

অরভিলকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না ; কিন্তু বোঝা যাচ্ছে প্রথম আকাশযান মাটি ছেড়ে ফুট-তিনেক মাত্র উঠেছে। দেখা যাচ্ছে দাদা উইলবারকে—সে ছুটে আসছে সোৎসাহে বিমানের দিকে !

ছবিটি উঠেছিল ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৩-এ, সকাল দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে।

তাতে বন্দী হয়েছে মানব-ইতিহাসের এক চিহ্নিত খণ্ডকাল।

বারো সেকেণ্ড ফ্লায়ার ছিল আকাশে, উড়েছিল একশ' কুড়ি ফুট !

ঐ দিনই আরও বার-কতক দুভাই ওটা নিয়ে ওড়ে। শেষ-বেশ দাদাই রেকর্ড করল—সে আকাশে ছিল ৫৯ সেকেণ্ড, গিয়েছিল ৮৫২ ফুট।

তা হোক, নিঃশেষে প্রমাণ হল মানুষ উড়তে পারবে। মানুষ উড়েছে !

কিন্তু কেন ?

উড়ে কোথায় যাবে মানুষ ? পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ? গেল ! তাতে হলটা কি ? চাঁদে ? তা-ও না হয় গেল ! তারপর ? তবু বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে যে প্রশ্নটা করেছিল মূর্খ দর্শক তার জবাব পেলাম কোথায় ?

: এতে কার কি ফয়দা হবে বলতে পারেন মশাই ?

ফয়দা কতটা হল, আদৌ হল কিনা, একটু পরেই তা আমরা দেখব।

আমেরিকান মহাকাশযান এ্যাপোলো থেকে যেদিন মানুষ প্রথম চাঁদের মাটিতে পা দিল সেদিনকার কথাটা আমরা কেউই ভুলতে পারব না। সারা পৃথিবীতে সে কী উন্মাদনা ! বিশ্বের প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাণ্ড হরফে প্রকাশিত

হল খবরটা। প্রতিটি বাড়িতে রেডিও ঘোষণা করছে সেই যুগান্তকারী সংবাদ।

উইলবার আর অরভিল-এর ঐ সাফল্য মানব-সভ্যতার অগ্রগতির নিরিখে বোধকরি একইরকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাহলে সেদিন—সেই ১৯০৩-এর ১৭ই ডিসেম্বরের ঘটনাটি নিয়ে কী ধরনের আলোড়ন হয়েছিল? কোন্ পত্রিকায় কী-ভাবে খবরটা ছাপা হল?

এর জবাব: পৃথিবীর কোনও সংবাদপত্রে সেটা আদৌ প্রকাশিত হয়নি।

তাতে দুঃখ নেই রাইট-ভাইদের। তাঁরা ক্রমাগত পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন।

দু বছরের মধ্যেই তাঁদের আকাশে স্থিতিকাল বেড়ে গিয়ে হল আটত্রিশ মিনিট।

দুনিয়া এ দু বছরেও সে খবর পায়নি। কেন পায়নি, সে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য রকমের অদ্ভুত। পুরুষকারের উপর ভাগ্যের যে কতখানি প্রভাব এটা তারই একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শুধু তাই নয়, ভাগ্যকে যে শেষ পর্যন্ত পুরুষকারের কাছে নতিস্বীকার করতেই হবে তারও একটা উজ্জ্বল উদাহরণ।

সাফল্যলাভ করার অব্যবহিত পরে ওঁরা নানান প্রভাবশালী লোককে সেটা জানালেন। ফটোখানাও দেখালেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য শোনালেন। কিন্তু কেউ বড় একটা পাত্তা দিল না। বস্তুত ব্যাপারটা বিশ্বাসই করল না কেউ। এ তো মহাবিপদ! দুভাই শেষপর্যন্ত স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করলেন—মাসপাঁচেক পরে, ১৯০৪-এর ২৫শে মে। এবার আর কিটি হক্-এ নয়, খাস ডেটন-এই। দু-নম্বর মডেলটা নিয়ে উড়বার চেষ্টা হল, কিন্তু এমনি কপাল—সেদিন যান্ত্রিক গণ্ডগোলে এঞ্জিনটা চালুই হল না। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। পরদিন এঞ্জিনটা মেরামত করে ওঁরা আবার প্রেস-প্রতিনিধিদের

পাকড়াও করে আনলেন। এবারও মাত্র ষাট-ফুট মত একটা লাফ দিয়েই যন্ত্রটা বিকল হল। প্রতিনিধিরা এবার তাঁদের বিরক্তির কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেই স্থানত্যাগ করলেন। দুভাই মহা-বিব্রত। পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন—কী যান্ত্রিক গণ্ডগোলে এমনটা ঘটছিল। অনেক পরিশ্রমে সেটা মেরামত করে দুজনে আবার ধর্ণা দিলেন স্থানীয় সংবাদপত্র অফিসে। কিন্তু ততদিনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে সকলের। নির্ধারিত দিনে কোনও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিই উপস্থিত হলেন না। আর আশ্চর্য, সেদিন আবার যন্ত্রটা পাখীর মত উড়ল।

এ কী বিড়ম্বনা! দুভাই এবার মার্কিন সমর-দপ্তরকে একখানি চিঠি লিখলেন। জানালেন, ইতিপূর্বে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাংলেকে তাঁরা যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ঠিক সেই সর্তে তাঁরা সমর-দপ্তরকে আকাশযান সরবরাহ করতে প্রস্তুত। যন্ত্রটা বছর-দুই আগেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ওঁরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন—আপনারা দয়া করে এসে যন্ত্রটাব কার্যকারিতা দেখুন ও যথাকর্তব্য করুন।

ঐ 'বছর-দুই আগেই' কথা-কটা লেখা বোধহয় ভুল হল। যদি ওঁরা বলতেন, যন্ত্রটা 'সম্প্রতি' সাফল্যলাভ করেছে, তাহলে হয়তো সমর-বিভাগের কর্মকর্তারা চিঠিখানার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু ঐ দু বছরের উল্লেখটাই সব মাটি করে দিল। এ কী বিশ্বাসযোগ্য? কর্মকর্তারা ভাবলেন—দু বছর আগে পত্রলেখক আকাশযানকে আকাশে উড়িয়েছেন অথচ খবরটা আজও কেউ জানে না? কোনও কাগজে ওদের নামই বার হয়নি? মামদোবাজি নাকি?

সমর-বিভাগের লালফিতার বাঁধন খুলে 'বোর্ড-অফ-অর্ডিনেন্স'-এর বড়কর্তার জবাব পৌঁছে গেল রাইট-ভাইদের কাছেঃ "আপনাদের প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। অন্তত দু-তিন শ' ফুট আকাশপথে উড়বার উপযুক্ত যন্ত্র কেউ বানিয়েছেন এটা সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সমর-দপ্তর এ বিষয়ে উৎসাহিত হবেন না।"

লে হালুয়া। কাকে কী বলছে ওরা! এ চিঠি ওঁরা পেলেন ১৯০৫-এর ২৪শে অক্টোবর। তার উনত্রিশ দিন আগে ওঁদের তিন-নম্বর 'ফ্লায়ার' নাগাড়ে চব্বিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে। দু-তিন শ' ফুট! মাই ফুট্!!

চিঠিখানা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন উইলবার—রাগে, অভিমানে।

অরভিল বলেন, এ পোড়া দেশে কিচ্ছু হবে না দাদা। চল, আমরা বরং ফ্রান্সে চলে যাই। ওখানকার লোকে আমাদের কদর বুঝবে। সান্তোস দুমোর কাণ্ডটা দেখেছ তো।

তা দেখেছেন উইলবার; কিন্তু অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! কে জোগাবে অত খরচ! ওঁরা খবরের কাগজে ফ্রান্সের খবর পড়েন আর নিশ্ পিশ্ করেন। হাত কচলান আর হা-হুতাশ করেন।

আমেরিকা যখন রাইট-ভাইদের চরম উপেক্ষা দেখিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, তখন ফ্রান্স কিন্তু এগিয়ে চলেছে পুরোকদমে। ল্যাংলে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর উত্তরসাধক এ. সান্তোস দুমো এসে বসেছেন তাঁর শূন্য আসনে। ইতিমধ্যে কোন পৃষ্ঠপোষক ঘোষণা করলেন—কোন আকাশযান যদি মাটি না ছুঁয়ে একাদিক্রমে পঁচিশ মিটার উড়ে যেতে পারে তবে তাঁর আবিষ্কারককে তিন হাজার ফ্রাঁ পুরস্কার দেওয়া হবে। পঁচিশ মিটার—মানে, একশ' ফুটও নয়। হায় ঈশ্বর! 'ফ্লায়ার' যে ইতিমধ্যে মাইলের পর মাইল পাড়ি জমাচ্ছে আকাশপথে! অতলান্তিকের এপারে বসে অরভিল আর উইলবার খবরের কাগজে এ ঘোষণা পড়লেন আর রাগে-দুঃখে-অভিমানে ভাগ্যকে গাল পাড়লেন।

দিন-কয়েক পরে সংবাদপত্রে ফলাও করে বার হল আর একটি সংবাদ। মঁসিয়ে সান্তোস দুমো তাঁর নিজের তৈরি '14 bis' নামক আকাশযান নিয়ে ঐ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯০৬-এর ২৩শে অক্টোবর নাগাড়ে প্রায় দুশ' ফুট

উড়ে ঐ প্রাইজ তিনি পেলেন। কাগজে ফলাও করে বার হয়েছে সেই খবর—সান্তোস দুমোর ছবিসমেত। নিজস্ব সংবাদদাতার সে বিবরণ পড়ে রাইট-ব্রাদার্স হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝে উঠতে পারেন না। ততদিনে তাঁরা বিশ-পঁচিশ মাইল নাগাড়ে পাড়ি জমাচ্ছেন—সাক্ষী শুধু গ্রামবাসীরা।

কিছুদিন পরে আবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল আর একটা চমকপ্রদ খবর। সান্তোস দুমো আরও একটি রেকর্ড করেছেন—ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল গতিবেগের জন্য। এ সাফল্যের জন্য তাঁকে আবার পুরস্কৃত করা হল। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে খবরটা ছাপা হল—তাতে সান্তোস দুমোকে এয়ারোপ্লেনের আবিষ্কারক বলে ঘোষণা করা হল।

ইতিমধ্যে একটা মজার ব্যাপার হল। সান্তোস দুমোর সাফল্যের সংবাদে মার্কিন সমর-দপ্তর এতদিনে আবার উৎসাহিত হলেন। সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপনও দিলেন—ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল গতিবেগসম্পন্ন, একজন লোকের ভারসহ কোন আকাশযান কেউ বিক্রয় করতে রাজী থাকলে মার্কিন সমর-দপ্তর ন্যায্য দামে তা কিনে নিতে প্রস্তুত। আকাশযানের যে 'স্পেসিফিকেশন' বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হল, তা সান্তোস দুমোর শেষ আবিষ্কারের হুবহু নকল। বেশ বোঝা গেল মার্কিন সমর-দপ্তর বস্তুত সান্তোস দুমোর ঐ আকাশযানটিকেই কিনে নিতে চেয়েছেন।

কিন্তু হতাশ হলেন তাঁরা। এ বিজ্ঞপ্তির জবাবে সান্তোস দুমো আদৌ সাড়া দিলেন না। কারণ, তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটি ইতিপূর্বেই ফরাসী সরকার কিনে ফেলেছেন। আশাভঙ্গে মার্কিন সমর-দপ্তর যখন মনঃক্ষুণ্ণ তখন একদিন ওঁদের বড়কর্তার দপ্তরে এসে হাজির হলেন দুই ভাই। আমেরিকান তাঁরা। কোথাকার উইলবার আর অরভিল রাইট।

ভিজিটার্স স্লিপে অপরিচিত দুটি নাম দেখে বড়কর্তা পিয়নকে বললেন, ওদের ভিতরে আসতে বল।

পিয়নের পিছন পিছন এসে দাঁড়ালেন দুভাই। অল্প বয়স। সপ্রতিভ।

ঃ কী চাই ?

ঃ আজ্ঞে এয়ারোপ্লেন বেচব।

ঃ কী বেচবে ?

ঃ আজ্ঞে, ঐ যে ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল গতিসম্পন্ন, একজনের ভারসহ পাখীর মত যন্ত্র, যা মাটি না ছুঁয়ে দুশ' ফুট উড়ে যেতে পারে !

ভ্রূকুঞ্চিত হল অফিসারের। ওদের দুভাইকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন, ও বুঝেছি ! আপনারাই না বছরখানেক আগে আমাদের একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, তারও দুবছর আগে অমন একটি যন্ত্র আপনারা বানিয়েছেন ?

যেন মহা অপরাধ করা হয়েছিল ! অপরাধটা কবুল করলেন ওঁরা।

ঃ তা আপনারা আমাদের জবাবটা পাননি ?

হাত কচলে অরভিল বললেন, পেয়েছিলাম স্যার ; কিন্তু কাগজে আবার নতুন বিজ্ঞাপন দেখে –

ধমকে ওঠেন সামরিক অফিসার, শুনুন মশাই ! আমাদের সময় অল্প। অগ্রিম বায়না আমরা দেব না। অমন যন্ত্র কতদিনের মধ্যে বানাতে পারবেন বলে আশা করেন ?

ঃ আজ্ঞে না। বায়নার দরকার নেই। সময়ও নষ্ট করব না আপনার। আকাশযান বাইরের মাঠে রেখে এসেছি। আপনি দয়া করে ঐ বারান্দায় গিয়ে একবারটি দাঁড়ান। আমরা উড়ে দেখাই। লেনদেনটা তাহলে নগদেই হতে পারবে !

অফিসার তখন ভাবছেন—এক জোড়া পাগল কেমন করে ঢুকে পড়ল মিলিটারী এলাকায় ! কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে এবং কৌতূহলে তিনি উঠে এলেন বাইরের বারান্দায়।

দেখলেন সামনের মাঠে একটা অদ্ভুতদর্শন যন্ত্র খাড়া করা আছে

বটে। দুভাই আর কালবিলম্ব করেন না। দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে যান যন্ত্রটার দিকে। কক্‌পিটে উঠে বসেন। মুহূর্তমধ্যে সেটা উঠে যায় আকাশে। বার-কতক পাক খেয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। স্তম্ভিত অফিসারের বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল—একজনের ভারসহ, ওঁরা উড়লেন দুজন। দাবী ছিল ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল গতিবেগ—ওটা উড়ল ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে।

রাতারাতি স্বীকৃতি পেলেন দুই অখ্যাত যুবক।

প্রথম প্লেনটি কিনলেন মার্কিন সমর-দপ্তর পঁচিশ হাজার ডলারে।

তৎক্ষণাৎ চাটিবাটি গুটিয়ে দুভাই রওনা দিলেন অতলান্তিকের ওপারে—ফ্রান্সে। যে দেশ গুণীকে সম্মান দিতে জানে সেই ফরাসী মুলুকে।

সবাই দেখল, বুঝল—ওঁরা দুভাই আকাশজয়ের পথে অনেক—অনেকখানি এগিয়ে আছেন। প্রেস-প্রতিনিধিরা ভীড় করে এল ইন্টারভিউ নিতে। ওরা ওঁদের সাফল্য আর উপেক্ষার কাহিনী সবিস্তারে বললেন। সবাই তা মেনে নিল। ১৯০৩-এর সেই অভিযান মেনে নিতে আর কারও আপত্তি হল না। রাইট-ভাইয়েরা স্বীকৃতি পেলেন আকাশযানের প্রথম আবিষ্কারক হিসাবে। প্যারীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। প্রচুর নিমন্ত্রণ এল—সভা-সমিতির আয়োজনে সারা সপ্তাহে মুহূর্তের অবসর নেই। সারা দুনিয়া ওঁদের উদ্দেশে মাথার টুপি খুলতে উদ্যত।

কিন্তু ওঁরা দুভাই সব এ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে ফ্রান্স ছেড়ে তখন যাচ্ছেন বার্লিনে। বার্লিন শহরপ্রান্তে এক অবজ্ঞাত সমাধিপ্রস্তরের সম্মুখে সশ্রদ্ধে তাঁদের মাথার টুপি খুলতে।

অটো লিলিয়েথালের অনাদৃত সমাধিমূলে!

উনিশ শ' তিন থেকে উনিশ শ' চৌদ্দ। আকাশজয়ের ইতিহাসে এক স্বর্ণময় যুগ। এই এগারোটি বছরে দুর্বার গতিতে উন্নত হয়েছিল আকাশচারণের আয়োজন। সে অগ্রগতিতে প্রথম বাধা পড়ল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায়। এই কয় বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান আকাশপথে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া। এতদিন মাটির উপরেই উড়ছিল আকাশযান। এতদিনে অনেকেব মনে হল, এই বিচিত্র যন্ত্র নিয়ে কি সাগর পাড়ি দেওয়া সম্ভব? উড়োজাহাজ এ পর্যন্ত ফ্রান্সের উপরেই যা কিছু উড়েছে। ইংল্যাণ্ডের মানুষজন বড় একটা কেউ যন্ত্রটা চোখেই দেখেনি। এ. ভি. রো-নামে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ইংলণ্ডে এয়ারোপ্লেন তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন—কিন্তু ঘটনাচক্রে বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর ইংরাজ প্রতিবেশীরা রো-র বিরুদ্ধে আদালতে গণ-দরখাস্ত পেশ করেছিল: উড়োজাহাজের প্রপেলারের শব্দে নাকি তাদের নিদ্রায় ব্যাঘাত হচ্ছে। সমন জারী করা হল রো-র নামে। বাধ্য হয়ে রো ক্ষান্ত দিলেন।

ইতিমধ্যে কে একজন বললেন, যদি কোন পাইলট লণ্ডন শহরের উপর উড়ে ঐ অদ্ভুতদর্শন যন্ত্রটা সর্বসাধারণকে দেখবার সুযোগ দেন তাহলে তিনি তাঁকে একটা পুরস্কার দেবেন। পুরস্কারের অঙ্কটা ঘোষণা করার আগেই পাঁচজন হাঁ-হাঁ করে প্রতিবাদ করে। এ কী সর্বনেশে কথা! যন্ত্রটা যদি লণ্ডন শহরের উপর ভেঙে পড়ে! অগত্যা বিকল্প প্রস্তাব করা হল—না, লণ্ডন শহরের উপব কেরামতি দেখাতে হবে না, যদি কেউ ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ডোভারে পৌঁছতে পারে তবে তাকে নগদ একহাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। যারা যন্ত্রটা দেখতে চায়, তারা বরং ডোভারে গিয়ে ভীড় জমাক। যন্ত্রটা ভেঙে পড়লে পাইলটের যা-ই হোক, দর্শকদলের তো আর কোন ক্ষতি হবে না!

খবরটা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে উঠে-পড়ে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন হচ্ছেন প্রধান প্রতিযোগী। তিনজনেই ফরাসী। প্রথমজন হচ্ছেন লাম্বার্টের কাউণ্ট, দ্বিতীয়জন লাথাম এবং তৃতীয়জন ব্লেরিয়ো (Bleriot)। লাম্বার্টের কাউণ্ট বড়লোকের ছেলে, দুঃসাহসী, বেপরোয়া, এ্যাডভেঞ্চার ভালবাসেন। লাথামও দুঃসাহসী। আর ব্লেরিয়ো হচ্ছেন মধ্যবয়সী একজন বৈজ্ঞানিক। মাঝারি বয়স, উচ্চতাতেও মাঝারি এবং জোসেফ স্ট্যালিনের মত একজোড়া ঝোলা গোঁফ। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর কথার মাত্রা ছিল—'ম্যাগ্‌নিফিক্'! অর্থাৎ—'অতি চমৎকার'! কম কথার মানুষ; কিন্তু কোন কিছু ভাল লাগলেই একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে একটিমাত্র শব্দে হৃদয়ের চরম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বসেন—'ম্যাগ্‌নিফিক্'! ওঁর স্ত্রী যদি প্রশ্ন করেন—সূপটা কেমন হয়েছে, অথবা নতুন গাউনটাতে তাঁকে কেমন মানিয়েছে, কর্তা একটিমাত্র শব্দে জবাব দেন: ম্যাগ্‌নিফিক্!

শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী নাকি বলেছিলেন, আমাদের জনান্তিক দাম্পত্য-সম্ভাষণে ঐ ফরাসী শব্দটার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

ভদ্রমহিলাকে দোষ দেওয়া যায় না। রাইট-ভাইদের সাফল্য থেকে শুরু করে পোষা বেড়ালের মিউ-মিউ সবই যদি 'ম্যাগ্‌নিফিক্' হয়, তখন শব্দটা অভিধান থেকে মুছে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি! মঁসিয়ে ব্লেরিয়ো বিব্রত হয়ে পড়েন। এর পর স্ত্রী নতুন কোন গাউন কিনলে তিনি কী বলবেন? 'ম্যাগ্‌নিফিক্' শব্দটার কোন প্রতিশব্দ দেখে রাখতে হবে অভিধানে।

অবশ্য মাদাম ব্লেরিয়োর পক্ষ নতুন গাউন কেনার সম্ভাবনা আপাতত নেই। কারণ বৈজ্ঞানিকটি পরীক্ষার কাজে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি ছিলেন সেই বুনো রামনাথের দলের মানুষ। একের পর এক যন্ত্র বানিয়ে যাচ্ছেন—সংসার কেমন করে, কীভাবে চলে খেয়াল করেন না। নিজের তৈরি উড়োজাহাজে

তিনি এতবার আছাড় খেয়েছেন যে, সেটাই রেকর্ড। আশ্চর্যের কথা, কোনবারই তাঁর মৃত্যু হয়নি। হাত-পা ভেঙেছেন—আবার তা জোড়া লেগেছে। আবার বসেছেন নতুন যন্ত্র চালাতে। রাইট-ভাইদের আকাশযান ছিল বাইপ্লেন, অর্থাৎ উপর-নিচে দুই-ডানা-ওয়ালা; উনি চালাতেন মনোপ্লেন, মানে এক-ডানা-ওয়ালা। ব্লেরিয়ো বলতেন, ভবিষ্যতে এই মনোপ্লেনই কার্যকরী হবে, তোমরা দেখে নিও।

তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। আজ সব প্লেনই মনোপ্লেন।

বৈজ্ঞানিকের সংসারে সব কিছুই নিত্য-বাড়ন্ত। মাদাম ব্লেরিয়ো কোথা দিয়ে কেমন করে যে সংসারটা চালিয়ে নেন সে খবরই পান না মঁসিয়ে। তবে হ্যাঁ, কিছুদিন আগে একটা আবিষ্কার কার্যকরী হওয়ায় এ দু বছর একটু সাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখছেন। ব্যাপারটা কিছুই নয়, মটোর গাড়িতে ডায়নামো লাগিয়ে হেড-লাইট জ্বালার কায়দাটা হঠাৎ আবিষ্কার করে বসেন উনি। সামান্য ব্যাপার মনে হয়েছিল বৈজ্ঞানিকের; কিন্তু তাঁর স্ত্রী বেশ বিচক্ষণ। মোটা টাকায় পেটেন্টটা তিনি বিক্রি করে দিলেন। মুদি দোকানের ধার মিটল, বাড়িওয়ালা খুশি হলেন—মঁসিয়ে অবশ্য সে-সব খবর জানেন না; তিনি নতুন করে ডুব মারলেন তাঁর যন্ত্রপাতির মধ্যে। আকাশযান তৈরি করার কাজে এবং ক্রমাগত আছাড় খাওয়ার ব্যাপারে।

ইংরাজী সংবাদপত্রে ঐ পুরস্কারটি ঘোষণা হতেই লাফিয়ে উঠলেন ব্লেরিয়ো। হাজার পাউণ্ড! এ পুরস্কার তাঁকে পেতেই হবে। কাউন্ট লাম্বার্টকে অতটা ভয় নেই—বড়লোকের ছেলে, তার তৈরি হতে সময় লাগবে। ভয় একমাত্র ঐ লাথামকে। সে ছোকরা নাকি উঠে-পড়ে লেগেছে। ব্লেরিয়োর যন্ত্রটাও প্রায় তৈরি। দোষের মধ্যে সেটা বড় তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছে। একাদিক্রমে পনের-বিশ মিনিটের বেশি যন্ত্রটা চলছে না। অথচ ইংলিশ চ্যানেল

পার হতে না-হক আধঘণ্টা তো লাগবেই। কী করা যায়? শেষ পর্যন্ত মঁসিয়ে ব্লেরিয়ো গিয়ে ধর্ণা দিলেন তাঁর একমাত্র প্রতিযোগীর বাড়িতে।

লাথাম বৈজ্ঞানিক ব্লেরিয়োকে চিনতেন। সমাদর করে বসালেন বৈজ্ঞানিককে। আপ্যায়ন করে বললেন, বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?

ব্লেরিয়ো কম কথার মানুষ। এক নিঃশ্বাসে বললেন, শুনুন মশাই! ইংলিশ চ্যানেল পার হবার ব্যাপারে আপনি আর আমিই শুধু প্রতিযোগী। আসুন আমরা দুজনে ভদ্রলোকের-চুক্তি করি—দুজনেই যতদিন না ঠিকমত তৈরি হচ্ছি ততদিন কেউ উড়ব না। নির্ধারিত দিনে দুজনে একই সঙ্গে উড়ব। দেখা যাক, কে আগে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছায়।

কিন্তু লাথাম তাতে রাজী হলেন না। হেসে বললেন, আমি দুঃখিত মঁসিয়ে ব্লেরিয়ো। আমার সব প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। আগামীকাল সকালে আমি ক্যালে থেকে উড়ব। আমার প্লেন 'আয়ওঁ'-সমুদ্রোপকূলে পেট্রোল নিয়ে প্রস্তুত।

ঃ ম্যাগ্‌নিফিক্‌! আপনি যে এতটা এগিয়ে আছেন, তা আমি ধারণাই করতে পারিনি। তাহলে তো আর কোন কথাই চলে না। আচ্ছা আসি!

ব্লেরিয়ো ফিরে এলেন নিজের ডেরায়। একটা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে গুম মেরে বসলেন বারান্দায়। মনটা একেবারে ভেঙে গেছে! খুব আশা করেছিলেন এ পুরস্কারটা তিনিই পাবেন। সম্মানের কথা পড়ে মরুগ্‌গে—ঐ হাজার পাউণ্ড না পেলে তাঁর চলবে না। গিন্নি আলটিমেটাম দিয়ে বসে আছেন! তাঁর ভাঁড়ে নাকি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চাইছেন—মা-ভবানী! তাঁর স্থানত্যাগের কোন লক্ষণই নেই!

ওঁকে ঐ রকম মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখে স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন, কী হয়েছে? তুমি যে এমন গুম মেরে বসে আছ?

ঃ খবর খারাপ। প্রাইজটা পাওয়া যাবে না। লাথাম কালই উড়ছে!

ঃ তা উড়ুক না; কিন্তু প্রথমবার সে ব্যর্থও হতে পারে। তুমিই তো গল্প করেছিলে খবরের কাগজে ল্যাংলের পরীক্ষার কথা শুনে রাইট-ভাইয়েরা মোটেই মুষড়ে পড়েনি! ল্যাংলের আগেই তো তারা উড়েছিল!

ঃ ম্যাগ্‌নিফিক্!—হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন ব্লেরিয়ো। একথা তো খেয়াল হয়নি! গিন্নি তো ন্যায্য কথা বলেছেন! লাথাম ব্যর্থও তো হতে পারে!

তারপর দেখেন মাদাম ওঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন। ঐ 'ম্যাগ্‌নিফিক্' শুনে। কিন্তু সেদিকে আর খেয়াল নেই ব্লেরিয়োর। তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন তাঁর যন্ত্রটা শেষ করতে। স্ত্রী বলেন, তোমার উড়োজাহাজ কি তৈরি?

ঃ হ্যাঁ, প্রায় তৈরি। বাকিটুকু আজই শেষ করব। কাল সকালে আমিও উড়ব।

ঃ কালই! চ্যানেল পার হতে কতক্ষণ লাগবে?

ঃ এই ধর আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিট।

ঃ এই প্লেনটায় তুমি এর আগে কতক্ষণ উড়েছ একাদিক্রমে?

ঃ তার কি আর হিসাব আছে!

হিসাব ঠিকই ছিল। নিখুঁত হিসাব। ইতিপূর্বে সর্বোচ্চ একুশ মিনিট উড়তে পেরেছেন। তার ভিতরেই এঞ্জিনটা এত গরম হয়ে যায় যে, অবতরণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কিন্তু স্ত্রীকে সে কথা বলা চলে না। ইংলিশ চ্যানেলে বিশ-বাইশ মিনিট পরে অবতরণ অবশ্যম্ভাবী হলে যে অনিবার্য মৃত্যু! তাই উনি ককপিটের ভিতর একটা গ্যাস-ভর্তি বেলুন ভরে নিলেন। বৈজ্ঞানিক হিসাব করে দেখেছেন ওটা থাকার জন্য সমুদ্রে পড়লেও বিমানটা মিনিট পাঁচেক ভেসে থাকবে। তার ভিতরেই উনি লাইফ-বেল্ট নিয়ে নিমজ্জমান প্লেন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

সারাদিন কী সব খুটখাট করলেন। - বিকাল নাগাদ যন্ত্রটা মোটামুটি খাড়া হল। ব্লেরিয়ো বললেন, যন্ত্রটা কেমন দাঁড়াল একবার পরখ করে দেখি!

আকাশে উড়লেন ব্লেরিয়ো এবং তাঁর চিরন্তন ঐতিহ্য অনুসারে যথারীতি আছাড় খেয়ে পড়লেন! বাঁ-হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হল তার ফলে। স্ত্রী বারণ করলেন বারম্বার। কর্ণপাত করলেন না ব্লেরিয়ো। ভাঙা পা আর জখম উড়োজাহাজটা নিয়ে রাতারাতি এসে উপস্থিত হলেন ক্যালেতে। ইতিমধ্যে তিনি ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদককে একটি টেলিগ্রাম করেছেন—আগামীকাল, ২৫শে জুলাই, ১৯০৯ সকালে তিনি একা ক্যালে থেকে ডোভারে উড়ে যাবেন।

ওঁর এক বন্ধু আগে-ভাগেই চলে গেল ডোভারে।

ক্যালেতে পৌঁছে দেখলেন, লাথাম তাঁর আগেই পৌঁচেছেন। সবান্ধবে! বেশ কিছু সংবাদপত্রের লোকও জমায়েত হয়েছে লাথামের ঘোষণা শুনে। লাথামের প্লেন অপেক্ষা করছে সমুদ্রোপকূলে বালির উপর।

মধ্যরাত পর্যন্ত ব্লেরিয়ো তাঁর জখম হওয়া উড়োজাহাজটা মেরামত করলেন। আর তাঁর স্ত্রী ওঁর বাঁ-হাঁটুতে গরম জলের সেঁক দিতে থাকেন।

২৪শে ছিল শনিবার। বৈকালিক আবহাওয়ার রিপোর্টে বলছে —আগামীকাল সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে এবং ঝোড়ো হাওয়াও থাকতে পারে। ২৫শে শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল ব্লেরিয়োর। বাইরে সত্যই আকাশ কালো করে আছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। যে কোন মুহূর্তে ঝেঁপে বৃষ্টি নামতে পারে।

ভোর রাত্রে লাথামও উঠেছেন। আকাশের অবস্থা দেখে তিনি স্থির করলেন বৃষ্টিটা না ছাড়লে আকাশে ওঠা আদৌ যুক্তিযুক্ত হবে না। দিক্‌ভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। ঝোড়ো হাওয়ায় প্লেন অতলান্তিক মহাসমুদ্রের দিকে চলে যেতে পারে। ভাবলেন, একটু

বেলা হলে আবহাওয়ার রিপোর্ট পেয়ে স্থির করবেন আজ এ প্রচেষ্টা বাতিল করবেন কি না। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। আজ না হয়, কাল হবে। আকাশটা ফাঁকা থাকা দরকার। আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন লাথাম।

কিন্তু ব্লেরিয়ো শুলেন না। স্ত্রাকে বলেন, চল। আমি এখনই উড়ব।

ঃ কী বলছ! পাগল নাকি! এই আবহাওয়ায়?

ঃ আবহাওয়া? আজকের আবহাওয়া যাকে বলে—ম্যাগ্‌নিফিক্!

তারপর খেয়াল হল দিনের প্রথম কথাটাই বেমক্কা বেরিয়ে গেছে মুখ ফস্‌কে। বললেন, পারদঁ! আসল ব্যাপারটা তোমাকে বলা হয়নি। ব্যাপারটা কি জান, আমার এই এঞ্জিনটা ঠিক তোমার মত—আই মীন, আমার মত—অল্পতেই মাথা গরম করে! যদি বৃষ্টির মধ্যেই উড়তে পারি তবেই আমার চান্স!

পাগলটাকে রোখা গেল না। দুজনে এসে উপস্থিত হলেন সমুদ্রতীরে। সমুদ্রের ধারে তখনও লোকজন জমেনি। মেঘলা দিন, সূর্যোদয় দেখা যাবে না। তাই বড় একটা কেউ তখনও আসেনি বেড়াতে। একজন পুলিশ অফিসার শুধু টহল দিচ্ছিল। ব্লেরিয়ো পূর্ব-আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—সূর্যোদয় হয়েছে কিনা বুঝবার উপায় নেই। অথচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার যিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর সর্ত ছিল—দিনের বেলা সাগর পাড়ি দিতে হবে—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের ভিতর।

ব্লেরিয়ো পুলিশ সার্জেন্টকে প্রশ্ন করেন, সার্জেন্ট, সূর্যোদয় কি হয়েছে?

সার্জেন্ট ঘড়ি দেখে রসিকতা করে বলে, হিসাব মত হওয়ার কথা, যদি না আকাশের অবস্থা দেখে সূর্যদেব কম্বলমুড়ি দিয়ে পড়ে থাকেন!

ঃ ডোভার কোন্ দিকে?

সার্জেন্ট দূর-দিগন্তের একটা কালো মেঘের দিকে আঙুল তুলে দেখালো।

কম কথার মানুষ ব্লেরিয়ো তাঁর সাধের উড়োজাহাজের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন, তুমি এখন কি করবে? প্যারীতে ফিরে যাবে?

সজলচক্ষে মাদাম বললেন, তুমি কি পাগল? আমি পরের জাহাজেই ডোভার পৌঁছাব।

ঃ তবে তো ভালই। আমার হাতটা একটু ধর তো।

আহত বাঁ-হাঁটুটা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে ব্লেরিয়ো উঠে বসলেন কক্‌পিটে।

সার্জেন্টটা ছুটে এসে বললে, মাপ করবেন। আপনি কি মঁসিয়ে লাথাম?

ঃ না। কেন?

ঃ আমার উপর নির্দেশ আছে উনি কখন উড়লেন সেটা নোট রাখতে।

ঃ তা রাখবেন। আপাতত আমি কখন উড়লাম সেটা লিখে রাখুন।

চালু হল এঞ্জিন। প্রপেলারটা ঘুরছে। কী একটা লিভার ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন ব্লেরিয়ো। ঝকর-ঝকর করতে করতে ভিজা বালির উপর দু-শ' ফুট দৌড়ে বিমানটা হঠাৎ উঠে পড়ল আকাশে। কক্‌পিট থেকে বেরিয়ে এল একখানা হাত। তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি।

লাথাম তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে তার হোটেলের ঘরে।

দূরে একখানা কালো মেঘকে লক্ষ্য করে ব্লেরিয়ো বিনা কম্পাসে উড়ে চললেন উত্তর-পূর্ব-মুখো।

প্রথম মিনিট-দশেক তাঁর খুব কিছু অসুবিধা হয়নি। সামনেই যাচ্ছিল একটা ফেরি-স্টিমার, ক্যালে থেকে ডোভারমুখো। তাকে লক্ষ্য করে প্লেনটা চালালেন। মিনিট সাত-আটের মধ্যেই সেটা

পিছনে পড়ে গেল। তবু পিছন ফিরে তার গতিমুখটা দেখে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করছিলেন উনি। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে এ সময় ক্যালে থেকে ডোভারের সাদা চুনাপাথরের মাথার আভাস দিগন্তে নজরে পড়ে। সেদিন আকাশ ছিল মেঘের কাজল মাখানো। মিনিট পনের পরেই ব্লেরিয়ো লক্ষ্য করে দেখেন—দুদিকের দুই তটরেখাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। তিনি নিঃসঙ্গভাবে একা, একেবারে একা! নিচে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অথৈ সমুদ্র, উপরে মেঘে-ঢাকা কালো আকাশ। একটা সী-গাল পর্যন্ত নজরে পড়ল না তাঁর। পেট্রোল এঞ্জিনের মাপ ছিল ছোট। মিনিট কুড়ি পরে টিন থেকে কিছুটা পেট্রোল ভরে দিলেন এঞ্জিনের ট্যাঙ্কে। সমুদ্রের প্রায় দু-শ' ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছেন তিনি; ওঁর এঞ্জিনটা পঁচিশ অশ্বশক্তির, ওঁর গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। কিন্তু কী আশ্চর্য! বাইশ মিনিট পরেও তটরেখা দেখা গেল না। তবে কি দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছেন? অতলান্তিকের দিকে উড়ে যাচ্ছেন? এতক্ষণে মনে হল—কাজটা ভাল হয়নি! এত তাড়াহুড়া না করে অন্তত একটা কম্পাস সঙ্গে আনা উচিত ছিল। পঁচিশ-ছাব্বিশ-সাতাশ! একি! প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল যে! এখনও ওপারের তটরেখা দেখা যাচ্ছে না কেন? হঠাৎ অনুভব করলেন ইংলণ্ডের দিকে নয়, তিনি উড়ে চলেছেন নিঃসীম অতলান্তিকের দিকে, যার ওপর হাজার হাজার মাইল ওপারে আমেরিকা! নিশ্চিত মৃত্যু ডাকছে তাঁকে।

ডোভারে অনেকেই এসেছে লণ্ডন থেকে, উড়োজাহাজ দেখতে। বড় বড় সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধিরাও এসেছেন। তার মধ্যে এমন কি আছেন বিশ্ব-বিশ্রুত সাহিত্যিক এডগার ওয়ালেস; কিন্তু অত সকালে কে আর বিছানা ছেড়ে ওঠে? মেঘলা দিন, বৃষ্টি পড়ছে; সবাই আশা করছে একটু বেলা না হলে কেউই এ আবহাওয়ায় উড়বার চেষ্টা করবে না। ব্লেরিয়ো এই বিয়োগান্তক অভিযানের কথা তারা কেউ জানেই না। বোধকরি একমাত্র ব্যতিক্রম মাদাম ব্লেরিয়ো। তিনি পরবর্তী জাহাজের জন্য প্রতীক্ষা

করছেন ক্যালের জাহাজ ঘাটায়। আর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম ওঁর সেই বন্ধু, যে বসে ছিল ডোভারের পাহাড় চূড়ায়।

শুধুমাত্র বৃষ্টি পড়েছিল বলেই ব্লেরিয়োর এঞ্জিনটা মাথা গরম করেনি। না হলে একাদিক্রমে আধঘণ্টা সেটা চলত না। তেত্রিশ মিনিট পার হবার পর হঠাৎ ক্ষীণ তটরেখা নজরে পড়ল ব্লেরিয়োর। ঐ তো ডোভার! আঃ কী আরাম! না, দিক্‌ভ্রান্ত হননি তিনি আদৌ—ঘন কুয়াশায় শুধু দেখতে পাচ্ছিলেন না এতক্ষণ। কুয়াশা আর মেঘ! ঐ তো পাল-তোলা অসংখ্য জেলে-ডিঙি মাছ ধরছে, ঐ তো ডোভারের চুনাপাথরের পাহাড়। সমুদ্রতীর জনমানব শূন্য—না, একেবারে শূন্য নয়। ফেনশুভ্র শেক্ষপীয়ার পীকের মাথায় একটা পতাকা প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। ফরাসীদেশের তেরঙা পতাকা। শান্তি-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতীক। অতন্দ্র প্রতীক্ষায় শেষরাত্রি থেকে পাহাড়ের চূড়ায় অপেক্ষা করছেন ওঁর সেই বন্ধু। কালো মেঘের বুক চিরে হঠাৎ প্লেনটাকে বেরিয়ে আসতে দেখেই আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন তিনি। প্রবলভাবে সেই তেরঙা-ঝাণ্ডাটিকে আন্দোলিত করতে থাকেন।

অতি সাবধানে অবতরণের চেষ্টা করলেন ব্লেরিয়ো; কিন্তু তাঁর চিরাচরিত ঐতিহ্য যথারীতি অব্যাহত থাকল। প্রায় ষাট ফুট উপর থেকে গোঁত্তা খেয়ে নামলেন বালিয়াড়ির উপর। প্লেনের ডানাটা গেল ভেঙে। তা হোক, উনি প্রাণে বেঁচে আছেন, এবং আছেন ডোভারে। সাগরজয় সমাপ্ত করে।

মাত্র পাঁচ-সাতজন দর্শক উপস্থিত ছিল সমুদ্রের ধারে। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু। ওদের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নেমে এলেন ব্লেরিয়ো। বাঁ পাটা যাত্রার পূর্বেই জখম হয়েছিল, এবার গেছে ডান পাটা!

দশ মিনিটের ভিতর খবর রটে গেল ডোভারে। কাতারে কাতারে লোক ছুটে এল সমুদ্রতীরে। ছেঁকে ধরল সংবাদপত্রের

রিপোর্টারের দল। তৎক্ষণাৎ শোভাযাত্রা করে সবাই তাঁকে নিয়ে চলল লণ্ডনে।

পরের স্টিমারে মাদাম ব্লেরিয়ো এসে শুনলেন কর্তাকে পাকড়াও করে সবাই লণ্ডনে নিয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা অগত্যা চললেন লণ্ডনে। ভাঙা এয়ারোপ্লেনখানা লণ্ডন হাসপাতালের প্রাঙ্গণে রাখা হল সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য।

রাত্রে নৈশভোজ দিলেন লণ্ডনের মেয়র। কেতা-দুরস্ত ব্যাপার! বিশিষ্ট সব অতিথিরা এসেছেন নিখুঁত ডিনার-জ্যাকেট পরে। তার ভিতর হংসমধ্যে বকের মত কালিঝুলি মাখা ফ্লাইং-কিট পরে হাজির আছেন মশিয়ে ব্লেরিয়ো। ডিনার-জ্যাকেট কোথায় পাবেন তিনি? ব্রিটেনের যুদ্ধমন্ত্রী লর্ড হ্যালডেন ওঁর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, নেপোলিয়ান যা পারেননি, আপনি তাই সম্ভব করেছেন।

একগাল হাসলেন স্বল্পভাষী ব্লেরিয়ো। জবাবে বললেন, মাপ করবেন, তার কারণ নেপোলিয়ান চেয়েছিলেন অস্ত্র দিয়ে ইংল্যাণ্ডের মাটি জয় করতে, আর আমি এসেছি সৌহার্দ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ডের হৃদয় জয় করতে।

এক নম্বর হার হল ব্রিটেনের যুদ্ধমন্ত্রীর। কথার যুদ্ধে।

ওদিকে এ খবর পৌঁছে গেছে ফ্রান্সে। প্যারীতে, ক্যালেতে। সারা ফ্রান্স তখন আনন্দে চীৎকার করছে: ভিভা ফ্রান্স! ভিভা ব্লেরিয়ো!

ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন লাথাম, বন্ধুর ধাক্কা খেয়ে। সংবাদ শুনে চীৎকার করে ওঠেন—ঠগ! জোচ্চোর! রাতারাতি সিঁদেল চোরের মত আমার হাতের মুঠো থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল এতবড় সম্মান!

বিছানা থেকে উঠেই দৌড়ালেন তিনি। বন্ধু পিছু ডাকে, —আরে ব্যাপার কি? যাচ্ছ কোথায়? যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

: যাচ্ছি পোস্ট-অফিসে।

: পোস্ট-অফিসে! কেন, কি হবে?

: সবার আগে আমার অভিনন্দন সেই সিঁদেল চোরটার কাছে পৌঁছে দিতে হবে না! জোচ্চোরটা কালই আমাকে বলেছিল 'এস, একসঙ্গে উড়ি'। আমি বোকার মত রাজী হইনি। তাই হেরে গেছি। তাই বলে কি স্পোর্টসম্যানশিপেও হার মানব অতবড় স্পোর্টসম্যানের কাছে?

সন্ধ্যা নাগাদ ব্লেরিয়ো লণ্ডনে বসে পেলেন প্রতিযোগীর সেই তারবার্তা: আন্তরিক অভিনন্দন!

ডিনার পার্টি শেষ হবার মুখে এসে পৌঁছলেন মাদাম ব্লেরিয়ো। তাঁকে নিয়ে আবার নতুন করে সবাই হৈ-চৈ শুরু করে দিল। অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা। সব মিটতে সেই যার নাম রাত বারোটা।

হোটেলের নির্জন কক্ষে পৌঁছে আনন্দে আত্মহারা কর্তা বললেন, এখন কেমন লাগছে?

দিনের শুরুতে যে নিষিদ্ধ শব্দটি উচ্চারণ করে ধমক খেয়েছিলেন কর্তা, দিনের শেষে একমাত্র সেই কথাটিই খুঁজে পেলেন গিন্নি। আনন্দে বিগলিত হয়ে বললেন—ম্যাগ্‌নিফিক্!

ব্লেরিয়ো হাজার পাউণ্ড পুরস্কার তো পেলেনই, তাছাড়া ফরাসী সরকার এই সাফল্যের জন্য তাঁকে পৃথকভাবে তিন হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিলেন। তার উপর দিলেন 'ক্রশ অফ্ দ্যি লিজন অফ অনার'! বাকি জীবনে ব্লেরিয়োকে আর অর্থকষ্টে ভুগতে হয়নি। এর পরেও তিনি একটা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং আবার বিজয়ী হন। সেবারেও, বলাবাহুল্য, তিনি প্লেন নিয়ে অবতরণের সময় ঘাড় গুঁজড়ে পড়েন এবং ভাঙা হাত না পা নিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে আসেন।

সারাজীবন আছাড়-খাওয়া ব্লেরিয়ো বৃদ্ধ বয়সে আরও একটি রেকর্ড করলেন, যা কেউ তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে বলে আশা করেনি।

পরিণত বয়সে ১৯৩৬ সালে স্বাভাবিকভাবে বার্ধক্যজনিত মৃত্যু হল তাঁর। কোন বিমান-দুর্ঘটনায় নয়! এটাই তাঁর শেষ রেকর্ড!

৪ঠা আগস্ট, ১৯১৪।

এতদিনে বোঝা গেল দু-শ' বছর আগে পাদরী ফ্রান্সেস্কো দে-লানা যে আশঙ্কার কথা বলেছিলেন তার মর্মার্থ। চৌদ্দ থেকে আঠারো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চার বছর। যে আকাশ-বিজয়কে মনে করা গিয়েছিল আশীর্বাদ, এখন তাই মনে হল অভিশাপ। জার্মানী, ফ্রান্স আর গ্রেট-ব্রিটেন নামল নতুন প্রতিযোগিতায়—মারণাস্ত্র হিসাবে উড়োজাহাজকে কে কতটা ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারে। শুরু হল আকাশ থেকে গোলা বর্ষণ! প্রথম দিকে জার্মানীর আকাশযানের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ফ্রন্ট-লাইনে তার ছিল ২৬০ খানি এয়ারক্রাফ্‌ট। সে তুলনায় ইংরাজপক্ষের বিমানশক্তি ছিল যৎসামান্য।

এই বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে বিমানের ব্যবহার সীমিত ছিল শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশ লক্ষ্য করার কাজে। ক্রমশঃ উন্নত ধরনের ক্যামেরার ব্যবহার চালু হল। বেতারের সাহায্যে বিমান থেকেই নিজ ঘাঁটিতে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা হল। দুপক্ষই এসব ব্যবহার শিখেছে, প্রয়োগ করছে। পাইলটেরা শত্রুপক্ষের বিমানচালককে গুলি করবার চেষ্টা যে না করেছে তা নয়, কিন্তু চলন্ত বন্দুকধারীর পক্ষে চলন্ত বৈমানিকের উপর গুলিবর্ষণ অধিকাংশই ব্যর্থ হত। তা ছাড়া আরও একটা মজার ব্যাপার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভীষ্মপর্বে লক্ষ্য করা গেছে। দুপক্ষের বিমানচালকই কেমন যেন একটা মধ্যযুগীয় নাইট-হুড শিভ্যালরিতে অভিভূত হয়ে পড়ল। ভাবখানা যেন এই: নিচে মাটিতে ওরা খাওয়া-খাওয়ি কামড়া-কামড়ি

করছে, তা করুক ; কিন্তু তুমি আমি হচ্ছি উচ্চমহলের বাসিন্দা, আমাদের একটা আলাদা মর্যাদা আছে।

গুলি ফুরিয়ে গেলে শত্রুপক্ষের বৈমানিককে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে তারা নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে যেত। যেন ক্ষাত্রধর্মের পরাকাষ্ঠা : নারায়ণী সেনা।

মেশিনগান ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। নিচে মাটিতে তার ব্যাপক ব্যবহারও হচ্ছে। কিন্তু বিমানে তখনও মেশিনগান বসানো যায়নি। বিমানের নাকের ডগায় বন্‌বন্ করে ঘুরছে প্রপেলারটা, সুতরাং সামনের দিকে গুলি চালাতে গেলে প্রথমে সেই প্রপেলারটাতেই গুলি লাগবে। আবার সামনের দিকে এক চোখ স্থির রেখে পাশের দিকে ফিরে মেশিনগান চালানোও মুশ্‌কিল। পাইলটকে সে ক্ষেত্রে ট্যারা হতে হয়। তাই স্থির হল দু-জাতের প্লেন ওড়ানো হবে। এক-চালক বিশিষ্ট 'রেকনয়টারিং' প্লেন, যা থেকে গুলিবর্ষণ করা হত না,—যার কাজ ছিল শুধু শত্রু-সমাবেশ জেনে আসা। ফটো তুলে আনা। আর দ্বিতীয় জাতের প্লেনে থাকবে দুজন মানুষ। একজন পাইলট একজন গানার। দুপক্ষই এই অলিখিত আইন মেনে নিতে বাধ্য হল।

তারপর ১৯১৫-র পয়লা এপ্রিল ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। একটি জার্মান বিমানচালক দেখল অপর দিক থেকে এক-চালক-বিশিষ্ট একটি মোরেন-সল্‌নিয়ার প্লেন তার দিকে উড়ে আসছে। জার্মান বৈমানিক লক্ষ্য করে দেখেছে ব্রিটিশ ফাইটার প্লেনে মাত্র একজন চালকই আছে, গানার নেই। তাই সে নিশ্চিন্ত ছিল—ওটা ফাইটার নয়, ক্যামেরাধারীর প্লেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—কাছাকাছি আসতেই সেই মোরেন-সল্‌নিয়ার প্লেন থেকে ছুটে এল একঝাঁক গুলি। ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই বেচারি এপ্রিল-ফুল হয়ে গেল। কী করে এমন কাণ্ডটা ঘটল বুঝে ওঠার আগেই জলন্ত প্লেনটা ভেঙে পড়ল মাটিতে। খবরটা জার্মান যুদ্ধশিবিরে আদৌ পৌঁছল না।

একবার নয়, বারে বারে এমন ঘটনা ঘটছে,—অথচ জার্মান সমর-পরিষদ তার বিবরণটা জানতেই পারছেন না। তাঁরা শুধু সংবাদ পাচ্ছেন—তাঁদের প্লেন একের পর এক ভেঙে মাটিতে পড়ছে। কারণটা অজানা। এরপর একদিন তিন-চারটি জার্মান প্লেনের একটা ঝাঁকের সামনে এসে উপস্থিত হল অমন একটি এক-চালক-বিশিষ্ট মোরেন-সল্‌নিয়ার। সে আকাশযুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছিল একজন জার্মান বৈমানিক। সে যে বিবরণ দিল তা রীতিমত অবিশ্বাস্য! মোরেন-সল্‌নিয়ারে মাত্র একজন চালকই থাকে। সে-ই মেশিনগান চালায়, অথচ তার গুলি নিজের বিমানের প্রপেলারে লাগে না। জার্মান বৈমানিকেরা গবেষণা করতে বসলেন—কেমন করে এটা সম্ভবপর হচ্ছে। জার্মান গবেষক-দলের মুখপাত্র ছিলেন এণ্টনি ফকার, একজন ওলন্দাজ বিমান-বিশেষজ্ঞ—যার নামে 'ফকার-ফ্রেণ্ডশিপ' বিমান আজ বিশ্ববিখ্যাত। ঘটনাচক্রে এই সময় একটি মোরেন-সল্‌নিয়ার ভেঙে পড়ল জার্মান এলাকায়। ভাঙা বিমানটি পরীক্ষা করে ওঁরা বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। এই বিমানের প্রপেলারে কতকগুলি শক্ত লোহার 'ডিফ্লেক্‌টার' সেঁটে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে নিজ মেশিনগানের দু-একটা গুলি প্রপেলারের গায়ে লাগলেও কোন ক্ষতি হচ্ছে না—ঐ ডিফ্লেক্‌টারে প্রতিহত হয়ে অন্যদিকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভাঙা প্লেনটি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ফকারের টেস্টিং ল্যাবরেটারিতে। ফকারের উপর হুকুম হল, অবিলম্বে এই মডেলটা কপি করে ফেল। আমাদের বিমানেও এমন ডিফ্লেকটার লাগাও।

জবাবে ফকার জানালেন, কোন প্রয়োজন নেই। আমি তার চেয়ে উন্নতধরনের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছি।

তা করেছেন বটে। প্রপেলারের ঠিক পিছনেই উনি বসিয়েছেন মেশিনগানটাকে; কিন্তু সময়ের এমন সূক্ষ্ম হিসাব করেছেন যে, প্রতি মিনিটে দেড় হাজার পাক খাওয়া ঐ প্রপেলারের পাখার ফাঁক দিয়ে গুলি ঠিক বেরিয়ে যাবে। প্রপেলারের ঘূর্ণন আর মেশিনগানের

গুলিবর্ষণ এমন নিখুঁত ছন্দে উনি বেঁধে দিয়েছেন যে, একটি গুলিও প্রপেলারের ব্লেডে লাগবে না।

এরপর দুপক্ষেই শুরু হল আকাশমার্গে মেশিনগানের যুদ্ধ। যাকে বলে ডগ-ফাইট! (প্লেট—৪)

জার্মানী ইতিমধ্যে জ্যাপেলিনও বার করেছে। সেটা বেলুন আর বিমানের মাঝামাঝি অবস্থা। অর্থাৎ ভাসে গ্যাসে, চলে এঞ্জিনে। জ্যাপেলিন কিন্তু অব্যবহার্য হয়ে গেল মেশিনগান-যুক্ত বিমান গগন-রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তার বিরাট দেহের যে কোন অংশে গুলি লাগলেই সর্বনাশ! সব গ্যাস বেরিয়ে যায়।

অনেকে বলেন, যুদ্ধ যন্ত্রবিকাশের পথ প্রশস্ত করে দেয়। অর্থাৎ যুদ্ধের প্রয়োজনে যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বৈপ্লবিক রূপ নেয়। কথাটা কিন্তু সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারছি না। দু-একটা উদাহরণ দিই।

প্রথমত দেখুন, যুদ্ধশেষে ১৯১৮-তে সবচেয়ে উন্নত ব্রিটিশ ফাইটার প্লেন ছিল 'সপ্‌উইথ সাইপ'। ২৩০ অশ্বশক্তি নিয়ে তার সর্বোচ্চ গতিবেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ১২১ মাইল। অথচ যুদ্ধ শুরু হবার আগেই রয়্যাল এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ ফ্যাক্‌টারী যে SE_4 বিমান তৈরি করেছিল তাতে মাত্র ১৬০ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট এঞ্জিনে গতিবেগ পাওয়া গিয়েছিল ঘণ্টায় ১৩৫ মাইল। তাহলে যুদ্ধের চার বছরে উন্নতিটা হল কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ দেখুন, যুদ্ধারম্ভের অনেক আগেই মশিয়ে ব্লেরিয়ো এবং তাঁর উত্তরসাধকেরা প্রমাণ করেছিলেন দুই-পাখাওয়ালা বাই-প্লেনের চেয়ে এক পাখাওয়ালা মনোপ্লেন বেশি কার্যকরী। বলেছিলেন, আগামী যুগের সব বিমান মনোপ্লেনই হবে। এ সত্য জেনে এবং মেনে নিয়েও যুদ্ধ চলা কালে মনোপ্লেন তৈরি করা হল না ব্রিটিশ কারখানায়। কেন? কর্তাব্যক্তিরা বললেন, এখন যুদ্ধ চলছে, নূতন কিছু পরখ করার সময় এখন নয়। যেটার কার্যকারিতা

প্রমাণিত হয়েছে সেই বাইপ্লেনেই বানাতে থাক সংখ্যায় বেশি, আরও বেশি করে। এই কি যান্ত্রিক উন্নতির লক্ষণ ?

এই চার বছরে লিলিয়েঁথাল, ক্যালে বা ব্লেরিয়োর মত একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসাধক অথবা বৈমানিক কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। নূতন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন, নূতন কোন কীর্তি স্থাপনের চেষ্টা কেউ করেনি। তখন মানুষ মারার কৃতিত্বটাই ছিল সবচেয়ে বড় কেরামতি। সেই নিরিখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নয় জন বৈমানিকের নাম পাচ্ছি যাঁরা সম্মিলিতভাবে ৫৭০টি শত্রুবিমান ভূপাতিত করেছেন। তার মানে, মাথা পিছু গড়ে ৬৩টির বেশি। সংখ্যাতত্ত্বের সহজ হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি বিমান-যুদ্ধের দ্বৈরথসমরে বৈমানিকের বাঁচবার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। সেখানে ষাট-সত্তরখানি শত্রুবিমান ভূপাতিত করে যুদ্ধশেষে বেঁচে থাকা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই নয় জন দুর্ধর্ষ বৈমানিক হচ্ছেন : গ্রেট-ব্রিটেনের—ম্যানক আর ম্যাক্‌কাডেন ; কানাডার—বিশপ এবং কলিশ' ; ফ্রান্সের গায়নেমার এবং কংক ; বেলজিয়ামের—কোপেন্স এবং জার্মানীর ভন রিশ্‌থোফেন এবং উদে।

যুদ্ধের বিবরণ পড়ে অরভিল রাইট নাকি বলেছিলেন : What a dream it was ; what a nightmare it has been !

—কী সুখস্বপ্নই ছিল, কী দুঃস্বপ্নই এখন দেখছি !

নিজের বিমান অক্ষত রেখে একাদিক্রমে ষাট-সত্তরখানি শত্রু-বিমানকে ভূপাতিত করা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। আগেই বলেছি, নয়জন বৈমানিক সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। তাঁদের এই সামরিক কৃতিত্বকে বোধকরি একটিমাত্র শব্দেই অভিনন্দিত করা যায়—সেই মশিয়ে ব্লেরিয়োর কাছ থেকে শেখা ফরাসী শব্দটায় —'ম্যাগ্‌নিফিক্' !

কিন্তু এবার আমি আর এক কাঠি উপরে উঠব। পাঠক বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত শব্দ খুঁজতে এবার অভিধান হাতড়াতে

পারেন। আমি বলব এমন এক বৈমানিকের কথা, যে একটিমাত্র শত্রুবিমান ভূপাতিত না করে নিজে ৩৬ বার ভূপতিত হয়েছে ; এবং তারপর কর্মজীবন থেকে অবসরান্তে নাতিপুতি নিয়ে সংসার করেছে। আজ্ঞে না, ছাপাখানার ভূতের কোন কেরামতি নেই আমার বক্তব্যে—ওটা সত্যই তিনের পিঠে ছয়—ছত্রিশবার!

আমার এ গল্পের—না গল্প হতে যাবে কোন্ দুঃখে—সত্য ঘটনার নায়ক হচ্ছে ডিক গ্রেস। মার্কিন-মুলুকের মানুষ। দুর্ধর্ষ বেপরোয়া, ভয়ডর কাকে বলে জানে না। লম্বা একহারা চেহারা, কিন্তু অত্যন্ত মজবুত গড়ন—চোখ দুটো নীল, চুলগুলো সোনালী। ছেলেবেলা থেকেই তার সখ ঐ পাখীর মত উড়বে। বালক বয়স থেকেই সে দুচোখ মেলে দেখত—পাখীরা কেমন করে উড়ে যায় আকাশে। সেই বিহঙ্গ বাসনাই তাকে পেয়ে বসল শেষ-বেশ।

ওর বয়স যখন ষোলো তখন আমেরিকা নামল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ডিক নিজের বয়স ভাঁড়িয়ে হাজির হল রিক্রুটমেট অফিসারের কাছে। বললে—সে সাবালক, যুদ্ধে নাম লেখাতে চায়, পাইলট হতে চায়। সব কয়টি দৈহিক, মানসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে ভর্তি হল ফ্লাইং স্কোয়াডে।

প্রথম কয়মাস শিক্ষার্থী হিসাবে উড়তে শিখল। মনোপ্লেন, বাইপ্লেন নিয়ে অনেক পথ পাড়ি দিল। উড়বার নানান কায়দা আয়ত্ব করল। তারপর গেল সম্মুখ-যুদ্ধে। আমেরিকা থেকে ইউরোপ। নানান বিমান-যুদ্ধে সে অংশ নিয়েছে—কিন্তু মরেনি, যুদ্ধশেষে সে আবার ফিরে এল আমেরিকায়। এবার বেকার। লণ্ডনে থাকতে একটি ইংরাজ মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার নাম এলিজাবেথ, ডাক নাম লিজা। প্রায় ওরই বয়সী, দু-এক বছরের ছোট। বাপ মা নেই, সেও নাম লিখিয়েছিল যুদ্ধে। নার্স হিসাবে। গ্রেস-এর এক বন্ধু আহত হয়েছিল, পড়ে ছিল হাসপাতালে। তাকে দেখতে গিয়েই লিজার সঙ্গে আলাপ। ভারি মিষ্টি মেয়েটি। আশ্চর্য দুটি চোখ তার, আর কথায় কথায় হাসে।

সবচেয়ে ভাল লাগে হাসলে যখন ওর গালে টোল পড়ে। ডিক গ্রেস ভালবেসে ফেলল মেয়েটিকে। সাহস করে সেকথা বলতে পারে না। লিজা যে সব কথাতেই হেসে ওঠে!

দু-একদিন ওকে নিয়ে এখানে ওখানে বেড়াতে গেল। রেস্তোরাঁয় খাওয়াল, থিয়েটার দেখাল; কিন্তু কিছুতেই আসল কথাটা সাহস করে বলতে পারল না। লিজা ওকে লণ্ডনের যাবতীয় দর্শনীয় জিনিস দেখিয়ে আনে—লণ্ডন জু, ন্যাশনাল গ্যালারী, লণ্ডন টাওয়ার। একদিন ডিক বললে, লিজা, যুদ্ধের পরে তুমি কি করবে?

: তা কি জানি? হয় তো নার্সের চাকরিই করব। কিংবা তেমন কোন সুন্দর ছেলের দেখা পেলে ভালবেসে বিয়ে করব। তার ছেলেমেয়ে মানুষ করব।

একটা ঢোক গিলে ডিক বলে, সুন্দর ছেলে মানে? কি রকম সুন্দর?

: এই ধর তোমার মত বিশ্রি ঢ্যাঙা নয়, তোমার মত কাঠখোট্টা জোয়ান নয়···

ডিক ম্লান হয়ে যায়। বেচারি ছয় ফুট লম্বা, পেশীবহুল চেহারা তার। ভাবে, সে কেন বেঁটে-খাটো নাদুস্-নুদুস্ হল না!

হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে লিজা!

: অমনভাবে হাসছ কেন?—বিহ্বল ডিক প্রশ্ন করে।

: তুমি যে বলেছ—হাসলে আমার গালে টোল পড়ে, আমাকে দেখতে আরও সুন্দর লাগে!

ডিক কি বলবে ভেবে পায় না!

যুদ্ধের প্রয়োজনে ডিক আর লিজা দুজনেরই কর্মময় জীবন, অবকাশ বড় কম। এর যখন ছুটি ওর তখন ডিউটি। তবু ওরই মধ্যে দুজনে একবার একসঙ্গে দুদিন ছুটি পেল। ডিক বললে, কি করে ছুটিটা কাটানো যায় বল তো?

: চল আমরা দুজন কোন সমুদ্রের ধারে চলে যাই!

ডিক তো এক পায়ে খাড়া। দুজনে চলে গেল সাসেক্স-এর দক্ষিণতম প্রান্তে, ব্রাইটনে। দুটো দিন যে কী আনন্দে কাটল ওদের! তবু তো হোটেলে ওরা দুজনে দু-ঘরে রাত্রে শুতে যেত। সমুদ্রের ধারে ওরা বালির দুর্গ বানিয়েছে, কাঁকড়া-পাড়ায় ছোটাছুটি করেছে, একসঙ্গে সমুদ্রে নেমে ঢেউ খেয়েছে। লিজা অয়স্টার ভালবাসে, তাই প্রতিবারই ডিক মেন্যুকার্ডে অয়স্টার আইটেমটায় টিক্ দিয়ে দিত।

তারপরেই ডিক পেল বদলির অর্ডার। ইংলণ্ড ছেড়ে তাকে যেতে হবে ফ্রান্সে। দুজনেই বুঝল এই ওদের শেষ সাক্ষাৎ। আটলান্টিক মহাসাগরের দুই প্রান্তে দুজনের বাড়ি। যুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তে ঘটনা-চক্রে কাছাকাছি এসেছিল—আর হয় তো কোনদিন দেখাই হবে না। ডিক লিজার আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, একটা কথা তোমাকে অনেকদিন বলতে চেয়েছি, সাহস পাইনি। আজ বলব?

ব্রাইটনের সমুদ্রের মত নীল দুটি চোখের তারা মেলে লিজা বলে, তুমি ভারী ভীতু! কী বলবে বল না?

ভীতু! আশ্চর্য! এ অপবাদ ডিক গ্রেসকে কেউ কখনও দেয়নি। ওর মত বেপরোয়া ছেলে ওদের স্কোয়াডে আর কেউ ছিল না। এ অপবাদেও কিন্তু ডিক সাহস সঞ্চয় করতে পারল না, বললে—না থাক।

: তবে আমিই বলি! কেমন?

: কি বলবে?

লিজা তার অনামিকা থেকে একটা নীল পাথর বসানো আঙটি খুলে নিয়ে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিল ডিক-এর কনিষ্ঠায়। বললে —এই আঙটিটার দিকে তাকালেই তোমার মনে পড়ে যাবে লণ্ডনের একটি নীলচোখ মেয়ের কথা। বিশ্বাস কর, যতদিন তুমি ফিরে না আসছ, ততদিন সেই মেয়েটি তোমার জন্য প্রতীক্ষা করবে!

ডিক অবাক হয়ে বললে, কিন্তু আমি যে ঢ্যাঙা। আমি যে কাঠখোট্টা।

: শুধু ঢ্যাঙা আর কাঠখোট্টাই নয়—ভীতু আর বোকা। ঠিক যেমনটি আমার পছন্দ।

ডিক ওকে জড়িয়ে ধরে।

যুদ্ধ চলাকালে ওদের আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি; কিন্তু ডাক-বিভাগের আয় বেড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধান্তে আমেরিকায় ফিরে এসেও ডিক ওকে প্রতি সপ্তাহে চিঠি লেখে। লেখে সে বেকার বটে, তবে দু-চার মাসের মধ্যেই কিছু কামিয়ে সে ইউরোপে চলে যাবে। আর কিছু না পারে তবে সে নৌ-বিভাগে নাম লেখাবে। ঘুরতে ঘুরতে যেই জাহাজটা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছবে অমনি ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে তার লিজার কাছে। লিজা জবাবে লেখে—পাগলামি কর না, আমি প্রতি সপ্তাহে বেশ কিছু করে জমাচ্ছি। বছর কয়েকের ভিতরেই একজনের অতলান্তিক পাড়ি দেবার মত ভাড়া সঞ্চিত হবে। তখন হয় লিজা চলে আসবে মার্কিন-মুলুকে, নয় ডিক আসবে লণ্ডনে।

মহাসাগরের দুপ্রান্তে বসে দুজনে সেই দিনটির প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে।

বেকার মানুষটা একদিন সানফ্রান্সিস্কোর পথে পথে বাউণ্ডুলের মত ঘুরছে; রিশ্‌মণ্ডের কাছে দেখে প্রচণ্ড ভীড় হয়েছে সামনের রাস্তাটায়। ব্যাপার কি? না, সিনেমার শুটিং হচ্ছে। পুলিশ রাস্তাটাকে ঘিরে রেখেছে। পুলিশ বেষ্টনীর বাইরে অগণিত দর্শক। ভিতরে ক্যামেরাধারী যন্ত্রবিদ্ আর একজন বৃদ্ধ পরিচালক। রাস্তার মাঝখানে খাড়া হয়েছে প্রকাণ্ড একটা মঞ্চ—চল্লিশ ফুট উঁচু। তার মগডালে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আর নিচে জনা দশেক কর্মী প্রকাণ্ড একটা জাল বিছিয়ে গোষ্ঠমামার ভঙ্গিতে খাপ পেতেছেন। মনে মনে বোধ করি বলছেন—'পড় পড় পড় পড়বি পাখী ধপ্।'

শোনা গেল—ঐ লোকটা চল্লিশ ফুট উঁচু মঞ্চের উপর থেকে নিচে জালের উপর লাফ দেবে। মুভি-ক্যামেরায় সেই দৃশ্যটা তোলা হবে। ভীড়ের মাঝখানে ডিক গ্রেসও দাঁড়িয়ে গেল, বিনাপয়সার তামাসা দেখতে।

ক্যামেরার খুটখাট বন্ধ হল। রাস্তার এখানে-ওখানে সূর্যালোক প্রতিফলিত করার রিফ্লেকটার সাজানো হয়েছে। পরিচালক চীৎকার করে উঠলেন: সাইলেন্স!

শান্ত হল জনতা। পরিচালক ঊর্ধ্বমুখে বললেন, তুমি তৈরি?

উপরের লোকটা জবাব দিল না। হাতখানা তুলল শুধু। অর্থাৎ সে প্রস্তুত।

পরিচালক এবার ক্যামেরাম্যানদেরও একই প্রশ্ন করলেন। তারাও হাত নেড়ে সায় দিল।

: জাম্প!

অমনি ক্যামেরা কির-কির শব্দে চলতে শুরু করল। সবাই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে! কিন্তু কোথায় কি? বজরঙবলী বার কতক নিচের দিকে তাকালেন, কপালের ঘামটা রুমাল দিয়ে মুছলেন, তারপর ধরা গলায় বললেন, আ'য়াম সরি! আমি পারব না।

লে হালুয়া! মাথায় হাত দিয়ে বসলেন পরিচালক। তাঁর মাথাভরা টাক না হলে ক্ষোভে তিনি হয়তো পটপট মাথার চুল ছিঁড়তেন! সব আয়োজন সম্পূর্ণ—কয়েক হাজার ডলার খরচ হয়ে গেছে এই আয়োজন করতে, আর এখন লোকটা বলছে, 'সরি!' ইয়ার্কি নাকি! ওকে পিছন থেকে আচমকা ধাক্কা মারলে কেমন হয়?

ডিক গ্রেস একবার উচ্চতাটা মাপ করল তার দৃষ্টি দিয়ে।উপরের ঐ লোকটার জন্য মায়া হল তার। বেচারি! তারপর কী তার খেয়াল হল—হঠাৎ পুলিশের কর্ডন ভেঙে সে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ডিরেকটারের কাছে গিয়ে বললে, লুক হিয়ার স্যার, আমি লাফ মারতে রাজী আছি! তবে টাকাটা নগদে দিতে হবে।

পরিচালক ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন, তুমি পারবে? এভাবে লাফিয়েছ কখনও এর আগে?

: না, তা লাফাইনি। তবে আমি ঠিক পারব। আমাকে একটা চান্স দিতে ক্ষতি কি?

: কিন্তু শূন্যে যে দুটো ডিগবাজি খেতে হবে। তা পারবে তুমি?

: সারা জীবনই ডিগবাজি খাচ্ছি। ও আর শক্ত কি?

ছেলেটির বেপরোয়া কথায় ভরসা পেলেন পরিচালক। তাছাড়া সত্যই একটা চান্স দিয়ে দেখতে ক্ষতি কি! বললেন, ঠিক আছে। উপরে ওঠ। আমি 'জাম্প' বললে লাফ মারবে।

যে কথা সেই কাজ। ডিক মই বেয়ে তর্‌তর্‌ করে উঠে গেল। লোকটার সঙ্গে পোশাক বদলালো। তারপর নিচের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল এ বাহাদুরী না দেখালেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। স্বেচ্ছায় সে ফাঁদে পা দিয়ে বসে আছে। কয়েক শ' জোড়া ঊর্ধ্বমুখ দর্শকের উদ্‌গ্রীব চোখ তার দিকে তাকিয়ে। বাঁ-হাতের আঙটিটার দিকে হঠাৎ নজর পড়ল ডিক-এর। নীলাঙ্গুরীয়! মনে মনে বললে, লিজা, ওরা জানে না। ওরা ভাবছে আমি বুঝি নিচের দিকে লাফ মারছি। আমি আসলে লাফ মারছি অতলান্তিক পার হয়ে ইংল্যাণ্ডের দিকে!

চিন্তায় বাধা পড়ল তার। কানে গেল অমোঘ আদেশ: জাম্প!

চোখ-কান বুঁজে শূন্যে ঝাঁপ দিল ডিক।

ছবি তোলা শেষ হলে পরিচালক মশাই ওকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে দু পাত্র পানীয় নিয়ে বসলেন ছোকরার সঙ্গে আলাপ করতে। ওর তারুণ্যে, দুঃসাহসিকতায় এবং ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। বললেন, ইয়ংম্যান, আজ তুমি আমার অনেকগুলো

ডলার বাঁচিয়ে দিয়েছ। আমি তোমাকে যা দিয়েছি তার পঞ্চাশগুণ লোকসান আজ হতে বসেছিল আমার। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ!

মিষ্টি হাসলে ডিক। জবাব দিল না।

: আচ্ছা সত্যি করে বল তো—হঠাৎ এমন বীরত্ব দেখাবার ভূত তোমার ঘাড়ে চাপল কেন?

এবারও ডিক জবাব দেয় না। শ্রাগ করল শুধু। সিগারেট ধরালো একটা।

: আমি জানি। তারুণ্য! তাই নয়? অতগুলো লোকের সামনে হঠাৎ 'হিরো' হয়ে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল তোমার। ঠিক বলিনি?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডিক বললে, স্যার, রাস্তা যদি একেবারে জনশূন্য হত তাহলেও আমি লাফ মারতাম। আসলে আমার প্রয়োজন ছিল ঐ পারিশ্রমিকটার।

পরিচালক মশাই একটু বিস্মিত হলেন। বললেন, যদি কিছু না মনে কর—এমন মর্মান্তিক অর্থের প্রয়োজন হল কেন তোমার?

ডিক আর সঙ্কোচ করল না। সংক্ষেপে খুলে বললে তার সব কথা। লিজার কথা।

পরিচালক মশাই বললেন, তুমি আমার অশেষ উপকার করেছ, আমিও তোমায় কিছুটা সাহায্য করব। কোন একটা চাকরি পাইয়ে দেব তোমাকে। কী কাজ জান তুমি?

হো-হো করে হসে ওঠে ডিক। বলে, স্যার, আমি যে কাজটা যত্ন নিয়ে শিখেছি আজকের এই যুদ্ধান্তের দুনিয়ায় তার কোনও দাম নেই। আমি একজন এক্স-পাইলট—এস্-পাইলটও বলতে পারেন। নানান কায়দায় আকাশে ডিগবাজি খেতে জানি শুধু। আর কিছু জানি না।

পরিচালক মশাই টেবিল থেকে তাঁর লেটারহেড প্যাডখানা টেনে নিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে খস্ খস্ করে দু-চার ছত্র কি লিখে

কাগজখানা বাড়িয়ে ধরলেন ডিকের দিকে। বললেন, কোন শিক্ষাই ব্যর্থ হয় না হে ছোকরা! যুদ্ধ শেষ হয়েছে তো কি? আকাশে ডিগবাজি খেয়েও তুমি পয়সা কামাতে পারবে।

বিস্মিত ডিক চিঠিখানা খুলে দেখল। পত্রের প্রাপক উইলিয়ম ওয়েলম্যান।

: ঠিক তোমার মত একটি ছোকরাকে খুঁজছেন মিস্টার ওয়েলম্যান, আমি জানি। উইলিয়াম ওয়েলম্যানের নাম শুনে থাকবে—না শুনে থাকলেও ক্ষতি নেই, হলিউড গিয়ে যাকে জিজ্ঞাসা করবে সে-ই দেখিয়ে দেবে তাঁর অফিস। নামকরা পরিচালক। উনি একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি তুলছেন, তার নাম 'উইংস'—মানে ডানা। যুদ্ধের উপরে ছবি। তুমি অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা কর।

ডিক গ্রেস গিয়ে হাজির হল হলিউডে। ওয়েলম্যান সত্যই একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। প্রকাণ্ড অফিস। খুঁজে নিতে বেগ পেতে হল না। চিঠিখানি পড়ে উনি ডিককে আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, এমন একখানা ছবি আমি তুলছি বটে। যুদ্ধের উপর এ পর্যন্ত যত ছবি উঠেছে এটা হবে তার মধ্যে সবচেয়ে রিয়ালিস্টিক। তাতে চার-চারটে প্লেন-ক্র্যাশের দৃশ্য থাকবে। দুটি জার্মান প্লেন, দুটি মিত্রপক্ষীয়। আমি কোন পক্ষপাত করব না।

: ওর মধ্যে যে-কোন একটা প্লেন-ক্র্যাশ আমি করতে পারি।

: একটা কেন হে? চারটেই করতে পার, মানে পর্যায়ক্রমে। আসলে তুমি তো 'ডামি' সাজবে। কখনও ইংরাজ, কখনও মার্কিন, কখনও বা জার্মান!

একটা ঢোক গিলে ডিক বলে, চার-চারটে ক্র্যাশ! মানে পর পর?

: না না, পর পর কেন? প্রতিটা এ্যাক্সিডেন্টের পর যথেষ্ট

সময়ের ব্যবধান থাকবে। দরকার হলে এর মধ্যে তো হাসপাতালও ঘুরে আসতে হবে তোমাকে।

: ও! তাও ভেবে রেখেছেন আপনি?

: ভাবব না? বল কি হে? আমার আগের ছবিটায় এক ছোকরা তো মরেই গেল!

ডিক ইতস্ততঃ করে বলে, চারটে দুর্ঘটনার বর্ণনা যদি একটু শোনাতেন—

: শ্যিওর! শোন। প্রথমবার তুমি হচ্ছ একজন মার্কিন পাইলট। জার্মান প্লেনের গুলি খেয়ে তোমাকে ঘাড় গুঁজড়ে পড়তে হবে। পড়বে এক বিজন প্রান্তরে, একটা ধ্বংসস্তূপে। চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া আর বোমার গর্ত। তোমাকে ঠিক জায়গায় পড়তে হবে—ফুট-ত্রিশেক ব্যাসের একটা বৃত্তের মধ্যে। তার চেয়ে দূরে পড়লে ক্যামেরায় ছবিটা উঠবে না, অর্থাৎ সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

: বুঝলাম। আর বাকি তিনটে?

: দ্বিতীয়বার প্লেনটা সোজা গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে আঘাত করবে। মুহূর্তে চুরমার হয়ে যাবে প্লেনটা। বৈমানিক মারা যাবে।

: মরে যাব?

: না না, তুমি মরতে যাবে কেন? ষাট, বালাই! মরবে আমার গল্পের বৈমানিক। তুমি ভাঙা প্লেন থেকে নিচে পড়বে জালের উপর। আর তৃতীয়টায় তোমার প্লেনে আগুন ধরে যাবে—রিয়্যাল ফায়ার! দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে প্লেনটা! তোমার ভয় নেই, এ্যাসবেস্টসের তৈরি পোশাক দেব তোমাকে।

: না, ভয় আর কি? কিন্তু চতুর্থটা?

: সেটার কথা এখনও সব ঠিক হয়নি। ঐ জাতীয় কিছু হবে একটা।

ডিক গ্রেস যদি বাঙালী হত, তাহলে বোধ করি এরপর সে

বলত, স্যার, ছবিটার নাম 'উইংস্' না রেখে 'পেল্লাদ চরিত্র' রাখলে কেমন হয়?

তা সে বলল না। বলল, আজ রাতটা ভাবি। কাল আপনাকে বলব।

পরদিন সে এসে জানাল, সে রাজী। ডিক গ্রেস চারবারই ঐ বিমান-দুর্ঘটনায় ডামির ভূমিকায় অংশ নিতে প্রস্তুত। চতুর্থ এ্যাকসিডেণ্টটা যা-ই হোক না কেন।

একটিমাত্র সর্ত সে আরোপ করল। বললে, কণ্ট্রাক্টে আমি সই করব, কিন্তু একটি সর্তে। সিনেমা কোম্পানি নিজব্যয়ে আমার জীবনবীমা করিয়ে দেবে। বিশ হাজার ডলার।

ওয়েলম্যান এককথায় রাজী। বলেন, কে তোমার নমিনি?

ঃ এলিজাবেথ মরিস। লণ্ডন হাসপাতালের নার্স।

প্রথম দৃশ্যটি তোলার ব্যবস্থাপনা দেখে এসে ডিক বললে, মনোপ্লেন চলবে না, বাইপ্লেন চাই!

ঃ কেন?

ঃ প্রথমত আপনি রিয়ালিস্টিক ছবি চান। যুদ্ধে মনোপ্লেন ব্যবহৃত হয়নি। দ্বিতীয়ত আমি চিৎ হয়ে পড়ব, কি উবুড় হয়ে পড়ব তার স্থিরতা কি? বাইপ্লেন হলে উপর-নিচে আমার দুদিকেই একজোড়া করে ডানা থাকবে। তাতে আঘাত লাগার সম্ভাবনা কম। এছাড়া ককপিটের মাথাটা খোলা রাখতে হবে, যাতে আগুন ধরে গেলে আমি লাফিয়ে নামতে পারি।

ওয়েলম্যান খুশি হলেন। বুঝলেন, ছোকরা তার কাজটা ভালভাবেই জানে। ও কাজের ছেলে।

ক-দিন পরে হলিউডের অনতিদূরে এক বিজন প্রান্তরে ওরা সদলবলে চলে গেল। জায়গাটাকে ইতিমধ্যে বিমান-বিধ্বস্ততার রূপ দেওয়া হয়েছে। মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে ভাঙা বাড়ি, টেলিগ্রাফের খুঁটি; চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া আর বোমার গর্ত।

আর্ট-ডাইরেক্টর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তুলির শেষ স্পর্শ লাগাবার ব্যবস্থা তদারক করছেন। ক্যামেরাধারীর দল এখানে-ওখানে ক্যামেরা খাটাচ্ছে। একসঙ্গে চার-পাঁচটি ক্যামেরায় ধরা হবে দৃশ্যটা। তারপর পরিচালক আর এডিটার সেগুলি কাট-ছাঁট, জোড়াতালি করবেন। সকাল দশটা। প্রখর সূর্যালোক আছে। ঘণ্টাখানেক সময় আছে এখনও। সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ডিক-এর শেষ পর্যন্ত কী হয়! ওয়েলম্যানের ব্যবস্থা নিখুঁত। একজন ডাক্তার উপস্থিত আছেন ঔষধপত্র নিয়ে, খাড়া আছে একটা এ্যাম্বুলেন্স। এমনকি নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে একটি কেবিন পর্যন্ত ভাড়া করা আছে। এসব খবর অবশ্য ডিককে জানানো হয়নি।

ডিক নির্বিকার। সরেজমিনে একবার জায়গাটা দেখে এসে জমিয়ে বসেছে তাসের আড্ডায়। ওর বন্ধুরা জানে এই হয়তো ডিক-এর জীবনে শেষ তাসখেলা—তবু সেকথা কেউ বলছে না। হৈ-হুল্লোড়ের অভিনয় করছে তারা।

এমন সময় ডাক এল ঃ ডিক গ্রেস! উঠে এস। সবাই প্রস্তুত!

ডিক সে-হাত জিতছিল। বিরক্ত হয়ে তাসগুলোকে সে চিতিয়ে দিল টেবিলের উপর। উঠে দাঁড়াল। নিঃশেষিতপ্রায় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, তোরা চালিয়ে যা। আমি যাব আর আসব।

ওরা অতিকষ্টে মনোভাব লুকিয়ে হাসিমুখেই বলে, ঠিক হ্যায় ডিক!

ও বেরিয়ে এসেছে, হঠাৎ কানে গেল চাপা গলায় ওর একজন বন্ধু তার পার্শ্ববর্তীকে বললে, ডিক-এর পাওনা হয়েছিল দেড় ডলার। ওটা দিয়ে দিলেই হত! ঋণ রাখাটা ঠিক হল না!

ওর পার্শ্ববর্তী বন্ধু তৎক্ষণাৎ মুখ চেপে ধরেছে তার।

কিন্তু কথাটা ডিক-এর কানে গেছে ঠিকই। দ্বারপথে সে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, ভাবিস না রে, ডিক ঠিক ফিরে আসবে তার পাওনা আদায় করতে। মরব না আমি।

সবাই নির্বাক। কী কথা থেকে কী কথা।

এক পা ঘরের ভিতর ফিরে আসে ডিক। বলে, কি রে, বিশ্বাস হচ্ছে না? বাজী রাখবি? আমি জিতলে এক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়াবি, হারলে আমার কফিনে ফেলে দিবি তোর ঐ দেড় ডলার। রাজী?

ওর বন্ধু লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল।

ধমক দিয়ে ওঠে ডিক, চুপ করে আছিস কেন রে হতভাগা? জবাব দে। বাজী ধরবি?

ওর এক বন্ধুও উল্টে ধমক দেয়, কী পাগলের মত বকছিস ডিক! এমন বাজী কেউ ধরে? বাজী রেখে ও ভগবানকে কি বলবে? হে ভগবান! আমার গাঁটগচ্ছা করিয়ে দাও? আমাকে বাজীতে হারিয়ে দাও—তোমাকে জোড়া মুরগী দেব!

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে। আবহাওয়াটা হাল্‌কা হয়ে যায়।

প্লেন নিয়ে ডিক উড়ল আকাশে। ওর শত্রুপক্ষও উড়ল পাশাপাশি। ক্যামেরাম্যানের দল সচকিত হয়ে ওঠে। বিমান-যুদ্ধ হল আকাশে। যথারীতি গুলিবিদ্ধ হল ডিক-এর প্লেন। সোজা নেমে এল সেটা পাক খেতে খেতে—যেন সত্যই গুলিবিদ্ধ বিমান। শেষের শ'দেড়েক ফুট সে সোজা নেমে এল নাক মাটির দিকে করে। ভূমি স্পর্শ করার মাত্র বিশ-পঁচিশ ফুট আগে সে কোনক্রমে সোজা করল তার আকাশযান। ভূমি স্পর্শমাত্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল তার যন্ত্রটা!

ডাক্তার নার্স ছুটে যেতে চাইছিলেন। কোনক্রমে প্রহরীদল রুখল তাঁদের। ক্যামেরা তখনও চলছে। সীনটা শেষ হয়নি। কথা আছে একই সীনে বৈমানিক খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্লেন থেকে বেরিয়ে আসার অভিনয় করবে।

তাই এল ডিক। তফাৎ শুধু এই—সে অভিনয় করেনি আদৌ, প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে তার। সে সত্যই খোঁড়াচ্ছে।

পরে দেখা গেল কাঁটাতারের বেড়ার তিন-তিনটে খুঁটি ওর ককপিটটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে। একটা গজাল ওর আসন থেকে ছিল মাত্র এগারো ইঞ্চি দূর দিয়ে।

জীবনবীমা কোম্পানির তরফে উপস্থিত ছিলেন একজন অফিসার। তিনি বললেন, কোম্পানির বিশ হাজার ডলার বেঁচে গেছে মাত্র এগারো ইঞ্চির জন্য। ন্যারো এস্‌কেপ!

পরবর্তী তিনটি দুর্ঘটনাতেও ডিক বেঁচে ফিবে এল।

এরপর অসংখ্যবার প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ডিক গ্রেস এই সব অভিনয়ে অংশ নিয়েছে। ক্রমে সে হয়ে পড়ল হলিউডের সবচেয়ে নামকরা স্টান্টম্যান। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ার দৃশ্যে, মোটর-দুর্ঘটনা, রেল-দুর্ঘটনাব দৃশ্যে সে ছিল বাঁধা ডামি। এমন কি একবার একটি অগ্নিদগ্ধ মহিলার ডামি হিসাবে গাউন পরে মেয়ে সেজে সে প্রায় মরতে বসেছিল। ডিক-এর নাম ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত হলিউডে। সব পরিচালকই তাকে ধরে টানাটানি করে। ইংল্যাণ্ডে বসে এসব খবর পেল নার্স লিজা। ইংরেজ মেয়ে মাথার দিব্যি দেয় কিনা জানি না, তবে সে খুব কড়া ভাষায় ডিককে বারণ করেছিল এ পাগলামি বন্ধ করতে। লিখেছিল, ইতিমধ্যে সে বেশ কিছু জমিয়ে ফেলেছে। অচিরেই সে এসে পড়বে আমেরিকায়।

সারাজীবনে ডিক গ্রেস নাকি ছত্রিশবার বিমান-দুর্ঘটনায় অংশ নেয়। তার অভিনয় হয়তো তুমি-আমিও দেখেছি, ঠিক খবর রাখি না। কারণ ঐসব দুর্ধর্ষ কাণ্ডকারখানার শট্ হলিউডের কোনও ফিল্ম-লাইব্রেরীতে সযত্নে রাখা আছে। যে কোন পরিচালক যথোপযুক্ত রয়্যালটি দিয়ে লাইব্রেরী থেকে সেইসব অভিনয়াংশ নিয়ে কায়দা করে জুড়ে দিয়েছেন নিজ নিজ যুদ্ধের ছবিতে। সে রয়্যালটির একটি ভাগ আজও পায় ডিক-এর নাতিপুতিরা।

ওর শেষ বিমান-দুর্ঘটনার কথাটা বলি।

পঁয়ত্রিশতম দুর্ঘটনার পর লিজা নিজেই চলে এসেছিল হলিউডে। ডিককে এই বেপরোয়া দুঃসাহসিক জীবিকা থেকে সরিয়ে নিয়ে

যেতে। দীর্ঘ দিন পরে ডিক আর লিজা মিলিত হল। ওদের বিবাহের পরিকল্পনা তো ওরা দুজনেই করেছে এতদিন - এবার পাকাপাকি দিন স্থির হল। ডিক বললে, একটা কথা! আমি আর একটা কণ্ট্রাক্টে সই করে বসে আছি। সেটা মিটে না গেলে বিয়ে করাটা ঠিক হবে না।

লিজা ক্ষেপে যায়। বলে, আবার! বেশ, বল কোন্ পরিচালকের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করেছ? আমি নাকচ করিয়ে আনছি।

কিন্তু কিছুতেই রাজী হতে পারে না ডিক। ওর কথায় ভরসা করে প্রযোজক আর পরিচালক যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন; এখন সে কি করে পিছ-পাও হয়? অতএব লিজাকে উপস্থিত থাকতে হল ডিক-এর অভিনেতা জীবনের শেষ অভিনয় দেখতে।

ঘটনাস্থল এবার সমুদ্রবক্ষ। কাহিনীর সূত্র অনুসারে একক বৈমানিক সমুদ্রবক্ষে পড়ে যাবে এবং তার সলিল-সমাধি হবে। কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী দশ হাজার ফুট উপর থেকে তাকে পড়তে হবে এবং পতনমুহূর্তে অন্তত আশি মাইল গতিবেগ রাখতে হবে।

লিজা চটে উঠে বলে, এমন মারাত্মক সর্ত করতে গেলে কেন? ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে অত উচু থেকে পড়লে বাঁচবে তুমি?

ডিক বলে, বাজী ধর! হারলে আমাকে এক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়াবে আর জিতলে কোন মোটা বেঁটে নাদুস-নুদুসকে বিয়ে করবে!

লিজা কোনও জবাব দেয় না। এসব রসিকতা তার ভালই লাগছিল না।

ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল থেকে রওনা হল একটা চার্টাড করা জাহাজ, প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। তার এক অংশে অপেক্ষা করে আছে জীবনরক্ষী বাহিনী। নৌ-বিভাগ থেকে আমদানি করা দক্ষ সাঁতারুর দল; ডুবন্ত মানুষকে জল থেকে তুলে আনার বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত তারা। দু-দশজন আছে ডুবুরী, অক্সিজেন সিলিণ্ডার পিঠে বেঁধে। প্রয়োজনে যেন সমুদ্রের তলদেশেও খোঁজ করা যায়।

জাহাজের দ্বিতীয় অংশটা বস্তুত হাসপাতাল। তাতে অপারেশন টেবিল সাজানো। নানান জাতের ঔষধপত্র, অক্সিজেন সিলিণ্ডার, ছুরি কাঁচি এ্যানাসথেটিক ইত্যাদি নিয়ে গ্লাভস্ পরে অপেক্ষা করছেন একজন নামকরা শল্য-চিকিৎসক আর তাঁর সহকারী। নার্স আছে পাশে। ওঁরা জানেন রুগীর নাম, ধাম, বয়স—জানেন না হাত-পা-বুক-পেট কোন্‌টা কাটা-ছেঁড়া করতে হবে। আর খোলা ডেক-এর উপর ঊর্ধ্বমুখ ক্যামেরা নিয়ে পরিচালকের দলবল।

কাণ্ডকারখানা দেখে লিজা স্তম্ভিত। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল রেলিং ধরে।

নির্ধারিত সময়ে উপকূলভাগ থেকে উড়ে এল একটি বাইপ্লেন। কক্‌পিটের মাথা খোলা। চেনা যায় না, অনুমান করে নিতে হয় ঐ লোকটা হচ্ছে ডিক গ্রেস, তার হবু-স্বামী! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে লিজার।

জাহাজটার উপর এসে বার কতক পাক খেল প্লেনটা। বৈমানিক হাতটা বার করল একবার—অর্থাৎ সে লক্ষ্যবস্তুটা দেখতে পেয়েছে। লক্ষ্যবস্তু আর কিছুই নয়, জাহাজ থেকে শ'দুই ফুট দূরে ভাসমান ছোট্ট একটা লালরঙের কর্ক। ঐটাই তার টার্গেট। ঐখানেই ডাইভ দিতে হবে তাকে—দশহাজার ফুট উপর থেকে পাক খেতে খেতে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে সে গোত্তা খেয়ে পড়বে ঐ ভাসমান কর্কটার উপর।

ডেকের উপর পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল একজন লোক। সে পতাকাটা আন্দোলিত করে ইঙ্গিত করল। ডিক প্লেন নিয়ে উঠে গেল উপরে। উপরে, উপরে আরও উপরে। অল্টিমিটারে নির্দিষ্ট সীমারেখা দেখে নিয়ে সে সোজা নেমে এল তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে, একেবারে সোজা! প্লেনের নাক খাড়া সমুদ্রের দিকে! বস্তুত ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে সে সমুদ্রে পড়েছিল!

প্রচণ্ড একটা জলোচ্ছ্বাস।

মুহূর্তমধ্যে তলিয়ে গেল প্লেনটা।

চার-পাঁচটা স্পীড-বোট ছুটে গেল সেদিকে। দশ-পনেরজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। তারপর সব শান্ত। জলের উপর ভাসছে খান কয়েক স্পীড-বোট। আর সবাই জলের নিচে।

ডেকের উপর সংজ্ঞাহীন লিজা লুটিয়ে পড়েছে রেলিং-এর পাশে। ছুটে এসে ওকে তুলে নিয়ে গেল ওরা।

পরে শুনেছিল, পুরো পাঁচ মিনিট পরে সংজ্ঞাহীন ডিক গ্রেসকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। না, তার আঘাত এমন কিছু মারাত্মক নয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এল তার। সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। পরিচালককে বললে, স্যার। এবার আমার ছুটি?

পরিচালক বললেন, না। এখনও একটা কাজ বাকি আছে।

রুখে ওঠে লিজা, মানে? কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী এটাই ছিল ওর শেষ অভিনয়।

পরিচালক মাথার টুপি খুলে বলেন, মাপ করবেন ম্যাডাম। অভিনয় করতে বলছি না ডিককে। কিন্তু আজ তাকে একটি ডিনারে অংশগ্রহণ করতে হবে। ডিক গ্রেস-এর ফেয়ার-ওয়েল ডিনার পার্টি। সব আয়োজন এ জাহাজেই আছে। এঁরা সবাই আমার অতিথি।

বলে, তিনি আর সকলের দিকে ফিরে বলেন—লেডিস্ এ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন। ডিক গ্রেস-এর কর্মময় জীবনের শেষ অভিনয় আজ আপনারা দেখেছেন। আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করছি ডিক দীর্ঘ দীর্ঘদিন বাঁচবে এবং তার কীর্তি-কাহিনী তার নাতি-নাতনীদের শোনাবে। আজ শুধু ডিক অবসর নিচ্ছে বলেই আমরা এ ভোজের আয়োজন করিনি, এটা আমাদের তরফে তার ওয়েডিং ডিনার। আশা করি ম্যাডাম লিজা আমাদের ডিক-কে যথাসময়ে নাতি-নাতনী উপহার দেবেন যাতে সে তার গল্প তাদের শোনাতে পারে।

সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে।

ডিক গ্রেস তার স্মৃতিচারণের উপসংহারে বলছে—"এখন আমার অবসরপ্রাপ্ত জীবন। অনেক কিছুই পেয়েছি জীবনে। সম্মান, হাততালি এবং ভালবাসা। ভগবান সকলের সব কামনা চরিতার্থ করেন না। যেমন ধরুন কিশোরী বয়সে লিজার স্বপ্ন ছিল বেঁটে-খাটো নাদুস-নুদুস কোন মানুষের ঘর করার। আমি দীর্ঘকায়, মেদবর্জিত, ফলে তার সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। জানি না, আমার শেষ ইচ্ছাটাও ভগবান পূর্ণ করবেন কিনা। বিহঙ্গ-বাসনা আর নেই, আকাশে উড়তে চাই না আর। এখন আমার একমাত্র ইচ্ছা—সেই পরিচালক মশাইয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী সার্থক করা। লিজা আমাকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা উপহার দিয়েছে। তারা যথাক্রমে নার্সারী ও কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে পড়ে। জানি না তারা কবে আমাকে দেবে গল্প শোনানোর মত নাতি এবং নাতনী!"

পাঠক হয়তো লক্ষ্য করে দেখেছেন, আমাদের কাহিনী একটা বিশেষ দিকে মোড় নিয়েছে। আমরা আর আবিষ্কারক অথবা বৈজ্ঞানিকদের কথা বলছি না, বলছি পাইলটদের কথা। উপায় নেই। বিংশ শতাব্দী হচ্ছে 'স্পেশালাইজেশনের' যুগ। হয় আমাকে বলতে হবে বৈজ্ঞানিকদের কথা, নয় বৈমানিকদের। মজা হচ্ছে এই, এ-যুগে একক আবিষ্কার বড় একটা হয় না। যাঁরা বলেন—এ্যাটম-বোমার আবিষ্কারক 'ওপেনহেইমার', তাঁরা ভুল বলেন। অন্তত পঞ্চাশজনের নাম করতে হয় যাঁদের তিলে তিলে দান করা সম্পদে এ তিলোত্তমা মেঘলোক থেকে উড়ে এসেছিল হিরোশিমার দিকে। তাঁদের দান কোন অংশে ওপেনহেইমার-এর চেয়ে কম নয়। কিন্তু কেউ যদি বলেন প্রথম এ্যাটম-বোমা নিয়ে যে B.29 প্লেনটি সেই ৬.৮.৪৫ তারিখে হিরোশিমার দিকে উড়ে গিয়েছিল তার বিমানচালক ছিলেন কর্ণেল পল টিবেটস্, তবে তিনি কিছুমাত্র ভুল বলেন না। বড়জোর আপনি সংশোধন করে বলতে পারেন—ঐ সঙ্গে ক্যাপ্টেন রবার্ট লিউইস্-এর নামটা করা উচিত, যেহেতু সে ছিল কো-পাইলট; এবং মেজর টমাস ফেয়ারবীর

নামটাও উল্লেখ করা ভাল, কারণ সে-ই টিপ করে বোমাটা ফেলেছিল। এ্যালকক, ব্রাউন, লিণ্ডেনবার্গ থেকে শুরু করে এ-যুগের উরি গ্যাগারিন, ভ্যালেন্টিনা কিংবা আর্মস্ট্রং—এদের কৃতিত্বের কথা জানানো সহজ ; --কিন্তু যে বৈজ্ঞানিকদল গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করে, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি করে মহাকাশ জয় সাফল্যমণ্ডিত করলেন তাঁদের কীর্তি-কাহিনী অধিকাংশই রয়ে গেছে নেপথ্যে। তাই আমাকে বেছে নিতে হয়েছে এই পথ। বৈজ্ঞানিক নয়, বৈমানিকদের পদাঙ্ক ধরেই জানতে হবে আকাশজয়ের পরবর্তী ইতিহাস।

'লুপিং দ্য লুপ' কাকে বলেন জানেন ? গিরিবাজ লঙ্কা পায়রার মত আকাশে ডিগবাজি খাওয়া। কাজটা কঠিন, অত্যন্ত কঠিন। এ কসরৎ প্রথম যিনি দেখিয়েছিলেন তাঁর নাম অনেকেই জানেন না—তিনি রাশিয়ান বৈমানিক নেস্‌তেরভ্‌ (Nesterov)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগেই তিনি এ কসরৎ দেখিয়েছিলেন। নেস্‌তেরভ্‌-এর বিস্তারিত সংবাদ কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি —কিন্তু তাঁর কীর্তিটার প্রকৃত মূল্যায়নই বোধকরি হবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া। কাজটাকে কেন এত কঠিন বলছি সেটা অনুভব করতে হলে আমাদের মোটামুটিভাবে জেনে নিতে হবে—কী করে এয়ারোপ্লেন আকাশে ওড়ে। কেমনভাবে তাকে ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকানো যায়, উপর-নিচে ওঠানো বা নামানো যায়। খুব সংক্ষেপে সে-কথাটা আগে বলে নিই :

এয়ারোপ্লেনকে ডাইনে-বাঁয়ে বা উপর-নিচে চালিত করার মূল কাজটা হয় ল্যাজ অঞ্চলে। চিত্র—৯-এ দেখুন, ল্যাজে তিন-তিনটে পাখনা আছে, তাই নয় ? মাঝের খাড়া পাখনাটাকে বলে 'ফিন', ওটাই আকাশযানকে নাক-বরাবর উড়িয়ে নিয়ে যাবার ব্রহ্মাস্ত্র। ঐ ফিনটার মাঝখানে দেখুন ছোট্ট একটা পাখনার-বাচ্ছা আছে, তার নাম 'রাডার'। আর দু-পাশের দুটি জমির সঙ্গে সমান্তরাল

পাখনায় আছে দুটি অনুরূপ পাখনার-বাচ্ছা, তাদের বলে 'এলিভেটার'। এই সব অংশের বাঙলা নামকরণ করবার চেষ্টা করছি না। আপাতত ইংরাজি নামই চলুক না। অন্তত যতদিন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কণ্ঠ্-কা-লেঙটি আটা

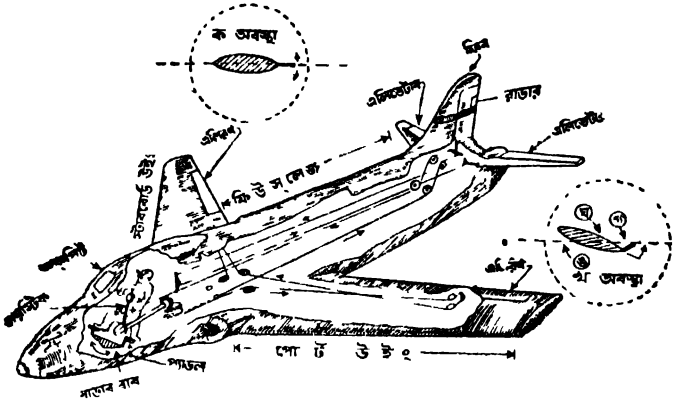

চিত্র—৯

পরিভাষাবিদ 'হিলানেবালা', 'উচাই-উঠানেবালা', 'নিচাই-ভেজনেবালা' জাতীয় প্রতিশব্দ আমদানি না করছেন।

বৈমানিকের আসন, যাকে বলে ককপিট, সেখানে লক্ষ্য করে দেখুন—একটি দণ্ড আছে। ওটি হচ্ছে 'জয়স্টিক'। ওটাকে সামনে-পিছনে কিংবা ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকানো চলে—যেমন দেখানো হয়েছে তীরচিহ্ন দিয়ে। তেমনি বৈমানিকের দুটি পা রাখা আছে দুটি প্যাডেল-এ; অনেকটা মোটরগাড়ির এ্যাক্সিলেটার বা ব্রেকের মত। তফাৎ এই যে এখানে দুটি প্যাডেল এক ছন্দে বাঁধা—ডান দিকের পায়ে চাপ দিলে, বাঁ দিকে ঢিল দিতে হবে। 'সী-স'র মত আর কি একটি ওঠে তো একটি নামে। আসলে ঐ প্যাডেল দুটি হচ্ছে 'রাডার-বার'-এর দুটি প্রান্ত।

মনে করুন, প্লেনটা জমির সমান্তরালে চলেছে (ক-অবস্থা), এখন আকাশযানকে উপরে ওঠাবার দরকার হলে বৈমানিক

জয়স্টিকটাকে নিজের দিকে টানে। ঐ জয়স্টিকের সঙ্গে তার দিয়ে যুক্ত আছে ল্যাজের এলিভেটার দুটি। জয়স্টিককে পাইলট নিজের দিকে টানলেই এলিভেটার দুটি উঁচুতে উঠে যায় (খ-অবস্থা)। তখন প্লেনের গতিবেগের জন্য বাতাস (গ) ঐ এলিভেটারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্লেনের ল্যাজটাকে নিচের দিকে ঠেলে বাঁকিয়ে দেয় (ঘ)। ল্যাজ নিচের দিকে যাওয়া মানেই মাথা উঁচুর দিকে যাওয়া (ঙ)। ফলে প্লেনটার গতিমুখ একটু উপর দিকে হয়ে যায়, অর্থাৎ প্লেনটা ক্রমশ উপরে উঠতে থাকে। উপরে উঠবার সময় গতিবেগ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। সেটা পাইলটকে খেয়াল রাখতে হয়, এবং এজন্য তৎপর হতে হয়।

অনুরূপভাবে নিচে নামতে হলে পাইলট জয়স্টিকটাকে দূরে ঠেলে দেয়, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি এলিভেটার দুটি নিচের দিকে নেমে যায়। এবার বাতাসের ধাক্কায় লেজটা উপরে ওঠে, অর্থাৎ মুড়োটা নিচের দিকে নামে। এক কথায় প্লেন নিম্নমুখী হয়। এবার একইভাবে পাইলট গতিবেগ কিছু কমিয়ে দেয়।

ডাইনে বা বাঁয়ে বাঁক নেবার সময় পাইলটকে প্রথমেই গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে হবে। তারপর সে এক পায়ের চাপে রাডার বারটিকে একদিকে দাবিয়ে দেয়। এর ফলে তার দিয়ে সংযুক্ত লেজ অংশের রাডারটি একদিকে বেঁকে যায়। বাতাসের চাপে লেজটা উল্টো দিকে বাঁক নেয়, অর্থাৎ প্লেনের মাথাটাও বেঁকে যায়।

তবে নাকি প্লেনটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যাচ্ছে, তাই শুধুমাত্র রাডারকে বাঁকিয়ে ডাইনে অথবা বাঁয়ে মোড় ফেরা চলে না। ব্যাপারটা কেমন জানেন? খুব জোরে সাইকেল চালাবার সময় যদি বাঁক নেওয়া যায় তখন সাইকেল-আরোহী শরীরটাকে হেলিয়ে দেয়। বাঁকের মুখে দেখবেন পাকা রাস্তায় এইভাবে ঢাল দেওয়া থাকে, যাতে দ্রুতগামী মোটরগাড়ি আপনা থেকেই হেলে যায়। আকাশপথে বাঁক নেবার সময় প্লেনটাকেও ঐভাবে হেলানোর দরকার হয়। সেইজন্য দুদিকের দুটি ডানার পিছন দিকের

প্রান্তভাগে আরও পাখনা থাকে। তাকে বলি 'এলিরন'। বৈমানিক বাঁক নেবার সময় পা দিয়ে যখন রাডার বার-এ চাপ দেয় তখন হাত দিয়ে জয়স্টিকটাকে ডাইনে অথবা বাঁয়ে টেনে দেয়। সে যদি জয়স্টিকটাকে বাঁ-দিকে বাঁকায় তখন বাঁ-দিকের ডানার (তার নাম পোর্ট-উইং) এলিরনটি উপরে উঠে যায় এবং ডানদিকের ডানার (স্টার বোর্ড উইং) এলিরনটি নিচে নেমে যায়। ফলে প্লেনটি বাঁয়ে কাত হয়ে যায়। তাতে বাঁ-দিকে মোড় নিতে সুবিধা হয়।

আমরা এতক্ষণ একটি সাধারণ মনোপ্লেনের মৌলিক মডেল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে এ ছাড়া আরও অনেক যন্ত্রপাতি থাকে একটা বাস্তব প্লেন-এ। কিন্তু অতসব জটিলতার মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। মোটকথা দেখা গেল ডাইনে-বাঁয়ে মোড় নিতে আর হেলতে, কিংবা উপর-নিচে উঠতে বা নামতে পাইলটকে দুটি হাত ও দুটি পায়ের কাজ একই সঙ্গে করতে হচ্ছে। এ-ছাড়া তাকে কানে শুনতে হচ্ছে রেডিও-নির্দেশ, চোখে দেখতে হচ্ছে নানান ইণ্ডিকেটারের ঘোষণা, মস্তিষ্ক সজাগ রাখতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে।

এর উপর যদি বলা যায় শূন্যে ডিগবাজি খাও, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? ডিগবাজি খাওয়ার অর্থ এই মুহূর্তে তুমি উঠছ, এই মুহূর্তে তুমি উল্টে যাচ্ছ এবং পর মুহূর্তেই তুমি উল্টো হয়ে নামছ! হাত-পায়ের কেরামতি প্রতিমুহূর্তে বদলাতে হবে, এবং হবে যখন তুমি শির-পা হয়ে উল্টে আছ! ভাবলেই হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকে যায়!

সব মানুষ সাঁতার জানে না, সাঁতার তাকে কষ্ট করে শিখতে হয়। অপরপক্ষে সব পাখিই আকাশে উড়তে পারে—এমু বা উট পাখিদের কথা বাদ দিলে অবশ্য। তবু মানুষ চিৎ-সাঁতার কাটতে পারে, কিন্তু কোন পাখিই আকাশে চিৎ হয়ে উড়তে পারে না। কারণটা কি? পাখিদের দেহের ভারকেন্দ্র শরীরের এত নিচের দিকে যে, আকাশে ওরা চিৎ হতে পারে না। ওদের ডানা ও দেহের গড়ন এমন যে, ওরা শুধু উবুড় হয়েই আকাশে ভাসতে পারে।

এয়ারোপ্লেন বস্তুত বিহঙ্গ বাসনার ফলশ্রুতি। তার দেহের গড়ন পাখির অনুকরণে, পাখির মতই সে উড়তে শিখেছে। তাই এয়ারোপ্লেনের ভারকেন্দ্রও তার দেহের নিচের দিক ঘেঁষা। অসংখ্য বিহঙ্গের মধ্যে গিরিবাজ লক্কা পায়রা যেমন এক ব্যতিক্রম, খণ্ড মুহূর্তের জন্য আকাশে চিৎ হয়ে সে ডিগবাজি খেতে পারে, তেমনি গতিবেগ প্রচণ্ড হলে এবং বৈমানিকের যথেষ্ট দক্ষতা থাকলে সেও আকাশে প্লেনটাকে ডিগবাজি খাওয়াতে পারে। তাকেই বলে "লুপিং দ্য লুপ্' (চিত্র—১০)।

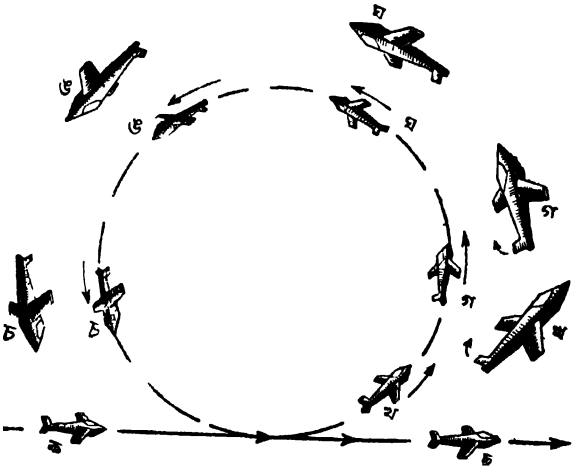

চিত্র—১০

ইদানিং অনেক বৈমানিকই জেট-প্লেন নিয়ে 'লুপিং দ্য লুপ' করেছেন। বস্তুত জেট প্লেনের গতিবেগ এমন প্রচণ্ড যে ব্যাপারটা প্রায় ছেলেখেলা হয়ে পড়েছে আধুনিক বৈমানিকদের কাছে। কিন্তু ভুললে চলবে না—রাশিয়ান পাইলট নেস্‌তেরভ্‌ এ কেরামতি দেখিয়ে ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগে, যখন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিবেগই ছিল মারাত্মক গতি! তাই বলব বৈমানিক 'নেস্‌তেরভ্‌' আকাশজয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম।

আমাদের স্বর্গে ওঠার একটি ধাপ তিনিই প্রথম ডিঙিয়েছিলেন!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে আকাশজয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে ক্যাপ্টেন এ্যালকক আর লেফটানেণ্ট ব্রাউনের 'অতলান্তিক-সাফল্য'।

ওঁরা দুজনেই প্রথম না নেমে অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি' দিয়েছিলেন। সে হিসাবে ওঁরা এ শতাব্দীর যুগ্ম কলম্বাস। ইওরোপকে যুক্ত করলেন আমেরিকার সঙ্গে।

যুদ্ধ বাধার আগেই ১৯১৩ সালে ইংল্যাণ্ডের 'ডেইলী মেল' পত্রিকার সম্পাদক একটি ঘোষণা করেছিলেন: যে বৈমানিক উত্তর আমেরিকা থেকে আকাশপথে না থেমে ইওরোপ ভূখণ্ডে উড়ে আসতে পারবেন তাঁকে দশহাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে।

'না-থেমে' কথাটা বলা হয়েছে এজন্য যে, ইতিমধ্যে 'সী-প্লেন' আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি প্রয়োজনে সমুদ্রে নামতে পারে। ডেইলী মেল-এর সম্পাদকের সর্ত ছিল এ যাত্রাপথে সমুদ্রে নামা চলবে না।

যে-সময়ের কথা তখন এ প্রচেষ্টা এতই অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে যে, পরদিন এক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ব্যঙ্গ করে লিখলেন: ডেইলী মেল-এর সম্পাদক একটু কৃপণ স্বভাবের বলে মনে হচ্ছে! ঐ সাফল্য কেউ লাভ করলে আমি তো তাঁকে নগদ দশ-লক্ষ পাউণ্ড পুরস্কার দিতে রাজী!

কথাটা অসৌজন্যমূলক। বোধ করি ইনি সাংবাদিকতায় শিক্ষা নিয়েছিলেন সেই ফরাসী সাংবাদিকের কাছে, যিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে উইলিয়াম হেনসনকে দেশছাড়া করেছিলেন। ইনি তাঁরই উত্তর-সাধক। তবু এ দুনিয়ায় দুঃসাহসী মানুষের অভাব কোনদিন হয়নি। যতই অসম্ভব বলে মনে হ'ক, এ ঘোষণায় অনেকে নড়ে-চড়ে বসলেন। কার্টিস্ নামে একজন বৈজ্ঞানিক লেগে গেলেন উপযুক্ত যন্ত্রের উদ্ভাবনে। জন পোর্ট নামে একজন আবার ছুটলেন

মার্কিন-মুলুকে, সরেজমিনে সেখানকার এয়ারোড্রোম, আবহাওয়া ইত্যাদির হদিস নিতে। হয়তো কেউ কেউ চেষ্টা করে দেখতেন, কিন্তু সব সম্ভাবনাই আপাতত মুলতুবী রাখতে হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায়।

যুদ্ধ থামল ১৯১৮-র শেষাশেষি। পরের বছর আবার উঠে-পড়ে লাগলেন দুঃসাহসী বৈমানিক আর বৈজ্ঞানিকের দল। 'ডেইলী মেল' পত্রিকার সেই ঘোষণা কিছু তামাদি হয়ে যায়নি। আর তাছাড়া দশহাজার পাউণ্ডের পুরস্কার কিছুই নয়—এ জয়ের সম্মান কি পাউণ্ড দিয়ে মাপা যায়?

আজকের যুগের পাঠককে সেই ১৯১৮-র পরিবেশটা বোঝানো শক্ত। সে আমলের অভিযান কী প্রচণ্ড দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক ছিল সেটা প্রণিধান করতে হলে সে-আমলের অবস্থাটা আর একটু খুঁটিয়ে বুঝতে হবে।

প্রথম কথা, দিনের বেলা সাগর পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। কেন? কারণ রৌদ্রতাপে এঞ্জিন গরম হয়ে উঠবে। 'এয়ার কুলিং সিস্টেম' বা এঞ্জিনের মাথা ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা তখনও করা যায়নি। সুতরাং রাতারাতি সাগর পাড়ি দেওয়া চাই। আবার রাতটা চাঁদনী হওয়া দরকার—যাতে চোখ মেলে সামনের কিছুটা পথ দেখা যায়। ফলে মাসের মধ্যে পাঁচ-ছয়টা রাত এ অভিযানের পক্ষে উপযুক্ত সময়। এদিকে মে-মাস থেকে সেপ্টেম্বর—বছরের এই পাঁচ মাস অতলান্তিকে ঝড়-জল কম হয়। ফলে হিসাবমত বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে বিজ্ঞানের পঞ্জিকায় তিনশ' পঁয়ত্রিশ দিনই হচ্ছে যাত্রা নাস্তি! মঘা-অশ্লেষ্যা-দিকশূল-অগস্ত্যযাত্রা! বছরে মাত্র ত্রিশটি দিন হচ্ছে যাত্রা শুভ!

বৈজ্ঞানিকরা বৈমানিকদের বললেন, শোন বাপু। এ অভিযানে প্রকৃতিগত মূল বাধা হচ্ছে তিনটে। এক নম্বর হচ্ছে বিমানের ডানায় বরফ জমে যাওয়া। দু নম্বর হচ্ছে মেঘের ভিতর বিদ্যুৎ থাকলে রেডিও-যন্ত্র অকেজো হয়ে যেতে পারে, তখন 'বাঁচাও-বাঁচাও' করে

চেঁচালে আশপাশের কোন জাহাজে তা শোনা যাবে না। আর তিন নম্বর বিপদ হচ্ছে 'ব্যারোমেট্রিক-প্রেশার' বা বায়ুচাপের হেঁর-ফের। অতলান্তিকে ঐ ব্যারোমিটার যন্ত্রটা যাচ্ছেতাই পাগলামি শুরু করে মাঝে মাঝে।

ঐ শেষ ব্যাপারটার একটু ব্যাখ্যা দিয়ে রাখা দরকার ঃ

বিমানটা কত উঁচুতে আছে তা বৈমানিক বুঝতে পারে যে যন্ত্রটার সাহায্যে, তাকে বলে 'অল্টিমিটার'। সেটা বস্তুত একটা বায়ুচাপ যন্ত্র বা ব্যারোমিটার। সাধারণ পারদ ব্যারোমিটারের সঙ্গে অল্টিমিটারের পার্থক্য হচ্ছে এইটুকুই—উচ্চতাটা সরাসরি ফুট হিসাবে পড়তে পারা যায়, পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা হিসাবে নয়। দুটি যন্ত্রে আর কোনও মৌল পার্থক্য বস্তুত নেই। প্রতি আধ ইঞ্চি পরিমাণ পারদ-স্তম্ভের হেরফের প্রকৃতপক্ষে প্রায় হাজার ফুট তফাৎ সূচিত করে। কিন্তু অতলান্তিক মহাসমুদ্রের উপর বায়ুর ঘনত্ব এত প্রচণ্ডভাবে কম-বেশি হয় যে, বায়ুচাপ যন্ত্র দেখে সব সময় সঠিক উচ্চতাটা মাপা যায় না। এমন কাণ্ডও হয়েছে যে, অল্টিমিটারে যখন দু হাজার ফুট উচ্চতা সূচিত হচ্ছে বাস্তবে তখন আকাশযান সমুদ্র সমতল থেকে আছে মাত্র দু-তিন শ' ফুট উপরে। যদি সে সময় ঘন কুয়াশায় বৈমানিক সমুদ্রটা দেখতে না পায়, এবং কোন কারণে যদি সে দু-চার শ' ফুট নেমে আসতে চায় তবে তার সলিল-সমাধি অনিবার্য। বলতে পারেন—কী দরকার বাপু নিচে নামার? বরাবর সমুদ্র সমতল থেকে কয়েক হাজার ফুট উপরে থাকলেই হয়। তাতেও মুশ্‌কিল! যত উপরে উঠবে ততই ঠাণ্ডা বাড়বে, ডানার উপর ততই বরফ জমবে। উপর মহলে বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ থাকলে তো আবার সোনায় সোহাগা।

এ্যালকক ব্রাউনের ঐতিহাসিক অভিযানের বছর আষ্টেক পরে লিণ্ডেনবার্গ অতলান্তিক পাড়ি দেবার আর একটি রেকর্ড করেছিলেন —'সোলো ফ্লাইট'। মানে একা উড়ে এসেছিলেন তিনি। নিজেই পাইলট, নিজেই ন্যাভিগেটর। সেই লিণ্ডেনবার্গের প্রচেষ্টাতেই

ক্রমশ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিটি জাহাজ থেকে আবহাওয়া মাপবার যেসব মানদণ্ড বা য়ুনিট আছে সেগুলির সমতা রক্ষা করা হয়, এবং সাঙ্কেতিক কোড-মেসেজ চালু করার আয়োজন হয়।

১৯১৯ সালে এসব ছিল স্বপ্ন কথা।

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেবার সময় যেমন তিনজন প্রতিযোগী এগিয়ে এসেছিলেন, এবার অতলান্তিক পাড়ি দেবার প্রতিযোগিতাতেও দেখা গেল তিনদল অভিযাত্রী নেমেছেন ফাইনাল খেলার আসরে। প্রথম দলে আছেন অস্ট্রেলিয়াবাসী হকার আর তাঁর সহকারী কমাণ্ডার গ্রীভস্। দ্বিতীয় দলের প্রধান কর্মকতা হচ্ছেন আমেরিকান নৌ-বহরের তরফে কার্টিস। আর তৃতীয় দলে এ্যালকক এবং ব্রাউন।

কার্টিসের নাম আগেই বলেছি। বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগে থেকেই তিনি এ নিয়ে তোড়জোড় করছিলেন। তিনি মার্কিন নৌ-বহরের তরফে চারখানি সী-প্লেন বানাতে শুরু করে দিলেন। তার তিনখানি এয়ারশিপ শেষ পর্যন্ত উড়ল। প্রথমটি অল্প পরেই ফিরে গেল। দ্বিতীয়টি মাঝ-সমুদ্র থেকে আমেরিকায় ফিরে যেতে বাধ্য হল। একমাত্র তৃতীয়টি সমুদ্রবক্ষে থামতে থামতে শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে এসে হাজির হল। মাঝ-সমুদ্রে তাকে তেল দিয়ে সাহায্য করতে, মেরামত করতে মার্কিন জাহাজ হাজির ছিল আগে থেকেই। অতলান্তিক সমুদ্র অতিক্রান্ত হল বটে, কিন্তু ডেইলি মেল পত্রিকার যে সর্ত ছিল —না থেমে সাগর পাড়ি দেওয়া, তা পূর্ণ হল না। সুতরাং কার্টিসকে এ প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী বলাটা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় অভিযাত্রীদল—অস্ট্রেলিয়াবাসী হকার আর কমাণ্ডার গ্রীভস্ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে এসে পৌঁছলেন ২৮শে মার্চ। হকার হচ্ছেন পাইলট আর সহকারী গ্রীভস্ তাঁর ন্যাভিগেটার। অর্থাৎ হকার প্লেনটাকে চালাবেন গ্রীভস্-এর নির্দেশে। অঙ্ক কষে বিমানের অবস্থান আর গতিমুখ নির্ধারণ করবেন ন্যাভিগেটার। ওঁদের

বিমানের নাম এ্যাট্‌লান্টিক' ; সাড়ে তিন শ' অশ্বশক্তির একটি শক্তি-শালী রোলস্-রয়েস্ এঞ্জিন তাতে সংযুক্ত। ওজন প্রায় তিন টন—সাড়ে তিন শ' গ্যালন পেট্রোলের ওজন সমেত। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে লণ্ডনের দূরত্ব প্রায় আঠার শ' কি উনিশ শ' মাইল—সময় লাগা উচিত ঘণ্টা কুড়ি-বাইশ। হকার আর গ্রীভস্-কে বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন এ পথ অতিক্রম করতে সাড়ে তিন শ' গ্যালন পেট্রোলই যথেষ্ট। আমেরিকায় পাড়ি জমাবার আগে পরীক্ষামূলকভাবে ওঁরা একবার আঠার শ' মাইল পথ উড়ে দেখেছেন—হিসেবটা ঠিকই আছে।

ওঁদের ইচ্ছা ছিল ১৬ই এপ্রিল রওনা দেবার। সে দিনটা ছিল পূর্ণিমা ; কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। মার্কিন নৌ-বহরের প্রচেষ্টায় কার্টিস্‌ের এয়ারশিপগুলি রওনা হয়েছিল ৬ই মে। হকার আর গ্রীভস্ রওনা হলেন ১৮ই মে বিকাল সওয়া তিনটায়।

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য ওঁদের, মাত্র দশ মিনিটের ভিতরেই বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন ওঁরা। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের তটরেখা সবে মিলিয়ে গেছে এমন সময় প্লেনটা প্রবেশ করল এক নিশ্ছিদ্র কুয়াশালোকে। তার উপর প্রচণ্ড উত্তুরে হাওয়া আর বৃষ্টি ! পরবর্তী পুরো চারঘণ্টা অন্ধের মত বিমানটাকে চালিয়েছিলেন হকার—না আকাশ, না সমুদ্র, কিছুই নজরে পড়েনি ওঁদের।

ইতিমধ্যে হিসাবমত ওঁরা সমুদ্রের ভিতর শ'-পাঁচেক মাইল চলে এসেছেন। বজ্র-বিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড ঝড়ের ভিতর হকার আবিষ্কার করলেন এত বৃষ্টির মধ্যেও তাঁর রেডিয়েটারটা এঞ্জিনকে ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না। এঞ্জিনের উত্তাপ ক্রমশই বাড়ছে। সেটাকে ঠাণ্ডা করতে না পারলে সমূহ বিপদ ! সহযাত্রী গ্রীভস্‌কে ব্যাপারটা বললেন। ন্যাভিগেটার গ্রীভস্ অঙ্ক কষে বললেন, প্লেনটা বর্তমানে যেখানে আছে সেখান দিয়ে কোন জাহাজ যাতায়াত করে না। অর্থাৎ সমুদ্রে দু-দশদিন ভেসে থাকলেও কেউ উদ্ধার করতে আসবে না। প্রাঞ্জল ভাষা, প্রাণ জল করা !

প্লেনটা তখন উড়ছিল সমুদ্রতল থেকে দশ হাজার ফুট উপরে। হকার এঞ্জিনটা বন্ধ করে দিলেন—একটু ঠাণ্ডা হোক সেটা—সবেগে প্লেনটা নেমে এল সমুদ্রের দিকে। ঘন কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অল্টিমিটারের নির্ভুল নির্দেশই একমাত্র ভরসা। চার-পাঁচ হাজার ফুট নেমে আসার পর আর সাহস হল না হকারের। দিলেন এঞ্জিনের সুইচ টিপে। কী আশ্চর্য! এঞ্জিনটা চালু হল না। সমানবেগে সেটা নামতেই থাকে সমুদ্রের দিকে!

দুজনে পরস্পরের দিকে তাকালেন। বুঝলেন—মৃত্যু আসন্ন! কিছু করার নেই!

কয়েকটি খণ্ডমুহূর্তের অনিবার্য অধঃপতন! তারপর কী খেয়াল হল আকাশযানের—হঠাৎ আপনা থেকেই চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র কয়েক শ' ফুট উপরে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিয়ে যেন যন্ত্রটা খেলা করছে। কোনক্রমে আবার বিমানের নাকটা খাড়া করলেন হকার। আবার চলতে থাকেন সামনের দিকে।

যাত্রা করার নয় ঘণ্টা পরে আবার আকাশ দেখা গেল। আকাশের তারার অবস্থান দেখে গ্রীভস্ হিসাব করে বললেন, অর্ধেক পথও এখনও অতিক্রম করিনি আমরা, অথচ বাতাসের ঠেলায় চিহ্নিত গতিপথ থেকে প্রায় দেড় শ' মাইল পথ দক্ষিণে সরে গেছি।

হকার জবাবে শুধু বললেন, এদিকে আমার অর্ধেক পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে। আর রেডিয়েটারের জলটায় কফি বানানো চলে।

অভিযান যে ব্যর্থ হয়ে গেছে একথা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন একমাত্র প্রশ্ন, দুজনে জীবিত অবস্থায় সভ্যজগতে আবার ফিরে আসতে পারবেন কিনা। হকার ভাবছিলেন তাঁর স্ত্রীর কথা। বেচারি তাহলে কোনদিন জানতেও পারবে না তাঁর শেষ মুহূর্তগুলি কেমন ছিল! রেডিয়েটার যদি ঠিকও হয়ে যায়, বাকি পথ যদি কুয়াশামুক্ত পরিষ্কারও থাকে তবু অবশিষ্ট পেট্রোলটুকু

নিয়ে তিনি কোনদিনই কোন মাটিতে অবতরণ করতে পারবেন না। কাছে পিঠে কোন দ্বীপও নেই যেখানে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল হকার-এর!

ওঁরা যাত্রা করেছিলেন আঠারই মে; তারপর চার-পাঁচদিন কেটে গেছে। ঐ দুঃসাহসিক বৈমানিক দুজনের কোন খবর কেউ পায়নি। তাঁদের অনিবার্য পরিণামের বিষয়ে আর কারও কোন সন্দেহ রইল না। মিসেস্ হকার প্রতিদিন সংবাদপত্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন, বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে ক্রমাগত টেলিফোন করেন; কিন্তু কেউ কোন সংবাদ দিতে পারে না। পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হলে সবাই আশা ছেড়ে দিল। পাঁচ দিন ওঁরা সমুদ্রে ভেসে বেঁচে থাকতে পারেন না। সেদিনই মিসেস্ হকার একটি টেলিগ্রাফ পেলেন। হঠাৎ টেলিগ্রাফ পিয়নকে কলিংবেল বাজাতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন মিসেস্ হকার। এতদিনে তাহলে ওরা সংবাদ পেয়েছে নিশ্চয়। আঙুলগুলো তাঁর থরথর করে কাঁপছিল। কোনক্রমে খামটা খুলে দেখেন টেলিগ্রাফের প্রেরক ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং পঞ্চম জর্জ:

"আপনার নির্ভীক স্বামীর অনিবার্য পরিণাম সম্বন্ধে আর বোধকরি সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। আপনার এই মর্মান্তিক দুঃখের দিনে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী আপনাকে সমবেদনা জানাচ্ছেন। আমরা দুজনেই বিশ্বাস করি এমন একজন দুঃসাহসী বৈমানিককে হারিয়ে ব্রিটিশজাতি আজ ক্ষতিগ্রস্ত।"

তারবার্তাটা হাতে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মিসেস্ হকার।

তার দুদিন পরে। রবিবার পঁচিশে মে।

'মেরী' নামে একটি জাহাজ স্কটল্যাণ্ডের লিউইস্-বন্দরে ভিড়বার চেষ্টা করছে। দূর থেকেই বন্দরের ফ্ল্যাগম্যান লক্ষ্য করে দেখে আগন্তুক জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে একজন পতাকাধারী নিশান নেড়ে সাঙ্কেতিক ভাষায় কি যেন বলছে। কী বলছে ও?

ও বলছে: আমরা বন্দরে ভিড়ব না। জাহাজ থেকে দুজন

জলমগ্ন ইংরাজকে তোমরা নিয়ে যাও। তাদের মাঝ-সমুদ্রে আমরা উদ্ধার করেছি।

তটরক্ষী নিশান নেড়ে প্রশ্ন করে : ওঁদের দুজনের নাম কি ?

: হকার আর গ্রীভস্ !

নিতান্ত ভাগ্যক্রমে একটি জাহাজ ওঁদের দেখতে পেয়ে উঠিয়ে নিয়েছে। ওঁদের প্লেন তলিয়ে গেছে সমুদ্রের অতলে, লাইফ বেল্ট-এর সাহায্যে ভাসছিলেন ওঁরা।

ইতিমধ্যে আর একদল অভিযাত্রী এসে হাজির হয়েছে মার্কিন ভূখণ্ডে। তাঁদের উড়োজাহাজের নাম 'ভিমি'। ভাইকার্স লিমিটেডের তৈরি বাইপ্লেন, রোলস্-রয়েস্ এঞ্জিনযুক্ত। পাইলট বা বিমানচালক হচ্ছেন ক্যাপ্টেন এ্যালকক। সাতাশ বছরের তরুণ। জন্ম ম্যাঞ্চেস্টারে। বিশ বছর বয়স হবার আগেই ব্রুকল্যাণ্ডস্ থেকে 'রয়্যাল এয়ারো ক্লাব'-এর সার্টিফিকেট পেয়েছে। বাইশ বছর বয়েসে লণ্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টার উড়ে যাবার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। যুদ্ধ শুরু হবার পর সে ব্রিটিশ বিমানবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। কিছুদিন বিমান-শিক্ষকের কাজও করে। পরে তাকে তুরস্ক-ফ্রণ্টে পাঠানো হয়। সেখানে বেশ কিছুদিন সে বোমারু-বিমান চালিয়ে সুনাম অর্জন করে। তারপর একদিন শত্রুহস্তে বন্দী হয়। যুদ্ধান্তে ফিরে আসে দেশে। সাতাশ বছর বয়সের তরুণ ক্যাপ্টেন এ্যালককের উৎসাহ উদ্দাম।

তার ন্যাভিগেটার হয়ে এই দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিতে এসেছে লেঃ ব্রাউন। ওর চেয়ে বছর ছয়েকের বড়। জন্ম গ্লাসগোয় ; সেও যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিল। লড়াই করেছে সুইজারল্যাণ্ড অঞ্চলে।

ওরা দুজনে ভিমি জাহাজে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে রওনা দিল শনিবার, চোদ্দই জুন। বিকাল ঠিক পাঁচটা তের মিনিটে। অর্থাৎ হকার আর গ্রীভস্-এর অলৌকিক উপায়ে উদ্ধার পাবার দিন কুড়ি পরে। ওদের বিমানটার ওজন প্রায় পাঁচ টন। তার ভিতর পেট্রোলের ওজনই প্রায় সাড়ে তিন টন। এবারেও বিমানক্ষেত্রে

অনেকে এসেছিল ওদের বিদায় জানাতে। তাদের শুভেচ্ছা পাথেয় করে রওনা দিল ওরা দুজন।

যাত্রা-মুহূর্তে কুয়াশার লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু আধঘণ্টা পরেই যথারীতি ঘন কুয়াশায় আদিগন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ঠিক তখনই এ্যালকক আবিষ্কার করল প্রপেলারের সংযুক্ত আর্মেচার-এর তারটা গেছে ছিঁড়ে। তার মানে, প্রপেলারের ঘূর্ণনের সঙ্গে আর বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে না ; তার অর্থ—বেতার-যন্ত্রটা অকেজো হয়ে গেল! এবং তার নির্গলিতার্থ ঃ বিপদে পড়লে 'এস.ও.এস.' সঙ্কেত পাঠানোর সম্ভাবনা রইল না। হকার যেমন বিপদে পড়ে বেতারে চতুর্দিকে খবর পাঠিয়েছিলেন—

কিন্তু নাঃ! ও-সব অলুক্ষণে কথা এখনই কেন ভাবছে এ্যালকক! সে প্রয়োজন ওর হবেই না নিশ্চয়।

পুরো সাতঘণ্টা ধরে ঘন কুয়াশা ভেদ করে অজানা লক্ষ্যের দিকে উড়ে চলেছে এ্যালকক। ব্রাউনের ইঙ্গিত অনুসারে। প্লেনের ডানায় পুঞ্জ পুঞ্জ তুষার জমে যাচ্ছে। ব্রাউন মাঝে মাঝে তার অঙ্ক কষা বন্ধ রেখে লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঐ তুষারপুঞ্জ হটিয়ে দিচ্ছে প্লেনের উপর থেকে। তারপরেই ওরা এসে পড়ল এক তুষার-ঝঞ্ঝার ভিতর। ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত বিমানটাকে নিয়ে লোফালুফি শুরু করলেন পবনদেব।

ক্রমে ঝড় থামল। তারপর পুব-আকাশ লালে-লাল করে সূর্য উঠল। সিধে পুব-মুখোই উড়ে আসছিলেন ওঁরা যেন সূর্যোদয়ের দিকেই। আরও ঘণ্টা তিনেক পরে এ্যালককের নজরে পড়ল সমুদ্রের শেষপ্রান্তে তটরেখার আভাস!

ঃ ওটা কোন্ দেশ?—প্রশ্ন করে এ্যালকক।

ঃ মনে হচ্ছে ইংল্যাণ্ড, কিংবা আয়ারল্যাণ্ড। মোটকথা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ!

মিনিট পনেরর মধ্যেই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার অবসানে ওরা এসে পড়ল স্থল-ভূভাগে। আঃ, কী আনন্দ! নিচে আর তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ

সমুদ্র নয়—ছোট ছোট ঘর, শস্যক্ষেত্র, খামার, নদী-পাহাড় গাছ-পালা।

প্লেন নামার উপযুক্ত এয়ারোড্রোম কোথায় আছে সে জানে। সমুদ্রোপকূলে বড় বড় পাথর—বিস্তীর্ণ বালুকাময় তটরেখা নয়। একটা বড় খেলার মাঠ গোছের কিছু পাওয়া যায় না? ঐ তো একটা সবুজ মাঠ। প্রকাণ্ড ময়দান! ওতেই নামতে হবে! নামলও। কিন্তু আসলে সেটা মাঠ নয়, শেওলায় ভরা একটা জলাভূমি!

প্লেনের পেট পর্যন্ত ডুবে গেল জল-কাদায়। প্রপেলারের পাখা জল-কাদায় চরকিবাজি খেয়ে যখন থামল তখন দুজনেই ভূত! প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে থামল আকাশযান।

দৌড়ে এল গাঁয়ের লোক। কর্দমাক্ত আগন্তুকদের বললে, কে তোমরা? আসছ কোথা থেকে?

: আমরা আসছি আমেরিকা থেকে। অতলান্তিক সাগর পাড়ি দিয়ে।

ধমকে ওঠে গাঁয়ের মোড়ল, ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি!

কিন্তু অচিরেই প্রমাণিত হল ওরা মিথ্যাবাদী নয়। সত্যই সারারাত্রে সাগর পাড়ি দিয়ে এইমাত্র এসে পৌঁচেছে ইউরোপ খণ্ডে। তখন শুরু হল হৈ-চৈ। দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এল লোকজন, সাংবাদিকের দল!

সম্রাট পঞ্চম জর্জ রবিবার গীর্জা থেকে ফেরার পথে সংবাদটা শুনলেন। তৎক্ষণাৎ অভিনন্দন-টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে দিলেন ঐ দুই দুঃসাহসী বৈমানিকের উদ্দেশে। পরে দুজনকেই 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তরুণ বৈমানিক স্যার এ্যালকক এক বছরের ভিতরেই একটি বিমান-দুর্ঘটনায় মারা যান। ওঁদের দুজনের সম্মানার্থে লণ্ডন বিমান-বন্দরে একটি যৌথ প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ট্র্যান্স-এ্যাটলান্টিক বিমানযাত্রীরা

টার্মিনাল বিল্ডিং-এ আসার পথে ঐ যুগল-মূর্তির নিচ দিয়ে আসেন।

স্যার এ্যালকক এবং স্যার ব্রাউন এ্যাভিয়েশান ইতিহাসে এক যুগল দিকচিহ্ন।

অতলান্তিক বিজয় সম্ভবপর হবার পরেই মানুষের সাহস গেল বেড়ে। যে বছর ঐ দুজন দুঃসাহসী না-থেমে অতলান্তিক পাড়ি দিলেন, সেই বছরেই ত্রিশজন যাত্রী নিয়ে ব্রিটিশ এয়ারশিপ R_{34} স্কটল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করে নিউইয়র্কে পৌঁছায় এবং ফিরে আসে।

মনে রাখতে হবে R_{34} ছিল এয়ারশিপ ; সে একটানা ওড়েনি।

১৯২৬-এ কমাণ্ডার বায়ার্ড এবং পাইলট বেনেট উত্তরমেরুর উপর দিয়ে উড়ে আসেন। তার পরের বছর কর্ণেল চার্লস্ লিণ্ডেন-বার্গ একা একটি বিমান নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে প্যারীতে উড়ে এসে একটি বিশ্বরেকর্ড করলেন। তিনি কোন ন্যাভিগেটার তাঁর সহকারী হিসাবে নেননি। উড়ে এসেছেন একেবারে নিছক একা। দুবছর পরে জার্মান এয়ারশিপ 'গ্রাফ জ্যাপেলিন' পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসে। দুনিয়া ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক 'স্নিডার-ট্রফি' চালু হয়েছে—কে কত জোরে উড়তে পারে তার প্রতিযোগিতা। প্রায় প্রতি বছরই নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে। জোরে, আরও জোরে উড়তে শিখছে মানুষ। হয়তো অচিরে শব্দের গতিবেগকে সে ছাপিয়ে যাবে। আসলে অবশ্য সেই শব্দভেদী গতি লাভ করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে গেল—যাকে বলে 'সুপারসনিক স্পীড'। তবু গতির ক্ষেত্রে অগ্রগতিটা যে-হারে বেড়েছে তা বিস্ময়কর। পর-পৃষ্ঠার তালিকাটি থেকেই সে বিষয়ে ধারণা করা যাবে :

সাল	পাইলট অথবা [এঞ্জিনের] নাম	গতিবেগ মাইল ঘণ্টা
১৯০৬	সান্তাস ডুমা	২৫·৬৬
১৯০৮	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়	৪০
১৯০৯	[নোম রোটারি]	৫০
১৯১৪	[S E.$_4$]	১৩৫
১৯১৮	[ফকার ভি VII]	১৮৫
১৯২৭	ফ্লাইট লেঃ ওয়েবস্টার	২৮১·৬৬
১৯২৯	ফ্লাইং অঃ ওয়াগহর্ণ	৩২৮·৬৪
১৯৩১	ঐ বুথাম	৩৪০·০৮
ঐ	ঐ স্টেইনফোর্থ	৪০৬·৯৯
১৯৩৪	লেঃ এ্যাগেলো	৪৪০·৬৮

শুধু গতির ক্ষেত্রেই নয়, মাটির বন্ধন কাটিয়ে উপরে ওঠার দিকেও দুরন্ত অগ্রগতি হয়েছে। গতিবেগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল শব্দ-তরঙ্গের গতিকে হারিয়ে দেওয়া। সুপারসনিক জেট-বিমানের ক্ষেত্রে মানুষ সে বাধা অতিক্রম করেছে। উপরে ওঠার ক্ষেত্রে মানুষ টার্গেট করেছিল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সীমা ছাড়িয়ে ওঠার। তার মানে এ নয় যে, সেখানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাজ করবে না ;—তার

মানে এই যে, সেখান থেকে পৃথিবীর টানে সে ফিরে আসবে না। নিজস্ব আদি গতির ফলশ্রুতি হিসাবে সে উপগ্রহের মত পৃথিবীকে শাশ্বতকাল প্রদক্ষিণ করে চলবে। সেই বাধাও মানুষ ক্রমে অতিক্রম করল।

এইসব দেখে বলা যায় মানুষ আকাশজয় সুসম্পন্ন করেছে। বস্তুত আকাশজয় শেষ করে এবার সে চলেছে মহাকাশ জয় করতে। চাঁদে পৌঁছে গেছে মানুষ, মঙ্গল গ্রহ প্রদক্ষিণ করেছে মানুষের তৈরি রকেট। কিন্তু সেসব কথা আমি বলব না। আমার আকাশজয়ের কাহিনী বস্তুত শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিতরেই। কারণ যে পরশপাথর খুঁজতে বের হয়েছিলাম তার সন্ধান আমি পেয়ে গেছি ঐ যুদ্ধের আমলেই—কয়েকজন বৈমানিকের ডায়েরিতে। সেই কথা বলেই শেষ করব আমার বক্তব্য।

কি বললেন? এখানে থামলে আমার আকাশজয়ের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? মাপ করবেন, আপনি ভুলে গেছেন—সে-কথা শোনাবার জন্য আমি কিছু বায়না নিয়ে কলম ধরিনি। আমার মূল প্রশ্ন ছিলঃ কেন ঐ ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম? কেন এই বিহঙ্গ বাসনা?

সেই স্বপ্নমঙ্গলের হিংটিংছটের সমাধান আমি খুজে পেয়েছি বিগত বিশ্বযুদ্ধের তিনজন বৈমানিকের কাছে--ইংরাজ পাইলট দুঃসাহসিক ক্যাপ্টেন হিলারীর দিন-পঞ্জিকায়, জার্মান বৈমানিক হুর্নিবার ওয়েরার গ্রন্থে আর জাপানী এ্যাডমিরাল স্থিতপ্রজ্ঞ ওনিশির তানাকায়।

মহাকাশ জয়ের তথ্য সংগ্রহ করবার বাসনা যদি আপনার হয়ে থাকে, তবে দয়া করে কোন গ্রন্থাগারে গিয়ে ঐ বিষয়ে বইয়ের অনুসন্ধান করুন। এ যুগ হুজুগের। অনেক অনেক বই ও বিষয়ে লেখা হয়েছে দেখতে পাবেন। আমার সে-বিষয়ে কোন কৌতূহল নেই। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পার্শ্ববর্তী দর্শকের মত আমিও বরং ভাবিঃ চাঁদে পৌঁছে কোন্ চতুর্বর্গ লাভ হবে?

যাঁরা আমাকে এখনও ত্যাগ করেননি সেই পাঠকবর্গকে নিয়ে আমি বরং ঝাঁপিয়ে পড়ি যুদ্ধের আবর্তে। দেখি জানা যায় কিনা —কেন মানুষ উড়তে চেয়েছিল! কী আছে এই বিহঙ্গ বাসনার মর্মমূলে!

সেপ্টেম্বর, ১৯৪০।

লণ্ডন হাসপাতাল সংলগ্ন কনভালেসন্স কটেজে বসে ডায়েরী লিখছে ফ্লাইট ক্যাপ্টেন রিচার্ড হিলারী। মৃত্যুর মুখ থেকে সদ্য ফিরে এসেছে সে। এখন তার ছুটি। এত গুরুতরভাবে সে আহত হয়েছিল যে, আদৌ আর কাজে যোগ না দিতেও পারে। লণ্ডনের অবস্থা সেই শরৎকালে অত্যন্ত ভয়াবহ। লণ্ডনবাসী আবহমান-কাল সেপ্টেম্বরে বসে ভাবে শত্রু আসতে আর মাস তিনেক। শীত কালের চেয়ে ওদের বড় শত্রু নেই। সে বছর লণ্ডন তা ভাবছে না, ভাবছে, শত্রু আসতে পারে যে কোন দিন—তার ব্লিৎসকির্গ ট্যাক্টের বহর নিয়ে।

ঠিক এক বছর আগে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এখনও ঘর সামলে উঠতে পারেনি গ্রেট-ব্রিটেন। পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। মাত্র মাস চারেক আগে ডানকার্ক থেকে প্রাণটুকু হাতে এবং লেজটুকু তলপেটে গুটিয়ে ব্রিটিশ-সিংহ ফিরে এসেছে স্বদেশে। 'লঙ্গেস্ট ডে' তখনও সুদূর স্বপ্ন কথা। প্রতি রাত্রে জার্মান বোমারু-বিমান ব্রিটিশ দ্বীপ-পুঞ্জের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চালিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসলীলা। জার্মানদের বিমানের সংখ্যাধিক্য, তাদের উন্নতধরনের মারণাস্ত্রের তুলনায় গ্রেট-ব্রিটেন প্রায় নিধিরাম সর্দার। তখন তাদের একমাত্র ভরসা সাধারণ মানুষের একটা অনমনীয় দৃঢ়তা—টম-ডিক-হ্যারীর মিলিত মনের জোর।

টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় টেবিলে বসে আহত বৈমানিক হিলারী তার আত্মজীবনী লিখছে:

আমি অক্সফোর্ডে পড়েছি মাত্র দু বছর—না, পড়েছি বলা বোধহয় ঠিক সত্যভাষণ হল না ; নামটা খালি লেখা ছিল কলেজের খাতায়। পড়েছি যতটা তার চেয়ে আড্ডা মেরেছি, তাস খেলেছি এবং নৌকা বেয়েছি বেশি। আমি ছিলাম সে আমলের এক জাঁদরেল বাইচওয়ালা। আমি একা নই, আমরা ক-জনই। মানে আমাদের ক্লাসের কয়জন। কী খেয়াল হয়েছিল—কলেজে ভর্তি হয়েই নাম লিখিয়েছিলাম একটা ফ্লাইং ক্লাবে। সপ্তাহে একদিন সেখানে হাজিরা দিতাম। ফ্লাইং ক্লাস করতাম, যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতাম। উড়তাম—তবে একা নয়, ট্রেনারের সঙ্গে।

যুদ্ধ শুরু হয়েছে গত বছর তেসরা সেপ্টেম্বর। ঠিক এক বছর আগে। সেই সময় কলেজে লঙ ভেকেশন হয়েছে। আমি ছিলাম বাড়িতে, মায়ের কাছে। আমি মায়ের বড় আদরের—ছুটিছাটায় বাড়িতে এলে মা আর আমায় ছাড়তে চায় না। ভাবে, আমি বুঝি আজও তার কোলপোঁছা ন্যাওটা বাচ্চাটাই আছি। আমার মায়ের রান্নার হাতটা বড় ভাল। সূপ, রোস্ট, হুইস্কড ক্রীম আর পাম-পুডিং যা বানায়,—না থাক। ওসব কথা বলে লাভ নেই। একুশ বছর বয়সের সব পেটুক ছেলেই ভাবে আমার মা-ই দুনিয়ার সেরা রাঁধুনী। যেমন সব মায়েই ভাবে তার একুশ বছরের ছেলেটা সবচেয়ে সুন্দর।

এখানে একটা কথা বলি। নিজমুখেই বলতে হচ্ছে। আমি দেখতে সত্যিই সুন্দর ছিলাম। শুধু মা নয়, অনেক সহপাঠী এবং সহপাঠিনী সেকথা আমাকে জানিয়েছে - কেউ ঈর্ষা-মিশ্রিত স্বীকারোক্তিতে, কেউ বা অনুরাগ মেশানো ভাবালুতায়। শুনে শুনে কেমন যেন 'নার্সিশাস-কম্‌প্লেক্স'-এ পেয়ে বসেছিল আমাকে। কোন বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনুরাগঘন হয়ে ওঠেনি ; আমি বরং আয়নার ভিতর নিজ প্রতিবিম্বটারই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।

মা চাইত ছুটি হলেই আমি বাড়ি যাই ; কিন্তু আমার ইচ্ছে ছুটিছাটায় একটু দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখা। ছোট ছোট ছুটিতে

বাড়িতে গিয়ে মাকে খুশি করে আসতাম, আর বড় ছুটিগুলো কাটাতে যেতাম কন্টিনেন্টে—ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে কিংবা হল্যাণ্ডে।

যুদ্ধ বাধার আগের বছরের কথা বলছি। আমার বয়স তখন একুশ পূর্ণ হয়নি। কুড়ি বছর কয়েক মাস। আমরা, রোইং ক্লাবের ক-বন্ধু স্থির করলাম এ বছর লঙ-ভেকেশানে জার্মানী দেশটা দেখে আসতে হবে। কিন্তু সে যে অনেক টাকার ধাক্কা! আমরা সকলেই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, পকেট-মানি সীমিত। বুদ্ধি বাতলালো আমাদের রোইং-ক্লাবের ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌গ্রেগরী। একে আইরীশ, তায় জু। এসব বিষয়ে তার ক্ষুরধার বুদ্ধি। বললে, ছ্যাঁখ না, কেমন কায়দা করি!

লঙ-ভেকেশানে জার্মানীতে বাইচ প্রতিযোগিতা হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাপার। ম্যাক সবাসরি চিঠি লিখল জার্মান সরকারকে; লিখল আমরা ক-জন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাই,—অক্সফোর্ডের অফিসিয়াল টিম হিসাবে নয়, বেসরকারী ভাবে; আমাদের নামও দলভুক্ত করুন। তবে আমরা সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, যাতায়াতের ভাড়া জমিয়ে উঠতে পারলেই আমরা যাব, নচেৎ নয়।

বললে, এ্যাইসা টোপ ফেলেছি, দেখিস কপাৎ করে গিলে ফেলবে।

আমি বলি, টোপটাই বা কিসের? আর খাবেই বা কে, কেন?

ঃ দেখছিস না, জার্মান সরকারের এখন কী রবরবা! ওরা আমাদের নিমন্ত্রণ করবে।

বিশ্বাস হয়নি আমাদের, কিন্তু ম্যাক-এর অনুমানই ঠিক। জার্মান সরকার তৎক্ষণাৎ জানালেন ঃ হে অর্বাচীন ইংরাজ ছোকরার দল! তোমাদের নাম আমরা প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। খরচের জন্য চিন্তা নেই, সব খরচ-খরচা আমাদের। তোমরা এস, এবং হেরে ভূত হয়ে বাড়ি ফের।

ঠিক ও-ভাষায় অবশ্য তাঁরা লেখেননি, লিখেছিলেন খুব মোলায়েম করে। আমরাও যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে ধন্যবাদসহ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং ১৯৩৮-এর ৩রা জুলাই আমরা রওনা দিলাম জার্মানীমুখো।

প্রতিযোগিতাটি নেহাৎই উপলক্ষ্য, আমরা যাচ্ছি দেশ দেখতে। হৈ-চৈ করতে। গিয়ে উপস্থিত হলাম বাড-এমস্-এ। সেখানেই বাইচ-প্রতিযোগিতার আয়োজন। অন্যান্য প্রতিযোগীর দল যে-যার নৌকা নিয়ে এসেছে। আমরা ক-জনই শুধু নিধিরাম সর্দার। কর্তৃপক্ষ মুখ টিপে হাসলেন, তৎক্ষণাৎ কয়েকটি নৌকা আমাদের দেখানো হল। ওর ভিতর একটা পছন্দ হল আমাদের। ম্যাক যথোচিত গাম্ভীর্যে প্রশ্ন করল : কত ভাড়া দিতে হবে?

কর্তাব্যক্তিটি বললেন, ভাড়া কিসের? আপনারা তো আমাদের অতিথি!

শোনা গেল—আমাদের প্রতিপক্ষ দল হচ্ছে গত বছরের চাম্পিয়ান দলের অন্যতম। অর্থাৎ সুপার লীগে গত বছর যে চারটি দল অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্যে একটি। তারা এল ঝক্‌ঝকে পোশাক পরে আর তাদের সঙ্গে গাড়ির পরে গাড়িতে চেপে সমর্থকের দল। বিদেশে আমরা সমর্থক পাব কোথায়?

প্রতিযোগিতা শুরু হবার ঠিক আগে ওদের দলের এক দশাসই মস্তান এগিয়ে এল আমাদের সঙ্গে ভাব জমাতে। যথোচিত বিনয় ও সৌজন্যের সঙ্গে বললে, আপনারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় আমরা ভারি খুশি হয়েছি। এতে জার্মান ছেলেদের একটা নৈতিক শিক্ষা হবে। অপ্রস্তুত অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাইচ-প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার দুর্বুদ্ধি জন্মালে কী জাতের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় তা তারা অস্থিতে অস্থিতে সম্‌ঝে নেবে!

অধ্যাপকসুলভ এমন গাম্ভীর্য নিয়ে সে কথা ক'টা বলল যে, জুৎসই জবাব আমরা খুঁজে পেলাম না। মায় তুখোড়-শিরোমণি ম্যাক পর্যন্ত থ!

পিছন ফিরে তাকিয়ে আজ মনে হচ্ছে ঐ বাইচ-প্রতিযোগিতাটি যেন এই ইঙ্গ-জার্মান যুদ্ধের এক চুম্বকসার প্রতীক। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অকিঞ্চিৎ, নিয়মিত অভ্যাসের অভাব। বস্তুত আমাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশ বেড়ানো—পাকেচক্রে নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন বাইচের লড়াইয়ে নেমে পড়তে হয়েছে। অপরপক্ষে, ওদের প্রস্তুতি ছিল দীর্ঘ সময়ব্যাপী, শিক্ষাপদ্ধতি নিখুঁত, আত্মবিশ্বাস দৃঢ়—সাজ-পোশাক থেকে নৌকার রঙ পর্যন্ত সব কিছু ত্রুটিহীন। প্রতিযোগিতা শুরু হতেই আমরা পিছিয়ে পড়লাম। ক্রমাগতই আমরা পিছিয়ে পড়ছি। দু-পারের রাস্তা ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে জার্মান ছেলেমেয়ের দল আমাদের নাগাড়ে হুয়ো দিয়ে চলেছে। তবু আমাদের চেতনা হয়নি। তারপর ঘটল একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। হ্যাঁ, দুর্ঘটনা বই কি!

প্রতিযোগিতার মাঝামাঝি আমাদের যাত্রাপথ ছিল একটা কংক্রিটের সাঁকোর নিচ দিয়ে। ঐ সাঁকোটার উপর তিল-ধারণের ঠাঁই নেই। সেটার কাছাকাছি যখন এলাম তখন আমাদের প্রতিপক্ষ দল পাক্কা পাঁচ লেংথে আমাদের পিছনে ফেলে গেছে। নদীপথটা এখানে সোজা। ওরা যখন সাঁকোর নিচ দিয়ে গলে গেল তখন ওদের সমর্থকের দল উপর থেকে পুষ্পবৃষ্টি করল, সোৎসাহে চীৎকার করে উঠল। তার আধ মিনিট পরে আমরা পৌঁছাতেই ওরা সমস্বরে হুয়ো দিয়ে উঠল। তাতেও আমাদের চেতনা হয়নি, এমনটা তো সারা পথেই হচ্ছে। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ব্রীজের উপর থেকে মোটামত একটা জার্মান ছোকরা একদলা থুথু ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে। সেটা গিয়ে লাগল ম্যাকের বুকে! ম্যাকগ্রেগরী আমাদের ক্যাপ্টেন এবং কক্‌সোয়েন —অর্থাৎ আমাদের বিপরীত মুখে হাল ধরে বসে আছে সে। মুখটা লাল হয়ে উঠল ইহুদীর বাচ্চার। বব্ হাত বাড়িয়ে ওর জামা থেকে থুথুর দলাটা মুছে দিতে গেল। হুঙ্কার দিয়ে উঠল ম্যাক: খবর্দার! ওটা ওভাবে মুছে দেওয়া যায় না। পারিস তো

আরও জোড়ে দাঁড় টান। দাঁড় দিয়ে এ অপমান মুছে ফেলতে হয়!

যেন মন্ত্রোচ্চারণ করল ম্যাক।

মুহূর্তে আমরা মরিয়া হয়ে উঠলাম। যেন এই মর্মান্তিক অপমানটুকুর অপেক্ষাতেই ছিলাম আমরা। ম্যাক বসেছে আমাদের মুখোমুখি। তার বুকের উপর সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করছে নিষ্ঠিবনের চূড়ান্ত অপমান! আমরা উন্মাদের মত দাঁড় বাইতে থাকি। মৃত্যুপণ করে দাঁড় বাওয়া কাকে বলে জীবনে সেইদিনই প্রথম অনুভব করলাম। তিল তিল করে খুচে গেল ব্যবধান। বাকি আধখানা পথে ঐ পাঁচ লেংথের দূরত্বকে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত আমরা বিজয়ী হলাম।

পুরস্কার দিতে এসেছিলেন স্বয়ং জেনারেল গোয়েরিঙ্।

প্রথা মাফিক করমর্দনও করলেন, আমাদের হাতে কাপটাও তুলে দিলেন—কিন্তু বিন্দুমাত্র হাসলেন না। বেশ মনে হল, ইংরেজ-বাচ্চার হাতে ঐ কাপটা প্রাণ ধরে তুলে দিতে যেন তাঁর অন্তরের সায় নেই। সোনার ঈগল বসানো ঐ রূপার কাপটা পুরো একবছর আমাদের ঘরখানাকে সেই কলঙ্কে ভরিয়ে রেখেছিল। বৎসরান্তে কাপটা ফেরত দিয়ে আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এত কথা লিখছি এজন্য যে, আজ হাসপাতালের এই কনভালেসেন্স ওয়ার্ডে বসে মনে হচ্ছে আমাদের সেই বাইচ-প্রতিযোগিতাটা যেন এই বিশ্বযুদ্ধের চুম্বক প্রতীক! এ যুদ্ধের প্রস্তুতি জার্মানপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে করেছে, সুশৃঙ্খলভাবে করেছে; তাই যুদ্ধারম্ভেই ওরা পাঁচ লেংথে এগিয়ে গেছে। অপরপক্ষে আমরা যেন পাকেচক্রে যুদ্ধে নেমে পড়েছি, এতদিনেও নেশার ঘোর আমাদের কাটেনি। আর ডানকার্ক যেন সেই ব্রীজের উপর থেকে ছুঁড়ে-দেওয়া চরমতম অপমান!

এবার বাকী আছে আমাদের মরণপণ লড়াই।

বড় হয়ে কোন্ লাইন ধরব এ নিয়ে এক দুশ্চিন্তা ছিল। আমার

ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সাহিত্যিক হব, উপন্যাস লিখব। বন্ধুরা অনেকে বলেছে আমি সিনেমায় গেলে নাম করব—ওদের ধারণা সুন্দর চেহারাই বুঝি সে রাজ্যের একমাত্র পাশপোর্ট। যাই হোক, যুদ্ধ সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দিল। আমার মধ্যে যে একটা বেপরোয়া দুর্ধর্ষ ছোকরা লুকিয়েছিল সেটা আবিষ্কার করলাম যুদ্ধের হিড়িকে। ছেলেবেলায় বাবার পাল্লায় পড়ে গীর্জায় যেতে হত প্রতি রবিবার। বুড়ো পাদরীদের বক্তৃতা একটুও ভাল লাগত না। আসলে ধর্মকর্ম, নীতিকথা 'একটুও বরদাস্ত হত না আমার। বরং ভাল লাগত এ্যাডভেঞ্চারাস্ ফিল্ম। কাউবয়দের কীর্তি, ঘোড়ার পিঠে ছোটা, মেসিনগানের খটাখট! ভেবে দেখলাম পাইলটের জীবনে উত্তেজনার অভাব হবে না। এখন দেখছি, ঠিকই ভেবেছিলাম।

ফ্লাইং-ক্লাবেই কিছুটা উড়তে শিখেছিলাম। তাই পাইলট হিসাবে যুদ্ধে নাম লেখাতেই আমাকে দেওয়া হল ট্রেনারের কাজ। বুঝুন কাণ্ড! ইংল্যাণ্ড সেদিন কী পরিমাণে অপ্রস্তুত! নিজেই যে ভাল করে উড়তে জানে না সে হল ট্রেনার! তবে প্রশিক্ষক হিসাবে আমার কাজটা ছিল ওদের দিয়ে ড্রিল করানো, নিয়মানুবর্তিতা শেখানো, আর মাটিতে দাঁড়ানো প্লেনের যন্ত্রপাতি চিনিয়ে দেওয়া। আমার ছাত্ররাও ছিল নেহাৎ সাড়ে বত্রিশ ভাজা। চাষী, মজদুর, ব্যাঙ্কের কেরানি, দোকানদার, খবরের কাগজের হকার ইত্যাদি। যেমন মাস্টার তেমন ছাত্র। কিন্তু ওরাই ছিল সেদিন ইংল্যাণ্ডের একমাত্র ভরসাস্থল।

সেটা হচ্ছে প্রাক-ডানকার্ক যুগের কাগুজে-যুদ্ধের আমল। অর্থাৎ খাতাকলমে গ্রেট-ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বটে, তবে পাঁয়তাড়া ভাজার কাজ শেষ হয়নি। লড়াই হচ্ছে বেলজিয়ামে, হল্যাণ্ডে, পোল্যাণ্ডে এবং নরওয়েতে। গ্রেট-ব্রিটেন দর্শকমাত্র। তখনও পর্যন্ত আমি স্বচক্ষে কোন যুদ্ধ-বিমান দেখিনি। এই সময়ে আমাকে বদলি করা হল ইউনিভার্সিটি এয়ার স্কোয়াড্রনে। সেখানে

কলেজের আমলের কিছু চেনা মুখ দেখলাম। একটা হোটেলে আমরা ছয় সপ্তাহ ছিলাম। আড্ডা দিয়েছি, খবরের কাগজ পড়েছি, তাস খেলেছি, রেডিও শুনেছি আর 'জেরি'-দের মুণ্ডপাত করেছি আড্ডার আসরে।

মাস দেড়েক বাদে আমাকে আবার বদলি করা হল স্কটল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের এক শিক্ষণশিবিরে। এইবার সত্যিকারের উড়তে শিখলাম। আমাকে যিনি শেখাতেন তিনি লোক ভাল। বেশ যত্ন নিয়ে শেখাতেন। আমাদের দলে শিক্ষার্থীরা ছিল সব আনকোরা নভিস্, আমারই মত। তাদের বয়স আঠারো থেকে ছাব্বিশ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড্রনে পরিণত হলাম। কেউ চালাতে শিখল ফাইটার, কেউ বম্বার, কেউ রেকনয়টারিং। আমাকে শেখানো হল ফাইটার প্লেন চালানো। আমারও তাই ছিল ইচ্ছা। ঘুমন্ত নগরীর উপর বোমা ফেলে আসা আমার ভাল লাগত না; আকাশপথে দ্বৈরথ-সমরই আমার কাম্য। হয় মার, নয় মর!

আমাদের এয়ারবেস্-এ মাঝে মাঝে দূরচারী বোমারু-বিমানের ঝাঁক আসত। হপ্তাখানেক এক-একটা য়ুনিট আমাদের বেস্-এ থাকত। প্রতিরাত্রে ওরা উড়ে যেত নরওয়ে অঞ্চলে, শত্রুঘাঁটিতে বোমা ফেলে রাতারাতি ফিরে আসত। বৈমানিকেরা থাকত আমাদেরই মেস্-এ, খেত একই ডাইনিং-হল-এ; কিন্তু তারা বেশি গল্প-গুজব করত না। মিশুকে নয়, এ-কথা বলব না; কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা তারা কিছুই বলতে চাইত না। একদিন, মনে আছে, ওরা নয়খানা প্লেন নিয়ে নরওয়ের দিকে উড়ে গেল। আমরা হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। আমরা রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেলাম আর ওরা গেল ধ্বংসের কাজে। পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে দেখলাম চারজন বসে নির্বিকারভাবে প্রাতরাশ খাচ্ছে। বাকি পাঁচজন নেই।

আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল—তাদের কী হল। জানি, বুঝি, তবু সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ ওরা

তুলতেই দিল না। দিব্যি সারা সকাল বসে তাস খেলল আর সিগ্রেট ফুঁকল।

সেদিন, মনে আছে, নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম—কেন যোগ দিয়েছি এই যুদ্ধে? কেন ঘর ছেড়ে আকাশে উড়তে চাইছি? ঐ পাঁচজনের একজন হতে? নিশ্চয় নয়! তবে? আচ্ছা, জীবনে প্রথম যে জার্মান ছোকরার সঙ্গে গুলি-বিনিময় করব সেও কি এমন করে ভাবে? তার সঙ্গে আমার তো কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। তাকে তো চিনিই না আমি। তবে মারব কেন? বাঃ! মারতে হবে না? না হলে সে যে আমাকে সাবড়াবে!

একদিন একটা স্পিটফায়ার স্কোয়াড্রন এল, আশ্রয় নিল আমাদের মেস্-এ। স্পিটফায়ার এসেছে শুনে ছুটে দেখতে গেলাম। তখনও ওটা চোখেই দেখিনি, শুধু শুনেছিলাম স্পিটফায়ার নিয়েই আমাকে লড়তে হবে। বিমানগুলোর সঙ্গে ভাব জমাই, কক্‌পিটে উঠে বসি, এটা-ওটা নাড়াচাড়া করি। আর কিছু না পারি তো প্লেনটার মসৃণ গায়ে হাত বুলাই।

তারপরেই এল ডানকার্কের খবর।

খিন্ন, ক্লান্ত, মুমূর্ষু সৈন্যদলের মর্মান্তিক পশ্চাদপসরণ। আমরা যে কাহিনী এতদিন রেডিওতে শুনেছি, খবরের কাগজে পড়েছি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের কারও ছিল না। শেষে আমরা তিন বন্ধু—আমি, কলিন্স আর পীটার একদিন ছুটি নিয়ে ব্রাইটনে উদ্বাস্তুদের দেখতে গেলাম। কলিন্স আমারই বয়সী—চঞ্চল, ছটফটে, তার চোখে-মুখে কথা। আর পীটার আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট। ধীর, স্থির, ধর্মভীরু মানুষ। কলিন্স ওর নাম দিয়েছিল: সেন্ট পীটার!

ব্রাইটন ভরে গেছে উদ্বাস্তুতে। সমুদ্রতীরে, রেস্তোঁরায়, রাস্তায় গিজগিজ করছে মানুষ, মানুষ আর মানুষ। সৈনিক আর তারা নয়, তাদের জামা-কাপড়, অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই সৈনিকোচিত নয়। তারা

কপর্দকহীন, কিন্তু স্থানীয় লোকজন তাদের সাধ্যানুযায়ী রাজকীয় সম্মান দিতে প্রস্তুত।

আমরা তিনজনে ওদের তিনজনকে বেছে নিলাম। আমাদের স্বল্পসঞ্চয়ের ভাগ দিয়ে ওদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে লাঞ্চ খেলাম। প্রস্তাবটা পীটারের। ওদের দুজন ফরাসী, একজন বেলজিয়ান। ওরা দুঃখের সঙ্গে জানালো পশ্চাদপসরণের সময় ব্রিটিশ বিমান-বাহিনী ওদের যথেষ্ট আকাশ-ছাউনির ব্যবস্থা করতে পারেনি বলেই ওদের এ দুর্দশা। আমি একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, বলতে যাচ্ছিলাম আমাদের নিজেদের অবস্থাই কী মর্মান্তিকভাবে করুণ; কিন্তু সেকথা বলা হল না। পীটার আমার কানে কানে বললে, কী হবে আর ওদের দুঃখ বাড়িয়ে। ব্রাইটন থেকে ফেরার পথে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা থেকে আমরা তিনজনে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলাম। আমাদের মোটরগাড়িটা একেবারে উল্টে গিয়েছিল। আশ্চর্য! আমাদের কারও কোন আঘাত লাগেনি। পীটার বললে, ঈশ্বর করুণাময়। খুব বেঁচে গেছি!

আমি গায়ের ধুলো ঝাড়তে ব্যস্ত ছিলাম। ওর ন্যাকামিতে মেজাজ খিঁচড়ে গেল আমার। চীৎকার করে উঠি: ঈশ্বর করুণাময় না হাতী! আসলে তুমি যাকে ঈশ্বর বলছ সে লোকটা রোমান সম্রাটের মত। গ্ল্যাডিয়েটারের মত আমাদের জিইয়ে রেখে দিল মজাদার একটা দৃশ্য দেখবে বলে।

অবাক বিস্ময়ে পীটার বললে, মানে?

: মানে বিশ হাজার ফুট উঁচুতে আকাশের এ্যাম্ফিথিয়েটারে আমাদের মৃত্যুদৃশ্যটা আরও মজাদার হবে বলেই আজ আমাদের বাঁচিয়ে দেওয়া হল! ঈশ্বর করুণাময়! মাই ফুট্!

কলিন্স অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে, কারেক্ট। আমাদের মৃত্যু-দৃশ্য অনেক বেশি এ্যাম্বিশাস! এত নীচভাবে মরার জন্য আমরা জন্মাইনি।

তাকিয়ে দেখি বেদনার্ত হয়ে উঠেছে পীটারের মুখটা।

ফেরার পথে কলিন্স ওকে কনুইয়ের এক গোঁত্তা মেরে বললে, কিরে পীটার, এত মিইয়ে গেলি কেন? এ্যাম্বিশাস মৃত্যুর কথাটা মনে করিয়ে দিলাম বলে? মৈ, সিগ্রেট ধরা।

পীটার সেটা প্রত্যাখ্যান করল। বললে, না, সেজন্য নয়।

কি জন্য, তা সে বলেনি। আমরাও বুঝিনি। আজ বুঝতে পারি। সেন্ট পীটার আহত হয়েছিল আমার ঐ ব্যঙ্গোক্তিতে: ঈশ্বর করুণাময়! মাই ফুট্!

সেন্টিমেন্টাল পাগল একটা।

কয়েক সপ্তাহে পরে আমাদের বেস্-এ আদেশ জারী করা হল —সকলের সব ছুটি বাতিল। অর্থাৎ সবাই যেন সবসময়ে প্রস্তুত থাকে। কেউ যেন বিমানক্ষেত্র ছেড়ে দূরে না যায়।

বুঝলাম, এবার গ্রেট-ব্রিটেনের পালা পড়েছে। জার্মান-আক্রমণ সমাসন্ন।

সরকারী ইস্তাহারে জনগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হল—কেউ যেন স্থানত্যাগ না করে, যাই ঘটুক না কেন। সবাই বুঝতে পারে, 'যাই ঘটুক না কেন' শব্দগুলির নির্গলিতার্থ। অর্থাৎ আকাশে বোমারু-বিমান, সমুদ্র উপকূলে জার্মান ডেস্ট্রয়ার এবং ইংল্যাণ্ডের মাটিতে হিটলারের অজেয় ব্লিৎসকীর্গ বাহিনীর অনলবর্ষী ট্যাঙ্কের সারি। আপামর জনসাধারণ খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। এ যুদ্ধ তাদের যুদ্ধ। সতের থেকে সত্তর সবাই এসে নাম লেখালো খাতায়। হোম গার্ডে। অস্ত্র না থাকে—অধিকাংশেরই তা ছিল না, তবু ওরা দমে না। লাঠি-সোটা ফুলঝাড়ু নিয়ে মাঠে ঘাটে রাস্তায় সবাই ডান-বাম ডান-বাম শুরু করে দিল।

এতদিন যে ফরাসী দেশটাকে আমরা চিনতাম—ফুলে ঢাকা, সুন্দরী মেয়েতে ভরা, স্যাম্পেনে উচ্ছল ঐতিহাসিক ফ্রান্স, তা মুছে গেছে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। তার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে নাৎসীবাহিনীর সদর্প বুটের প্রতিধ্বনি। পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে গেছে,—এবার গেল ফ্রান্স। পরবর্তী অধ্যায়—গ্রেট-

ব্রিটেন। বিশ্বত্রাস হিটলারের অজেয় বাহিনী এবার টার্গেট বলে স্থির করেছে এই দ্বীপপুঞ্জকে।

বিমান-মন্ত্রক এতদিনে আমাদের ডাক দিলেন। আদেশ এল —আমাদের শিক্ষার্থীদের ভিতর পনেরজনকে অবিলম্বে সম্মুখ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পাঠানো হবে। দলে আমরা ছিলাম সবসুদ্ধ কুড়িজন। পাঁচ-জন বাদ যাবে। হঠাৎ এতদিনের বন্ধুরা যেন শত্রু হয়ে উঠল। আমরা একটা হ্যাটের মধ্যে কাগজ ফেলে লটারী তুললাম। আমরা তিন বন্ধু ভাগ্যবান—পীটার পীস, কলিন্স আর আমি, তিনজনেই যাবার অনুমতি পেলাম। সেইদিনই রওনা দিলাম আমরা গ্লস্টারশায়ারের দিকে। দিন পনের সেখানে আবার ট্রেনিং নিতে হল।

এখানে আমাদের ট্রেনার ছিলেন—বিল্ কিল্‌প্যাট্রিক। মধ্যবয়সী অতি-অভিজ্ঞ বৈমানিক। দীর্ঘদিন আছেন বিমান-মন্ত্রকে। যত্ন নিয়ে শেখাতেন আমাদের। শুধু বিমান চালনাই নয়, জার্মান বৈমানিকদের সব কূটকৌশল ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। শুনলাম, জার্মানদের ফাইটার প্লেনের নাম 'মেসার্সটিট'; সেগুলি আমাদের জঙ্গীবিমান স্পিটফায়ারের চেয়ে উন্নত ধরনের; শুনলাম—সবসময়েই বিমান-যুদ্ধে ওদের সংখ্যাধিক্যের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কিল্‌প্যাট্রিক বললেন, জার্মান জঙ্গী-বিমানের কায়দা হচ্ছে এই: তারা শত্রু-বিমান দেখলেই নিজেদের বোমারু-বিমানদের ছেড়ে এক ধাপ উপরে উঠে যায়। উপর থেকে আক্রমণ করাই তারা পছন্দ করে। ওরা নাকি দলবদ্ধ আক্রমণই বেশি পছন্দ করে, যেহেতু সব-সময়ই ওরা সংখ্যায় বেশি। আমাদের পক্ষে সুবিধা দলছুট আক্রমণ, কারণ তাতে একের পর এক ওদের মোকাবিলা করা চলে। বললেন, রেডিওতে অনেক সময় শত্রুপক্ষের কথাও শোনা যায়; তাই আমাদের স্কোয়াড্রন লীডার আমাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় আদেশ দেবেন। কোন্ আদেশের কী অর্থ তা আমাদের মুখস্থ করে নিতে হল। আরও বললেন, জার্মান জঙ্গী-বিমানের একটা কায়দা হচ্ছে

আহত হয়ে পড়ার অভিনয় করা। জঙ্গলে বাঘ যেভাবে শিকারীকে ছলনা করে। যেই তুমি উৎফুল্ল হয়ে অসতর্ক হবে, অমনি সে সোজা হয়ে তোমার উপর মেসিনগান দাগবে।

স্পিটফায়ার নিয়ে ক্যাপ্টেন কিল্‌প্যাট্রিকের সঙ্গে আকাশে উড়লাম। নানান কায়দায় প্লেনটাকে চালিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করলাম। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় একখানা প্লেন-এ। রেডিওতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন সাঙ্কেতিক ভাষায়ঃ ওপরে ওঠ। নিচে নাম। ডাইনে ফেরো। ফির না।

এরপর একবার অক্সিজেন সিলিণ্ডার পিঠে বেঁধে আটাশ হাজার ফুট উপরে উঠতে হল। দেখাতে হল সারবেঁধে আক্রমণের কায়দা এবং দলছুট ডগফাইট। লক্ষ্য করে দেখলাম, প্রতিবার কামান দাগলেই প্লেনের গতিবেগ কমে যায় ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল। তৎক্ষণাৎ তার পরিপূরক করতে হয়। মনে পড়ল, কলেজে থাকতে প্রফেসর বৈজ্ঞানিক নিউটনের তৃতীয় আইনেব বিষয়ে কী-জানি সব শিখিয়েছিলেন।

দলে আমরা ছিলাম পনেরজন; কিন্তু কি জানি কেন ক্যাপ্টেন কিল্‌প্যাট্রিকের একটা বিশেষ স্নেহদৃষ্টি লাভ করেছিলাম আমি। কলিন্স ঠাট্টা করে বলতঃ সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়!

সকলকলাপারঙ্গম হয়ে উঠেছি কিনা দেখতে এবারে একজন বড় সাহেব এলেন। রয়্যাল এয়ার ফোর্স-এর স্কোয়াড্রন লীডার হক্‌স। শুনলাম, জার্মান বিমানশক্তির বিষয়ে তিনি নাকি একজন অথরিটি। প্রায় প্রতিটি নামকরা জার্মান পাইলটের নামে তাঁর পৃথক ফাইল আছে। তাঁর সামনে আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হল।

আমি আর আমার শিক্ষক কিল্‌প্যাট্রিক দুটি জঙ্গী-বিমান নিয়ে আকাশে উড়লাম। দশ হাজার ফুট উপরে ওঠার পর কিল্‌প্যাট্রিক রেডিওতে বললে, এবার আমি তোমার পিছু ধাওয়া করছি; আমার হাত ছেড়ে পালাও।

বলেই সে ধেয়ে এল আমার পিছনে। ক্রমাগত ডাইনে-বাঁয়ে বেমক্কা বাঁক নিয়ে, হঠাৎ ডাইভ করে, হঠাৎ উপরে উঠে নানাভাবে তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রতিনিয়তই দেখলাম চিলের পিছনে ফিঙের মত সে আমার পিছনে সেঁটে আছে। ঘুড়ির ল্যাজে সুতো বেঁধে আর একটুকরো কাগজ বেঁধে দিলে যে অবস্থা হয়, অবিকল তাই। কিছুতেই তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারলাম না।

এবার ও বেডিওতে বললে, পারলে না তো ? আচ্ছা, এবার আমি পালিয়ে যাচ্ছি, তুমি আমার পিছনে ধাওয়া করে এস দিকি !

আশ্চর্য, কিছুতেই তার নাগাল পেলাম না। সে যে কখন কোথায় গোঁত্তা মেরে ডুব দেয় মালুমই হয় না। ক্রমাগত পাক খেতে খেতে আমার কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। শেষে কিল্‌প্যাট্রিক রেডিওতে বললে, খুব হয়েছে, এবার নেমে এস বেস্‌-এ। টেক্‌নিক্যালি তুমি অনেক আগেই মরে ভূত হয়ে গেছ।

তা আমিও জানি। হিসাবমত তাকে গুলি করার সুযোগ আমি একবারও পাইনি। অথচ সে ইচ্ছা করলে এতক্ষণে আমাকে চালুনির মত ঝাঁজরা কবে দিতে পারত। নিশ্চিত বুঝলাম, স্কোয়াড্রন-লীডাব হক্‌স আমাকে পাশমার্ক দেবেন না। দিলে, প্রথম দিনের বিমান-যুদ্ধেই ব্রিটেন একটি প্লেন খোয়াবে।

কিন্তু বিমান-চালনার দক্ষতায় আমাকে কিল্‌প্যাট্রিক যতটা বিস্মিত করেছিল তার শতগুণ বিস্মিত হলাম স্কোয়াড্রন-লীডার হক্‌স-এর ব্যবহারে। বিমানক্ষেত্রে নেমে এসে যেই তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন : ব্রেভো ! তুমি তো দিব্যি শিখে গেছ ! য়ু আর সিলেক্‌টেড !

দুপুরে লাঞ্চের সময় আমি ওঁকে চেপে ধরলাম, কেন আমাকে পাশ করালেন ?

উনি হেসে বলেন, তোমার চেয়ে অনেক কম শিখেছে যারা তাদেরও আমি আজকাল পাশমার্ক দিচ্ছি। এ থেকেই বুঝবে আজ

আমাদের অবস্থাটা। আমরা অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। বৈমানিকের বড় অভাব।

আমার মনে পড়ল সেই বাইচ প্রতিযোগিতার কথা।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের তুলনায় ওদের বিমানশক্তি কত বেশি?

ছুরি দিয়ে মাংসের টুকরাটা কাটতে কাটতে বললেন, আমি জানি না। জানলেও অবশ্য তোমাকে বলতাম না। বলার নিয়ম নেই—

তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভুল বুঝো না আমাকে। তোমাকে অবিশ্বাস করছি বলে নয়। এটাই আইন। আর তাতেই তোমার মঙ্গল; দেশের মঙ্গল। যারা সম্মুখ-যুদ্ধে যাচ্ছে তাদের এসব না জানাই ভাল। কারণ, ধরা পড়লেও তাদের দ্বারা কোন ক্ষতি হতে পারে না।

প্রশ্ন করি, শুনেছি ওদের ট্রেনিং অনেক বেশি, অনেকদিন ধরে নাকি শিখেছে ওরা?

: হ্যাঁ। লাফতাফে এমন বৈমানিক আছে যার ফ্লাইং-আওয়ার্স তোমাদের স্কোয়াড্রনের সব কয়টি পাইলটের মিলিত ফ্লাইং আওয়ার্সের চেয়েও বেশি।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার চোখে-মুখে অবিশ্বাসের কোন অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল বোধহয়। তাই উনি বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না, না? কিন্তু সত্যিই এমন একজনের নাম, ধাম সব কিছু লেখা আছে আমার গোপন ফাইলে। তোমার চেয়ে কিছু বড় হবে বয়সে—বছর ছাব্বিশ বয়স তার—লাফতাফে ঢুকেছিল '৩৫ সালে। একমাসে ছোকরা উনিশটা ব্রিটিশ ফাইটারকে ভূপাতিত করেছে। এক রাত্রে পাঁচটা!

: কী নাম লোকটার? যদি না সেটা ওয়ার সিক্রেট হয়!

: নাম কি তার একটা? কেউ বলে 'দ্য রেড ডেভিল', কেউ বলে 'এস অফ স্পেড্স্', কেউ বলে 'দ্য টেরার অফ দি আর. এ.

এফ'! ছোকরা অত্যন্ত 'ভেনগ্লোরিয়াস্'। আর সবাই কুকুরছানা, বেড়ালবাচ্ছা অথবা পাখি পোষে—ওর 'পেট' হচ্ছে একটা সিংহের বাচ্ছা!

আমি চুপ করে বসে শুনছিলাম। উনি হেসে ওঠেন আচমকা। বলেন, খুব কৌতূহল হচ্ছে, না? দেখবে তার ফটো?

পোর্টম্যাণ্টো ব্যাগ খুলে ফাইলটা বার করলেন। একটি ফটো বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে। বেশ সুখদর্শন হাসি-খুশি দেখতে। ছবির নিচে দেখলাম লেখা আছে তার নাম: ওবার লেফটানেণ্ট ফ্র্যাঙ্ক ভন ওয়েরা।

ছবিখানা ফেরত নিয়ে স্যুটকেসে ভরলেন। তারপর যেন অত্যন্ত গোপন কোন কথা বলছেন সেইভাবে মুখটা আমার কানের কাছে এনে বললেন, তোমার ট্রেনারমশাইকে কথাটা বল না, বেচারি লজ্জা পাবে—কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ভন ওয়েরা ইচ্ছে করলে কিল্‌প্যাট্রিককে ঠিক এইভাবে পিছন থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, যেভাবে সে আজ তোমাকে নাকাল করছিল।

সে রাত্রে ঐ অদেখা 'রেড ডেভিল'কে স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। স্বপ্নে আমি তাকে পিছন থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম!

স্বপ্ন নাকি মনের সুপ্ত কামনার তির্যক তৃপ্তি!

পরদিনই খবর এল '৬০৩ সিটি অফ এডিনবার্গ স্কোয়াড্রন'-এ তিনটি বৈমানিকের পদ খালি আছে। আমাদের তিনজনকে এডিনবার্গ যেতে বলা হল। আমি, কলিন্স আর পীটার। এডিনবার্গ যাওয়ার পথে পীটার বসেছিল আমার সামনের আসনে। পীটার কথা বলে কম। যুদ্ধের কথা একেবারেই নয়। সেদিন কি খেয়াল হল আমি ওকে প্রশ্ন করে বসলাম, আচ্ছা পীটার, তুমি কেন যুদ্ধে নাম লেখালে বল তো?

পীটার তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। শেষে সে তার আশ্চর্য-নীল দুটি চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর মেলে দিয়ে বললে, কথাটা তোমার

গোলমেলে লাগবে হিল্, আমি যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব বলে!

গোলমেলে কথাই বটে! বললাম, বুঝলাম না!

কলিন্স হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে, হুঁ হুঁ বাবা!' এ হচ্ছে সেণ্ট পীটার কথিত সুসমাচার! পাদরীর বাবাও বুঝবে না!

আমি কিন্তু এবার সে হাসিতে যোগ দিলাম না। পীটারকেই বললাম, বুঝিয়ে বল!

ঃ আমার যুদ্ধ হচ্ছে 'ভয়'-এর বিরুদ্ধে।

ঃ ভয়! কিসের ভয়।

ঃ ভয় পাওয়ার ভয়!

বিরক্ত হয়ে বলি, প্লিস পীটার! হিব্রু ছেড়ে সোজা ইংরাজি ভাষায় কথা বলতে পার না? কলিন্স দ্বিগুণ জোরে হেসে ওঠে। পীটার কিন্তু হাসল না। গম্ভীর হয়েই বললে, দেখ হিল্! জার্মানীর বিরুদ্ধে আমার এ-যুদ্ধ নয়। আমার সংগ্রাম 'ঈভ্ল্'-এর বিরুদ্ধে। আনন্দঘন সংসারে সাধারণ মানুষের বাঁচবার অধিকার যারা অস্বীকার করছে তাদের বিরুদ্ধে। ঘটনাচক্রে আজ জার্মানী সেই দুশমনের ভূমিকা নিয়েছে, তাই জার্মানী আজ আমার শত্রু। আজ যদি জার্মানী এ যুদ্ধ জেতে তাহলে ক্ষুদে ক্ষুদে হিটলারের দলই এ পৃথিবী শাসন করবে। পৃথিবী থেকে সাহসের মৃত্যু হবে। সাহস! —ঝুঁকি নেবার সাহস, নতুন কিছু করার সাহস, মনের কথা অকপটে খুলে বলার সাহস—কবিতা লেখা, গান গাওয়া, ভালবাসতে পারার সাহস! মানুষের মুক্তইচ্ছার মৃত্যু হবে যদি হিটলার জেতে। পৃথিবীতে আর মানুষ থাকবে না, থাকবে শুধু দাস।

ঃ এ তো তোমার ঋণাত্মক চিন্তাধারা,—কী এড়াতে চাইছ তাই বললে তুমি। 'পসিটিভ' কিছু চাও না?

ঃ নিশ্চয়ই চাই! আমি মুক্ত পৃথিবীর জন্ম দেখতে চাই! A better world!

ঃ বেটার? 'বেটার' মানে কি? ক্রিশ্চিয়ান?

ঃ হ্যাঁ—যীসাস্-এর পথে তো নিশ্চয়ই। অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে আমি ক্রিশ্চিয়ানিটিকে আঁকড়ে ধরিনি হিলারী ; ওর চেয়ে ভাল পথ এ পর্যন্ত আমাকে কেউ দেখাতে পারেনি বলেই আমি যীসাস্‌কে আঁকড়ে ধরে আছি—যুক্তি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, বোধ দিয়ে। ক্রিশ্চিয়ানটি বলতে আমি বুঝি সামাজিক অবস্থায়, নৈতিক অবস্থায় মানুষের মুক্তি। মানুষের প্রতি মানুষের মানবিকতা। তবে মনে হচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছ না, নয় ?

আমি অকপটে স্বীকার করলাম, হ্যাঁ, ঠিক কথা পীটার। আমি তোমার সঙ্গে আদৌ একমত নই। ক্রিশ্চিয়ানিটি আমার কাছে একটা ভাঁওতা। সত্যি কথা বলতে কি আমি যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি সম্পূর্ণ অন্য কাবণে। আমি মনে করি আধখানা জীবনে মানুষ যতটা এগিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে একযুদ্ধেই সে বেশি এগিয়ে যায়। তার শক্তির বিকাশ হয়। তাই আমি জঙ্গী-বিমানের চালক হয়েছি। হয় মার, নয় মর! সোজা হিসাব! মানবিকতা, মুক্ত পৃথিবী—ওসব বড় বড় কথা। ও আমি বুঝি না, বুঝবও না কোনদিন।

পীটার হেসে বললে, তোমার সব কথাই আমি মেনে নিচ্ছি—ঐ শেষ কথাটা ছাড়া। আজ বুঝছ না, কিন্তু এমন একদিন তোমারও আসবে যেদিন আমার কথার মূল্য তুমি বুঝবে। সেদিন শুধু নিজের কথা নয়, বিশ্বমানবের কথাও তুমি ভাববে।

আমি হেসে উঠি ঃ মাফ কর সেন্ট পীটাব! অমন দুর্মতি আমার কোনদিনই হবে না।

এডিনবার্গ বিমানবন্দরে পৌঁছেই সুসংবাদ পাওয়া গেল। আমাদের তখনই প্লেন নিয়ে দক্ষিণে হর্নবার্চ বিমানবন্দরে চলে যাবার আদেশ তৈরি। হর্নবার্চ লণ্ডনের বারো মাইল দূরে, টেমস্-মোহনায়। আমরা চব্বিশ জন পাইলট তখনই রওনা দিলাম—তারিখটা হচ্ছে ১০ই আগস্ট, ১৯৪০। চব্বিশ জনের মধ্যে, পরে হিসাব নিয়ে দেখেছি আটজন ফিরে এসেছিল।

হর্নবার্চে এসে শুনলাম যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি। জার্মান বিমানদপ্তর এখন বোমারু-বিমান আদৌ পাঠাচ্ছে না। যা আসছে তা শুধুই ফাইটার। ওরা বোধহয় জানতে পেরেছে আমাদের ফাইটার প্লেনের সংখ্যা অল্প। প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমাদের ফাইটারগুলোকে নিঃশেষ করতে ওরা উঠে-পড়ে লেগেছে। সেটা শেষ হলে ওরা বিনা বাধায় নির্বিচারে আমাদের দ্বীপপুঞ্জটাকে ক্রমাগত বোমাবর্ষণে সমুদ্রের তলায় পাঠিয়ে দেবে। ফাইটার প্লেনগুলো রাতের অন্ধকারে আসত না আদৌ। সংখ্যাধিক্যের অহমিকায় প্রকাশ্য দিবালোকে তারা সার বেঁধে আসত 'যুদ্ধং দেহি' ঘোষণা করে!

যেদিন আমরা হর্নবার্চে পৌঁছলাম তার পরদিন সকালেই লাউড-স্পীকারে ঘোষণা হল ঃ

'৬০৩ স্কোয়াড্রন রওনা হও! পরবর্তী নির্দেশ আকাশপথে রেডিওতে পাবে।'

কক্‌পিটে লাফিয়ে উঠলাম। এইমাত্র ব্রেকফার্স্ট খেয়েছি, তবু মনে হল তলপেটটা খালি খালি। কক্‌পিটে বসেই আমার মনে হল—আজ জীবনে প্রথম মানুষ খুন করব! আশ্চর্য! আমি নিজেও যে খুন হয়ে যেতে পারি এটা আদৌ আমার মনে পড়েনি! আমি শুধু ভাবছিলাম—ঐ যে লোকটা আজ আমার গুলিতে বিদ্ধ হয়ে শেষ হবে সে কেমন মানুষ? নিশ্চয় তার বয়স কম, কিন্তু কে আছে তার বাড়িতে। মা, বাবা—বিয়ে করেছে লোকটা? তার নাম কি রেড ডেভিল? দূর! এসব কি ভাবছি আমি?

ওদের সাক্ষাত পেলাম প্রায় আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে। আমরা ছিলাম দলে আটজন, ওরা সংখ্যায় ছিল আমাদের আড়াই গুণ—অর্থাৎ কুড়িজন। এক্ষেত্রে দল বেঁধে লড়তে যাওয়া বোকামি; আমরা দলছুট হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম। ওরা বোধহয় এটা আশঙ্কা করেনি। ওরা এক লাইনেই এগিয়ে আসছিল। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে ওদের দু-সেকেণ্ড দেরী হয়ে গেল—মাত্র দুই সেকেণ্ড;

কিন্তু সেটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমি দেখলাম আমাদের স্কোয়াড্রন লীডার ওদের প্রথম প্লেনটার উপর একঝাঁক গুলিবর্ষণ করে এগিয়ে গেল। প্লেনটাতে গুলি লাগেনি ; কিন্তু সে আতঙ্কিত হয়ে বাঁয়ে মোড় নিল। ফলে, আমার লক্ষ্যের সামনা-সামনি পড়ে গেল সে। তৎক্ষণাৎ গান-বটন্‌টার গলা টিপে ধরলাম। পুরো চার-সেকেণ্ড আমার কামানটা অনলবর্ষণ করল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল ওর প্লেনটা স্থির হয়ে গেছে। পরমুহূর্তেই দাউ-দাউ করে সেটা জ্বলে উঠল। পাক খেতে খেতে সেটা নেমে গেল নিচের দিকে।

বেস্‌-ক্যাম্পের দিকে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম, এর উল্টোটাও তো হতে পারত! ও এমনভাবে ফিরে যেত ওর বেস্‌-ক্যাম্পে, আমি পাক খেতে খেতে নেমে যেতাম ভূতলে। সেই আমার জীবনে প্রথম মানুষ হত্যা। লোকটা কে আমি জানি না ; কিন্তু সে তো আমারই মত মানুষ। তারও হয়তো মা আছে, আমার মত ছোট বোন আছে! দূর! ওসব কথা ভাবে না!

সেই আগস্ট আর সেপ্টেম্বরে বেশ বারকতক আমাকে স্কোয়াড্রনের সঙ্গে উড়তে হয়েছিল। প্রতিবারই দলছুট লড়াই, ডগ-ফাইট। আমাদের বিমান-সংখ্যা কমছে, বৈমানিকের সংখ্যাও। আমরা তিনজনই—আমি, কলিন্স আর পীটার জীবিত ফিরেছি। ভারি অদ্ভুত, নয়? অদ্ভুত কিছুই নয়, আমাদের দান পড়েনি এখনও, এই যা। আমরা তো গ্ল্যাডিয়েটার! আর এটা তো নেহাতই লটারী। কার দান কখন আসবে কে তা জানে?

তারপর আমার দান পড়ল একদিন। সেপ্টেম্বর তেসরা। সেদিন দিনে নয়, সন্ধ্যা সাতটার সময় কণ্ট্রোলার যথারীতি ঘোষণা করল : ৬০৩ স্কোয়াড্রন! টেক্‌ অফ্‌! পরবর্তী নির্দেশ আকাশে।

আকাশে উঠে সে নির্দেশ পেলাম। রাডার-যন্ত্রে ধরা পড়েছে মাইল পাঁচেক দক্ষিণ-পশ্চিমে পঁচিশ হাজার ফুট উপরে আসছে একঝাঁক শত্রু-বিমান। সংখ্যায় তারা কুড়িজন। আমরা উড়লাম

ছয়জন। রেডিওর নবটা চালু করলাম আমাদের দলপতির নির্দেশের জন্য। শোনা গেল জার্মান ভাষা! ওদের কথা! অল্প অল্প জার্মান জানতাম। তাই আমি সুইচ টিপলাম একই ফ্রিকোয়েন্সিতে—কথা বলার সুইচ। যেটুকু জার্মান খিস্তি জানা ছিল অনর্গল আউড়ে গেলাম!

জবাবে যা প্রত্যাশা করছিলাম তাই শুনলাম: নোংরা ইংরেজ বাচ্ছা! তোকে শিখিয়ে দেব কী ভাষায় জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

আমি আপন মনেই হেসে উঠি!

অল্টিমিটারে দেখলাম—বারো হাজার ফুট উপরে আছি। হঠাৎ একটা জিনিসের দিকে নজর পড়ল আমার। প্লেনের নিচে মেঘের স্তর—ঠিক মনে হল মা যেমন 'হুইপড-ক্রীম' বানাতো তেমনি কে-যেন আমার জন্য আকাশে আইস-ক্রীম তৈরি করেছে। হঠাৎ মায়ের কথা আজ মনে পড়ল কেন? এমন তো কোনদিন হয় না!

পরমুহূর্তেই দেখি ওরা আসছে দল বেঁধে! এবার ওরাই দল-ছুট হয়ে গেল আমাদের আগে। আমার দুপাশে দুটি জার্মান প্লেন। কোন্ দিকে ফিরব আমি? কে আমার শত্রু? এ না ও? প্রথমে ডান দিকেরটাকেই আক্রমণ করলাম আমি। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই কী যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত করল আমার প্লেনে! গতিমুখ ঘুরে গেল আমার। জকি-স্ট্রীকটা ধরে টানতে গিয়েই দেখি আমার পিছনে আগুন! আগুন কেন? বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। খুলতে গেলাম মাথার হুডটা। প্লেনটা আমার আয়ত্বের বাইরে। পাক খেতে খেতে নামছে। আগুন! ভীষণ উত্তাপ! হুডটা খুলে গেছে। প্রচণ্ড গতিতে আমি মাটির দিকে পড়ছি! তাহলে ব্যাপারটা এই রকম! প্যারাসুটটা নিয়ে আমি লাফ দিলাম শূন্যে। তখনও আমার জামা-কাপড় দাউ-দাউ করে জ্বলছে!

জ্ঞান ছিল। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিচে নামছে। প্যারাসুটের দড়িটা টেনে দিলাম। নিচের দিকে নজর হল! মাটি নয়, জল। সমুদ্র। যাক, আগুন নেভাবার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে না।

পরমুহূর্তেই শীতল জলের স্পর্শ। তটরেখা দৃষ্টির বাইরে। চারিদিকে অথৈ সমুদ্র। আগুনটা নিভে গেছে। বাঁ হাতটার দিকে নজর পড়ল। চামড়া পোড়ার বিশ্রী গন্ধ! ঘড়িটা নেই। ব্যাণ্ডটা পুড়ে যাওয়ায় ঘড়িটা পড়ে গেছে! হাতটা সাদা। এমন সাদা হাত তো আমার ছিল না!

এতক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। প্রচণ্ড শীত করছে আমার। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। ত্রিসীমানায় জনমানবের চিহ্ন নেই। বুঝলাম মৃত্যু আসন্ন। মরতে ভয় হল না। কিন্তু কত ঘণ্টা জ্ঞান থাকবে আমার? হাতটা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অবশ হয়ে গেছে। মুখটাও নিশ্চয় পুড়েছে—লোনা জলের স্পর্শে সারা মাথাটা জ্বলছে। হাতটা দেখতে পেলাম না। চোখটা গেছে তা হলে! সময় সম্বন্ধে কোন অনুভূতি ছিল না। বোধহয় আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট সেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করলাম। তারপর বিদ্যুৎচমকের মত মনের মধ্যে একটা চিন্তার উদয় হল: মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন এভাবে যন্ত্রণা ভোগ করার কোন মানে হয়? ঠিক কথা! আমি আত্মহত্যা করব! তাহলে অন্তত একটা সান্ত্বনা নিয়ে আমি মরব: ওরা আমাকে মারেনি! আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছি! যে কথা সেই কাজ! বাঁ হাতটা অবশ, আমি ডান হাত বাড়িয়ে লাইফ বেল্ট-এর বোতামটা খুলে দিলাম। হুস্ করে হাওয়া বেরিয়ে গেল। যেন আমরাই প্রাণ-বায়ু!

কিন্তু কী আপদ! ডুবে মরতে পারছি না কেন? আমি যে সাঁতার জানি! বোধ দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে স্থির করেছি আমি জলে ডুবে মরব—কিন্তু হাত-পা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে! তাহলে আমার মধ্যে কি দ্বিতীয় আর একটা সত্তা আছে যে আমার ইচ্ছেয় চলে না? যে আমার সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে চায়? তার

উপর রাগ করে এক পেট লোনা জল খেলাম। দেহটা ভারী হল; কিন্তু তবু আমার বিদ্রোহী হাত-পা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাঁতার কাটছে। উঃ মাগো! আর যে পারি না! মা? মা এখন কি করছে? মা জানেও না আমি আত্মহত্যা করতে বসেছি! ক্রমশঃ সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে! চারিদিক থেকে একটা ঘন অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরেছে! এ কি পার্থিব অন্ধকার, না মৃত্যু? চৈতন্য লুপ্ত হয়ে আসছে!

ঠিক তখনই কানে গেল বাবার কণ্ঠস্বর! বাবা! বাবা কেমন করে আসবে এখানে?

ঃ জো! ছোকরা বেঁচে আছে এখনও! জার্মান নয়, আমাদেরই দলের!

একজোড়া বলিষ্ঠ হাত বের হয়ে এল। ছেলেবেলায় বাবা যেমন কোলপাঁজা করে তুলে ধরত ঠিক তেমনি করে আমাকে উঠিয়ে নিল জল থেকে নৌকার গলুইয়ে—

…কী? এখনও ডায়েরী লিখছ? চোখের এত পরিশ্রম করা না তোমার বারণ?

ডায়েরী থেকে মুখ তুলে হিলারী দেখে সু এসেছে। ওর কনভালেসেন্স ওয়ার্ডের সেই সুন্দরী মেয়েটি ঃ সু। ওর খাবার নিয়ে এসেছে।

হিলারী অপরাধীর মত খাতাপত্র গুটিয়ে নিয়ে বলে, না না, বেশি তো লিখিনি আজ। এই দিনে চার-পাঁচ পাতা।

ঃ কতদূর এগিয়েছ?—বললে সু, চামচ দিয়ে পানীয়টা নাড়তে নাড়তে।

ঃ এইমাত্র জেলেরা আমাকে জল থেকে টেনে তুলল।

ঃ তাই বল। তবে তো তোমার গল্পে নায়িকাই আসেনি এখনও।

: নায়িকা মানে ?

সু মুখ টিপে হাসে। পানীয়টা বাড়িয়ে ধরে বলে, খেয়ে ফেল।

হিলারী হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নেয়। পান করে না কিন্তু। বলে, নায়িকা মানে কি ?

: নায়িকা মানে বোঝ না, অথচ আত্মজীবনী লিখবার সখ ? নাও, ওটা খেয়ে ফেল ! আমার অনেক কাজ বাকি আছে !

: ও ! তুমি ভেবেছ, তুমি বুঝি আমার গল্পের হিরোইন হবে ! মনেও ভেব না তা !

সু মিষ্টি হাসে। বলে, সে যাই হোক আমার প্রসঙ্গ এলে দেখিও।

: ইস্ ! পরের ডায়েরী বুঝি পড়তে হয় ! তোমার নামে কত কী লিখব আমি !

: ওমা ! ওটা তো আমাকেই দিয়ে যাবে বলেছ !

তা বলেছে হিলারী। কথা দিয়ে রেখেছে। হিলারীর সব কথা জানে সু। সে এখন নীরব শ্রোতা। ডিউটি না থাকলে এসে বসে হিলারীর কাছে। শোনে তার কাহিনী। নিজেও কখনও কখনও শোনায়। হিলারী বলেছে আবার যুদ্ধে যাবার আগে সে তার ডায়েরীটা ঐ নার্সের জিম্মাতেই গচ্ছিত রেখে যাবে। বস্তুত সু-র প্রেরণাতেই সে এই লেখাটায় হাত দিয়েছে। সু মাঝে মাঝে ওর পাণ্ডুলিপিও শুনে যায়, দু-একটা পরামর্শও দেয়। হিলারী বলেছে ও যদি যুদ্ধ থেকে কোনদিন ফিরে না আসে তাহলে সু যেন সেটা কোন প্রকাশকের হাতে পৌঁছে দেয়। সু তাকে কথা দিয়েছে। প্রকাশক অখ্যাত অজ্ঞাত এ লেখকের পাণ্ডুলিপি আদৌ ছাপতে রাজী হবেন কিনা তা ওদের দুজনের কেউই জানে না।

ওরা তখন কেমন করে জানবে রিচার্ড হিলারীর এই ডায়েরী যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার একটা অমর গ্রন্থে পরিণত হবে : The Last Enemy। দু-বছরে দশটি সংস্করণ হবে তার !

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০।

অর্থাৎ ফ্লাইট ক্যাপ্টেন রিচার্ড হিলারীর বিমান যেদিন নর্থ সীতে ভেঙে পড়ল তার চার দিন পরের কথা। ইংল্যাণ্ডের কক্‌ফস্টারে আর. এ. এফ. এয়ার বেস্‌-এ প্রকাণ্ড একটা মেহগনি টেবিলের ও-প্রান্তে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন স্কোয়াড্রন লীডার হক্‌স্‌ সেই যে বড়সাহেবটি হিলারীকে প্রথম দিনেই পাশ নম্বর দিয়েছিলেন! মধ্যবয়স্ক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, একহারা চেহারা, ঘন ভ্রূ, উন্নতনাসা এবং উচ্চাভিলাষী একজোড়া গোঁফ তাঁর চরিত্রে ব্যক্তিত্ব দান করেছে! জাঁদরেল অফিসার। স্কোয়াড্রন লীডার হক্‌স্‌ একজন বিশেষজ্ঞ—শত্রুপক্ষের শক্তির যাবতীয় সংবাদ তাঁর নখাগ্রে। তাই এই বিশেষ কাজটির দায়িত্ব বর্তেছে তাঁর উপর। দূর থেকে ছুটে আসতে হয়েছে তাঁকে। কাজটা গুরুত্বপূর্ণ। একজন জার্মান পাইলটের ইণ্টারভ্যু নেওয়া। জার্মান ছোকরা ভাঙা প্লেন নিয়ে নাকি ইংল্যাণ্ডের মাটিতে আছড়ে পড়েছে গুলিবিদ্ধ হয়ে। প্রাণে মরেনি—বোধকরি হক্‌স-এর প্রশ্নকালে তার মৃত্যুযোগ অদৃষ্টে লেখা ছিল বলেই।

ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে বন্দীর কাছ থেকে যুদ্ধের গোপন খবর বার করে নেবার এক বিশেষ পারদর্শিতা ছিল নাকি হক্‌স-এর।

দুই দিকে দুই প্রহরী বেষ্টিত হয়ে এসে দাঁড়াল বন্দী। জঙ্গী-বিমানের অধঃপতিত হতভাগ্য। প্রহরীরা স্যালুট করে দাঁড়াল। স্কোয়াড্রন লীডারের ভুল হয়ে গেল প্রত্যভিবাদন জানাতে। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে একদৃষ্টে দেখছিলেন বন্দী আগন্তুককে। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স, সতেজ শালগাছের চারার মত ঋজু। সর্বাবয়বে একটা দার্ঢ্য। নীল চোখ, সোনালী চুল, চওড়া কাঁধ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে—কে বলবে, ও বন্দী।

: সিট ডাউন লেফটানেন্ট! আমি স্কোয়াড্রন লীডার হক্‌স্‌।

বন্দীর জুতার নালে নালে ক্লিক্‌ করে শব্দ হল, মাথাটা অল্প নীচু করল সে—কিন্তু তাতে তার ঔদ্ধত্য চাপা পড়ল না।

: আপনার নামটা জানতে পারি?

প্রশ্নকারীর অতিবিনয়ে মনে মনে হাসল জার্মান বৈমানিক। তার নজর গেল টেবিলের উপর। সেখানে পড়ে ছিল রূপার মুঠ-ওয়ালা একটা ব্যাটন। জার্মান সংবাদপত্রে ব্যাটনশোভিত ব্রিটিশ অফিসারের কোন কার্টুনের কথা বুঝি মনে পড়ে গেল ওর। এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। বললে, শ্যিওর। আমি হচ্ছি ওবার লেফটানেন্ট অটো হিণ্ডেল।

: আই সী! তা আপনার যমজ ভাইটি এখন কোথায় আছেন হের হিণ্ডেল?

একটু থতমত খেয়ে যায় জার্মান ছোকরা। প্রতিপ্রশ্ন করে: আমার যমজ ভাই? মানে?

হক্‌স্‌ তাঁর ফাইল থেকে একটি ফটো ওর দিকে বাড়িয়ে ধরেন। বলেন, কী আশ্চর্য! চিনতে পারছেন না? আপনার যমজ ভাই ওবার লেফটানেন্ট ফ্রাঙ্ক ভন ওয়েরা। সেকেণ্ড গ্রুপের ACE fighter. যাঁর অষ্টোত্তর শতনাম আছে: ব্যারন ভন ওয়েরা, দ্য রেড ডেভিল, এস অফ স্পেডস, দ্য টেরার অফ দ্য আর এ. এফ, এ-ওয়ান অফ ব্লিৎসক্রীগ, ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

ফ্রাঙ্ক ওয়েরা একথার জবাব খুঁজে পায় না।

: ওবার লেফটানেন্ট! উনিশটি ব্রিটিশ এয়ারক্রাফটকে ভূপাতিত করা এবং আরও আধডজনকে মাটিতে জখম করা যে কোন বৈমানিকের পক্ষেই অত্যন্ত শ্লাঘার কথা। আপনি যদি আপনার যমজ ভাইটির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তবে নিরুপায় হয়ে আমি আপনাকেই অভিনন্দিত করব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈমানিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন প্রথম শ্রেণীর বৈমানিককে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

ছদ্ম বিনয়ে হক্‌স্ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'বাও' করলেন।

ওয়েরা এতক্ষণে বুঝেছে আত্মগোপন করা অসম্ভব। লোকটা তাকে হাড়ে হাড়ে চেনে।

সেও তার প্রশ্নকারীর সৌজন্য নকল করে প্রত্যভিবাদন করে। বলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে আপনার মহান কীর্তিকাহিনী রয়াল-ফ্লাইং কোরের ইতিহাসে আমার নজর এড়িয়েছে। সেটা আমারই লজ্জার কথা। কিন্তু এই সঙ্গে বলে রাখি—আপনার আশা বৃথা। আমার কাছ থেকে যুদ্ধের কোন গোপন কথা আপনি জানতে পারবেন না।

স্কোয়াড্রন লীডার জবাব দিলেন না। নৈঃশব্দ ঘনিয়ে উঠল। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ বিদীর্ণ হয়ে গেল আতঙ্কতাড়িত সাইরেনের শীৎকারে। দূরে, কাছে, এখানে-ওখানে চতুর্দিকে সাইরেনের আর্ত কণ্ঠস্বর। জার্মান বিমান-আক্রমণের সঙ্কেত। ভন ওয়েরার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আনন্দের প্রকাশটা গোপন রেখে ছদ্ম বিরক্তি দেখিয়ে বলে, আহ্! ব্যাটাদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। একটু নিরিবিলিতে যে আপনার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করব—

ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল হক্‌স্-এর নীল চোখ। হাতে তুলে নিল রিভলভারটা। বাঁ হাতে নিবিয়ে দিল টেবিল ল্যাম্প। পূর্ব কথোপকথনের জের টেনে বললে, না, গোপন কোন যুদ্ধের খবর জানতে চাইছি না মোটেই। আমি ভাবছি তোমার সিংহের বাচ্ছাটা এখন কার জিম্মায় আছে। স্যানিই বোধহয় ওকে দুধ-টুধ খাওয়াবে। সিম্বা তো একমাত্র স্যানিকেই এক-আধটু চেনে।

ভন ওয়েরা ঢোক গিলল। সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। লোকটা শুধু ওর পোষা সিংহের নাম নয়, ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর ডাক-নাম পর্যন্ত জানে! ওয়েরা স্বপ্নেও আন্দাজ করতে পারেনি ক-দিন আগে তাকে কী জাতীয় কম্‌প্লিমেণ্টস্ দিয়েছেন ঐ স্কোয়াড্রন লীডার, হিলারীকে তার পরিচয় জানাবার সময়।

পাক্কা দু-ঘণ্টা ধরে চলল ইণ্টারভ্যু। হক্‌স্‌-এর কণ্ঠে কখনও ব্যঙ্গ, কখনও তীব্র শ্লেষ, কখনও ভীতি প্রদর্শন, কখনও বা সহানুভূতি। কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল বোঝা যায় না। বার্লিন বেতার থেকে প্রচারিত ওর একটা সাক্ষাৎকারের বিবরণ মেলে ধরে হক্‌স্‌ বললেন, একটি মাত্র সোলো-ফ্লাইটে পাঁচটি ব্রিটিশ ফাইটারকে ভূপাতিত করা প্রচণ্ড সাফল্য, নয়? কোন এস্‌ অফ স্পেডস্‌-এর পক্ষেও, তাই নয়? আমি তোমার হর্নচার্চ ক্যাম্পেনের ব্রডকাস্ট দেখে বলছি। সাতই মে এই ব্রডকাস্ট তুমি বার্লিন রেডিওতে করেছিলে, মনে পড়ে?

ওয়েরা নিশ্চুপ। টেবিলের উপর পড়ে আছে ওর ব্রডকাস্টের অনুবাদখানা।

ঃ অথচ মজা হচ্ছে এই—তেসরা মে, অর্থাৎ যে রাত্রে তুমি ঐ পাঁচখানা প্লেন গুলি করে নামিয়েছিলে, সে রাত্রে হর্নচার্চ-অঞ্চলে আদৌ কোন বিমানযুদ্ধ হয়নি। তার অকাট্য প্রমাণ আমার কাছে আছে। ব্যাপারটা ভারী রহস্যজনক! তুমি এ বিষয়ে কী বল ওবার লেফটানেণ্ট ওয়েরা?

ওয়েরা গম্ভীরভাবে শুধু বললে, মাপ করবেন, হের মেজর; আমি আগেই বলেছি সামরিক কোন গোপন সংবাদ আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করব না।

ঃ গোপন সংবাদ কোথায় হে? এ খবর যে তুমি বার্লিন রেডিও স্টেশান থেকে ঘোষণা করেছ বিশ্বের উদ্দেশে!

ঃ হ্যাঁ, কণ্ঠস্বরটা আমার; কিন্তু প্রোগ্রামটা আদ্যোপান্ত ওঁরাই তৈরি করেছিলেন। আমি লিখিত বিবৃতি পড়ে গেছি মাত্র।

ঃ কিন্তু লিখিত বিবৃতিটা তো তোমার রিপোর্টের ভিত্তিতেই গড়া?

ঃ হের মেজর! আপনি কি বলতে চান বি. বি. সি.-তে যাঁরা ব্রডকাস্ট-প্রোগ্রাম তৈরি করেন তাঁরা সবাই যুধিষ্ঠিরের বাচ্ছা?

: আই সী। আমিই ভুল করছি। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি হের গোয়েব্‌ল্‌স্‌-এর চ্যালা। কিন্তু আমি যদি তোমার এই কীর্তিকাহিনীর নথীপত্র একটা ইস্তাহারে ছাপিয়ে তোমাদের বন্দী-শিবিরে বিতরণ করি আর মিথ্যাভাষণের জন্য তোমার প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা করি তাহলে সর্বসমক্ষে তুমি কি বলবে? 'দ্য রেড ডেভিল'-এর একটা নতুন খেতাব যোগ হবে নাকি? তোমার ভাষায়: যুধিষ্ঠিরের বাচ্ছা!

ভন ওয়েরা ম্লান হাসল। তবু হাসল সে, কাঁদল না। বললে, হের মেজর! আমি জানি এর বিনিময়ে আপনি আমার কাছে কী চান! মাপ করবেন, তা আমি দেব না।

: মিথ্যাভাষণের অভিযোগে তাহলে তোমার বিচারের আয়োজনই করি?

: করুন! আপনি ভুল করছেন হের মেজর! আমি জানি, আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করে আপনি বন্দী-শিবিরে আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারেন। আমার সহবন্দীরা সবাই বুঝবে না—ঐ মিথ্যাপ্রচারে আমার কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। ওরা বিশ্বাস করবে না—তা সত্ত্বেও আমি—আমি! দ্য টেরার অফ দ্য আর. এ. এফ! কারণ ওদের অনেকেই আমার সাফল্যকে ঈর্ষা করে। তাই উপহাসে বিদ্রূপে ওরা আমাকে জর্জরিত করে তুলবে।

: তাহলে তুমি তাদের সে সুযোগ দিচ্ছ কেন?

: দিচ্ছি এজন্য যে, আপনার বিকল্প প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে আমার জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। যুদ্ধের গোপন সংবাদ আপনাকে জানালে আমি নির্জনেও নিজের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না।

: সুতরাং—

: হ্যাঁ, সুতরাং! সুতরাং আপনি আপনার অত্যাচারের পর্যায় শুরু করতে পারেন। দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার। বর্তমান

অবস্থায় যা আপনার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র! আমি গোপন সংবাদ আপনাকে জানাব না।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন স্কোয়াড্রন লীডার হক্‌স্। তাঁর হাতের চাপে ইলেকট্রিক কল-বেলটা আর্তনাদ করে উঠল। যেন দৈহিক নিপীড়ন শুরু হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ দ্বারপথে দেখা দিল দুজন সশস্ত্র ছায়ামূর্তি।

: বন্দীকে নিয়ে যাও।

দুদিক থেকে দুজন এসে চেপে ধরে ওর বাহুমূল। হঠাৎ ওয়েরা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। তার দু হাতের দশটা আঙ্গুল আঁকড়ে ধরেছে রেক্সিনটপ টেবিলটার প্রান্ত। দৃঢ়স্বরে বললে, হের মেজর! বন্দী হিসাবে নয়, একজন পাইলট হিসাবে একজন পাইলটের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে!

প্রহরীরা আদেশ পেয়েছে। তারা ওর বাহুমূল ধরে প্রচণ্ডভাবে টানতে থাকে। কিন্তু হক্‌স্ হঠাৎ একটা আশার আলোক দেখেছে বোধহয়। কী বলতে চায় বন্দী? সে প্রতিহত করে প্রহরীদের। এগিয়ে এসে বন্দীর মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, বল!

: ফ্রম এ স্পোর্টসম্যান টু এ স্পোর্টসম্যান! বলব?

: বলছি তো—বল!

: হের মেজর! শুনেছি ইংরাজবাচ্ছা কথায়-কথায় বাজি ধরে! আমার সঙ্গে বাজি ধরতে রাজী আছেন?

ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয় স্কোয়াড্রন লীডার হক্‌স্-এর। বলে, কী বাজি?

: ছয় মাসের মধ্যে আমি জার্মানীতে পালিয়ে যাব! না পারি —আপনাকে ম্যাগনাম সাইজ এক বোতল শ্যাম্পেন দেব! কথা দিন, পারলে আপনি এক প্যাকেট সিগ্রেট পার্সেল করে পাঠিয়ে দেবেন জার্মানীতে!

স্কোয়াড্রন লীডার হক্‌স্ একথার জবাব দেননি। স্থির দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন ঐ দুঃসাহসী ছেলেটার দিকে। ও কি বদ্ধ উন্মাদ?

কিন্তু হক্‌স্ তো পাগল নন। এমন অদ্ভুত অসম বাজির প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেননি।

করলে, তাঁকে দশটা সিগ্রেট বাজি হারতে হত!

এরপর প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ব্রিটিশ গোয়েন্দার দল ফ্র্যাঙ্ক ভন ওয়েরাকে প্রশ্ন করে গেল। ছয়জন জার্মানভাষী ইংরাজ গোয়েন্দা পর্যায়ক্রমে এবং এককভাবে ইণ্টারভ্যু নিয়ে চলে। ওকে ঘুমাতে পর্যন্ত দিল না। যদি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে ঘুমের ঘোরে সে কিছু বলে ফেলে। ওরা তাকে প্রশংসা করেছে, লোভ দেখিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে—ওয়েরাও পর্যায়ক্রমে হেসেছে, লোভাতুর অথবা ভীত হবার অভিনয় করেছে; আসল কাজ হয়নি। ওরা তাকে নিয়ে গেছে নাইটক্লাবে, দেহ-ব্যবসায়ীদের মহল্লায়, মদের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চেয়েছে তাকে। ভন ওয়েরা সেজন্য ওদের ধন্যবাদও জানিয়েছে—জীবনকে খণ্ডমুহূর্তে নির্বিচারে উপভোগ করেছে, পাঁট-পাঁট মদ গিলেছে; কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। একটি সুন্দরী মেয়ে ওর ঘরে বেশ কিছু রাত কাটিয়ে গেল—ওয়েরা তার ছাব্বিশ বছরের তারুণ্য দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করল; কিন্তু ওর কবাটবক্ষের ওপারে যা ছিল তা সঙ্গোপনেই রইল— মেয়েটি তার কণামাত্রও টেনে বার করতে পারল না। দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারে ওয়েরা রইল অটুট, ব্যভিচারে রইল অটল!

নিরুপায় হয়ে ইংরাজ গোয়েন্দার দল তাকে ফেলে রাখল এক নির্জন কারাগারে। সলিটারি প্রিসন। সারা সপ্তাহে কোন মানুষের ছায়া পড়ল না তার একান্ত আবাসে। এমনকি তার খাবারটা পর্যন্ত আসত অন্ধকার সুরঙ্গ-পথে, যান্ত্রিক হাতে। সলিটারি প্রিসন-এ গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল ওয়েরার। নাগাড়ে ঘুমালো সে পুরো বারো ঘণ্টা। মনের আনন্দে। তারপর ঘুম ভেঙে উঠে উচ্ছিষ্ট মাংসের হাড় দিয়ে সে নির্জন

কারাপ্রাচীরের উপর খোদাই করে লিখল রেশিও-প্রপোর্শানের এক গাণিতিক সূত্র ঃ

ইণ্টারোগেসান ঃ সলিটারি প্রিসন ঃঃ নরক ঃ স্বর্গ

প্রথমটা তাই মনে হয়েছিল ওয়েরার—মনের কথাই লিখেছিল সে ; কিন্তু যত সময় যায় ততই বুঝতে পারে নিঃসঙ্গতার অভিশাপ। মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ জীব। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে হাজার হাজার বছর ধরে সে যে বদ-অভ্যাস করে বসে আছে তা এত সহজে ত্যাগ করা যায় না। সাতদিনেই ওয়েরা হাঁপিয়ে উঠল। তার মনে হচ্ছে যুগ-যুগান্ত ধরে মানুষের কণ্ঠস্বর সে শোনেনি। মানুষের নিঃশ্বাস তার গায়ে লাগেনি। ওয়েরা আপন মনে জোরে জোরে কথা বলে, নিজের কানে শোনে নিজের কণ্ঠস্বর। বাকযন্ত্র এবং শ্রবণশক্তিকে পরখ করে। সে রীতিমত ছটফট করছে! ঘরের জানালা এত উপরে যে, বাইরেটা দেখা যায় না। মনে পড়ে না আকাশের নীলিমার কথা, গাছপাতার সবুজাভার কথা! মনে হয়—কত যুগ-যুগান্ত হয়ে গেল সে এসব দেখেনি! অনেক উঁচুতে আছে একটা ঘুলঘুলি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ঐ ঘুলঘুলি দিয়ে একটা গোলাকৃতি রৌদ্রের ছোপ ঘরে ঢোকে। পশ্চিম দেওয়াল থেকে ক্রমে ক্রমে পুবের দেওয়ালে সরে আসে। এটুকুই ওর জীবনের বৈচিত্র্য! আর বৈচিত্র্য বলতে রাতের সাইরেন, অতিদূর থেকে ভেসে-আসা বিস্ফোরণের শব্দ। ভন ওয়েরা তখন আনন্দে নাচতে শুরু করত।

কোথা থেকে একটা গঙ্গাফড়িং এসে ঢুকেছিল ওর ঘরে—ঐ উপরের ঘুলঘুলি পথটা দিয়েই নিশ্চয়। দুর্ভাগ্য ওয়েরার, পরদিন সেটা মরে গেল। একটা দিন ঐ গঙ্গাফড়িংটাই ছিল তার সঙ্গী, বন্ধু, সমদুঃখী।

সাতদিন পরে আচমকা দরজাটা খুলে গেল। দুজন নির্বাক প্রহরী তাকে ধরে নিয়ে চলল অন্যত্র। এবার তার আশ্রয় হল একটি দ্বিতল বাড়ির উপরতলার এক ঘরে। ঘরে ঢুকেই স্বস্তির

নিঃশ্বাস পড়ে ওয়েরার। যাক, সে একা নয়, এ ঘরে আরও একজন বন্দী আছে। জার্মান পি. ও. ডাব্লু। ওয়েরা চমকে ওঠে তাকে দেখে। কী আশ্চর্য! এ যে তারই স্কোয়াড্রনের ওবার-লেফটানেণ্ট কার্ল ওয়েস্টারহফ!

প্রহরী বিদায় হতেই দু'বন্ধু পরস্পরের দিকে ছুটে যায়। পুরো একটি মিনিট দুজন পরস্পরের বাহুবন্ধে পরস্পরের বুকের স্পন্দন অনুভব করল! তারপর বাহুবন্ধ আলগা করে কার্ল বলে, ওয়েরা, তুই কবে ধরা পড়েছিস?

ওয়েরা গর্জন করে ওঠে—শাট আপ!

স্তম্ভিত কার্ল বলে, কি রে! ক্ষেপে গেলি কেন হঠাৎ? কি হয়েছে?

: যতক্ষণ আমি অনুমতি না দিচ্ছি একটা কথাও বলবি না।

বিস্মিত কার্ল দেখে এ্যালসেশিয়ান কুকুরের মত ভন ওয়েরা সারা ঘরে কি শুঁকে বেড়াচ্ছে। তন্ন-তন্ন করে কিছু খুঁজছে সে।

: কী খুঁজছিস?

: মাইক্রোফোন!

চমকে ওঠে কার্ল। তাই তো! এ কথা তো খেয়াল হয়নি। ওদের সাক্ষাৎকার একটা কাকতালীয় ঘটনা তো নাও হতে পারে। হয়তো এ একটা সুপরিকল্পিত ফাঁদ। তাই সাতদিন ওদের সলিটারি প্রিসন-এ রেখে ওদের এনে ফেলা হয়েছে পরস্পরের সান্নিধ্যে। হয়তো ঘরের একান্তে বসানো আছে জোরালো একটা মাইক্রোফোন আর বহুদূর কোন কক্ষে অপেক্ষা করছে একজন শ্রুতিধর, কিংবা টেপ-রেকর্ডার যন্ত্র হাতে একজন মেকানিক।

একটু পরেই দেখা গেল ভন ওয়েরার আশঙ্কা মোটেই অযৌক্তিক নয়। ভেন্টিলেটারের পিছনে লুকানো আছে একটি শক্তিশালী মাইক্রোফোন। ওয়েরার কাঁধে চড়ে কার্ল তার নাগাল পেল। টেনে ছিঁড়ে দিল বৈদ্যুতিক তার। হো-হো করে হেসে উঠল সে। বললে, কী শয়তানী বুদ্ধি দেখেছিস্! নাঃ! ঘরের ভিতর কোন

কথা বলব না আমরা। দেওয়ালগুলোও ফাঁপা হতে পারে! চল ঐ জানালার কাছে যাই।

কার্ল সরে আসে জানালার ধারে। ঘরে তিনটে জানালা। দুটি বাইরে থেকে বন্ধ করা, একটা খোলা ছিল। খোলা জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে কার্ল বলে, এখানে আয়। জানালার বাইরে মুখ রেখে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলব আমরা।

ওয়েরা জবাব দেয় না। সে গভীরভাবে কি ভাবছিল এতক্ষণ। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, ঠিক আছে। তবে যা বলবার আমিই বলব, তুই শুধু শুনে যাবি।

গট্ গট্ করে সে এগিয়ে এল জানালার কাছে। জানালার বাইরে মুখটা বার করে হঠাৎ চীৎকার করে বললে: হ্যালো! আর. এ. এফ. ইণ্টেলিজেন্স! দিস্ ইস্ রেড ডেভিল ওবার-লেফটানেণ্ট ফ্র্যাঙ্ক ভন ওয়েরা, দ্য টেরার অফ আর. এ. এফ. স্পিকিং! তোমরা শুনতে পাচ্ছ? আমি মাইক টেস্ট করছি···ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর হ্যালো!···না, না, ঘুলঘুলির ভিতব সহজে-নজর-পড়ে-যায় যে মাইকটা সেটা নয়, এই খোলা জানালার নিচে সিল্-এর তলায় লুকানো মাইকটা টেস্ট করছি আমি! শুনতে পাচ্ছ? এবার টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দাও! আমি আমার বন্ধু ওবার-লেফটানেণ্ট কার্লকে পশ্চিম রণাঙ্গনের গুপ্ত খবর সব বলব এবার! বেটার সেণ্ড এ মেসেস টু স্কোয়াড্রন লীডার হক্স্! তাঁর শোনা দরকার! রেডি। ওয়ান, · টু···থ্রি

ধড়াস করে খুলে গেল নির্জন বন্দিশালার রুদ্ধদ্বার! ভাবলেশহীন মুখে চারজন প্রহরী প্রবেশ করল ঘরে। এক গাল হেসে ওয়েরা বললে, গুড মর্ণিং অফিসার্স। মাইকটা কি কাজ করছে না?

কার্ল দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বললে: শ্‌শালা।

আগন্তুক চারজন এগিয়ে এল নীরবে। দুজন বন্দীকে ধরে তারা নিয়ে চলল পৃথক পৃথক বন্দিশালায়। ওয়েরা তখনও হাসছে। হো-হো করে হাসছে।

বন্দীজীবনে ফ্রাঙ্ক ভন ওয়েরার কাছে থেকে কোন সংবাদ বার করতে পারেনি ব্রিটিশ ইণ্টেলিজেন্স। ওর কীর্তি-কাহিনী আমি সংগ্রহ করেছি মিত্রপক্ষের নথিপত্র ঘেঁটে। ইংরাজী প্রবাদবাক্য 'Give the Devil it's due' তারা অস্বীকার করেনি। তাদের বক্তব্য তাদের ভাষাতেই বলি, যাতে বোঝা যাবে আমি অতিরঞ্জন করছি না: 'During that time he had not knowingly given away any military information whatsoever. But in the process of questioning him the British had unavoidably provided him with an almost complete picture of their methods and techniques. As it turned out this information was of far greater importance than anything he could have told them. For Ober Leutenant Von Werra was profoundly impressed by the subtlety and insidiousness of British interrogation methods and he now knew more about them than did any other German—a fact that had far-reaching consequences for both the Royal Air Force and the Laftwaffe.'

অর্থাৎ ব্রিটিশ গোয়েন্দা-বিভাগ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করছে—ভন ওয়েরার কাছ থেকে তারা কোনভাবেই কোন গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি, পক্ষান্তরে তাদের গোপন তথ্যই বরং ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। বন্দীর কাছ থেকে কী কী কায়দায় ওরা খবর বার করার চেষ্টা করে তা জেনে গিয়েছিল ওয়েরা। তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। মিত্রপক্ষের বন্দিশালা থেকে পালিয়ে জার্মানীতে ফিরে গিয়ে ওয়েরা দুটি কাজ করেছিল: এক নম্বর, জার্মান গোয়েন্দাদের সে শিখিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্টারোগেশনের নানান কূটকৌশল, সে পদ্ধতি ওরাও চালু করে। দু নম্বর, সে জার্মান পাইলটদের শেখাতো কী-ভাবে এই প্রশ্নোত্তরের মায়াজাল ভেদ করে উল্টোপাল্টা জবাবে ইণ্টারোগেটারকে বিভ্রান্ত করা যায়।

চারজনের ভন ওয়েরার কীর্তি-কাহিনী যখন পড়ি, তখন মনে হয়, —আচ্ছা, এ সম্ভাবনার কথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন উইলবার এবং অরভিল রাইট? তাঁরা কি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন তাঁদের অতন্দ্র সাধনার ফলশ্রুতি এভাবে লাভ করবে শত্রুপক্ষের ঐ দুর্ধর্ষ বৈমানিক? ভয়-ডর কাকে বলে যে জানে না; আকাশপথে এয়ারক্রাফ্‌ট নিয়ে যে খেলনার মত খেলতে পারে?

কিন্তু তাই বা ভাবছি কেন? জার্মান বৈজ্ঞানিক অটো লিলিয়েঁথাল যখন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার পূর্ব-মুহূর্তে বলেছিলেন—'কোন কিছু পেতে হলে দাম তো দিতেই হবে' তখন কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন সেই 'কোন কিছুটা' হতে পারে ফ্লাইট লেফটানেন্ট রিচার্ড হিলারী—সেই যে সুদর্শন ছোকরা কৈশোরে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখত বসে বসে, আর যৌবনে পদার্পণ করেই যে লিলিয়েঁথালের স্বদেশবাসীকে একের পর এক গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করছে।

তাহলে? তাহলে কি লাভ হল এত লোকের আত্মদানে? কি পেলাম আকাশে উড়ে? এ বিহঙ্গ-বাসনার চরিতার্থতায় কে কী পেল? কোন শত্রুকে বধ করতে চাই আকাশমার্গে? ভন ওয়েরা আর রিচার্ড হিলারী ওদের দুজনকেই যে ভালবাসতে ইচ্ছা করে। এরা তো আমার শত্রু নয়! দুজনেই যে আমার বন্ধু! তাহলে?

স্বপ্নমঙ্গলের এই হিংটিংছটের জট কেমন করে ছাড়াব?

ভন ওয়েরাকে স্থানান্তরিত করা হল 'গ্রিস্‌ডেল হল'এ। আইরিশ সমুদ্রের উপকূলভাগ থেকে পাক্কা কুড়ি মাইল দূরে জন-মানবহীন মুরল্যাণ্ডে 'গ্রিস্‌ডেল হল' একটা প্রকাণ্ড দুর্গপ্রতিম প্রাসাদ। দ্বিতলবাড়ি, গোটা চল্লিশ কামরা, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। দূরে দূরে প্রহরীর ঘর, সেখানে তিন শিফ্‌ট-এ চব্বিশঘণ্টা মেশিনগানধারী প্রহরী বসে থাকে অতন্দ্র প্রহরায়।

যুদ্ধের ইতিহাসে গ্রিস্‌ডেল হল-এর একটি রেকর্ড আছে। সার থেকে কোন বন্দী কখনও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। জার্মান ইউ-বোট কমাণ্ডার ওয়ার্নার লট-ই একমাত্র দুঃসাহসী যিনি তা সত্ত্বেও সে চেষ্টা করেছিলেন। কাঁটাতারের বেষ্টনী অতিক্রম করার আগেই তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল মেশিনগানের গুলিতে। প্রহরীরা ইচ্ছা করেই মৃতদেহ অপসারণ করতে দেরী করেছিল, যাতে অন্যান্য বন্দীরা বুঝে নিতে পারে পলায়ন-প্রচেষ্টার অনিবার্য পরিণাম! রীতিমত দুর্গন্ধে সে সংবাদ সারা ক্যাম্পে প্রচার হবার পর ওয়ার্নার মাটির বুকে ফিরে গিয়েছিলেন।

ভন ওয়েরা ওখানে পৌঁছেই সে খবর শুনল। কিন্তু ওর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি মলিন হল না। বললে, এর পর আর কেউ চেষ্টা করেনি?

: না। এখানে পাগল তো কেউ নেই?

: আই সী!

আগমনের দশ দিন পরে ওয়েরা দেখা করল মেজর ফালেনসার সঙ্গে। বললে, হের মেজর! আমাকে সাহায্য করতে হবে। আমি পালাব!

মেজর ডাবলু. ফালেনসা হচ্ছেন বন্দীদলের প্রধান, পদমর্যাদায় এবং বয়সে। ধমকে ওঠেন তিনি: তোমার কি মাথা খারাপ?

: না, হের মেজর! আপনি আমার পরিকল্পনাটা শুনুন আগে।

আদ্যোপান্ত শুনে মেজর ফ্যালেনসা বললেন, না হে। একেবারে আষাঢ়ে পরিকল্পনা নয়।

একদিন অন্তর একদিন বন্দীদের সকাল সাড়ে দশটার সময় মার্চ করিয়ে কিছু দূরে নিয়ে যাওয়া হত। বন্দীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই এ ব্যবস্থা। টানা আড়াই মাইল ওদের মার্চ করিয়ে একটা জায়গায় দশ মিনিটের বিশ্রাম। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন। একদিন ওদের নিয়ে যাওয়া হত উত্তরমুখো, পরদিন দক্ষিণ পানে। বন্দীরা সর্বমোট চব্বিশজন, তাদের প্রহরায় থাকে সামনে চারজন, পিছনে

চারজন, পাশে পাশে মেশিনগানধারী প্রহরী। এর ভিতর থেকে পালানোর কথা এতদিন কেউ চিন্তা করেনি, কিন্তু ভন ওয়েরা করল।

উত্তর দিকে গেলে যেখানে ওরা বিশ্রাম নেয় সেখানে চারিদিকে খুব উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। বরং দক্ষিণ দিকের বিশ্রামস্থলের এক প্রান্তে আছে একটা পাথরের দেওয়াল, ফুট সাতেক উঁচু। ভন ওয়েরার ধারণা দশ সেকেণ্ড মত সময় প্রহরীদের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট করা গেলে সে ঐ দেওয়ালটা টপকাতে পারবে।

হিসাবমত দেখা গেল অমাবস্যা তিথিতে ওদের দক্ষিণ দিকে যাওয়ার কথা। মেজর ফ্যালেনসা ক্যাম্প কমাণ্ডারকে অনুরোধ করলেন ব্যায়ামের ঐ সময়টা বদলাতে। সকালে তিনি বন্দীদের গ্যেটে পড়াতে চান, ব্যায়ামটা বিকালে হলে ভাল হয়। গ্যেটের খাতিরে কিনা বোঝা গেল না, ক্যাম্প কমাণ্ডার এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি মেজর ফ্যালেনসা ভন ওয়েরাকে পলায়ন-মুহূর্ত থেকে গোটা একটা অমাবস্যার রাত উপহার দিতে চান।

অবশেষে উপস্থিত হল নির্দিষ্ট তিথি। বন্ধুরা তাদের 'রেড-ডেভিল'কে নিজ নিজ রেশন থেকে উপহার দিল কিছু বিস্কুট আর চকোলেট—তার পলাতক জীবনের পাথেয়। আড়াই মাইল মার্চ করে ওরা এসে পৌঁছলো সেই নির্দিষ্ট বিশ্রামস্থলে। বন্দীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। দুজন-চারজন করে জটলা পাকায় দশ মিনিটের জন্য। কেউ সটান শুয়ে পড়ল ঘাসের উপর। প্রহরীরাও নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরায়।

নিতান্ত ঘটনাচক্রেই বলতে হবে, এই সময়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিল একজন মেওয়াওয়ালা, ঠেলাগাড়ি করে আপেল নিয়ে। কোথাও কিছু নেই, জন দুয়েক বন্দী ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। আপেল কেড়ে খাবে। আপেলওয়ালা প্রতিবাদ করবার আগেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন মেজর ফ্যালেনসা। পাঁচ-সাত সেকেণ্ডের ব্যাপার—

ইতিমধ্যে বন্দীদলের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেছে—একদল মেওয়া-ওয়ালার পক্ষে, একদল বিপক্ষে। মুহূর্তে প্রহরীদল এসে ওদের তফাতে সরিয়ে দেয়। ঝগড়া বাধাতেও যেমন, মেটাতেও তেমন। ডাকাত-বন্দী এসে ক্ষমা চাইল আপেলওয়ালার কাছে, মেজর ফ্যালেনসার মধ্যস্থতায়। দুজনে করমর্দন করল। আপেলওয়ালা জার্মান-ছোকরার দুষ্টুমিতে খুশি হয়ে আপেলটা তাকেই খেতে দিল। মিটে গেল ঝঞ্ঝাট!

ইতিমধ্যে দশ মিনিট কেটে গেছে। প্রহরী সর্দার হুকুম দিল ওদের সার বেঁধে দাঁড়াতে। হঠাৎ প্রহরী সর্দারের নজর হল প্রায় আধ-মাইল দূরে মাঠের ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে দুটি গ্রামের মেয়ে হাত নেড়ে চীৎকার করে কি যেন বলতে চাইছে। মেয়ে দুটি স্পষ্ট দিনের আলোয় দেখতে পেয়েছে ঝুটোপুটির সুযোগ নিয়ে একজন বন্দী তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠেছিল ঐ পাথরের পাঁচিলটায়। লাফ দিয়ে নেমেছিল উল্টোদিকে। সে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। মেয়ে দুটি তাকে তখনও দেখতে পাচ্ছে, পাঁচিলের আড়াল পড়ায় প্রহরীরা তা দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ আপেল-চোর বন্দীর মাথায় বুদ্ধি খুলে গেল—সেও হাত নেড়ে নেড়ে ঐ দুটি মেয়ের উদ্দেশে চীৎকার করে জার্মান ভাষায় প্রেম-নিবেদন শুরু করে দিল: ও আমার সোনামণি রে! অত দূর থেকে কি আপেল খাওয়া যায় রে? ভাগ চাস তো কাছে আয় না রে! রোজ দূর থেকেই তোদের দেখি রে! দূর থেকে কেন হাত নাড়িস রে? কাছে আয় না রে! আপেল ছেড়ে তোকেই খাব রে!

সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে! প্রহরী সর্দার অল্প অল্প জার্মান জানে। সেও হেসে ফেলে।

আসল ব্যাপারটা চাপা পড়ে।

বন্দীদল মার্চ করে ফিরে চলেছে। মাঠের ও-প্রান্ত থেকে মেয়ে দুটি তখনও চেঁচাচ্ছে। এ তো মহা যন্ত্রণা! কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ 'মার্চিং সঙ' শুরু করে দিল একজন। অমনি সকলে কোরাস-এ

যোগ দিল। এটাও পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী। ওয়েরারই ফন্দী। স্থির হয়েছিল, একটা নির্দিষ্ট যৌথ সঙ্গীত শুরু হলে পলাতক বুঝবে তার অনুপস্থিতিটা তখনও জানাজানি হয়নি। কিন্তু মার্চের সময় গান গাওয়া মানা। প্রহরী প্রতিবাদ করল। কেউ কর্ণপাত করল না। প্রহরী সর্দার বার বার গর্জন করে আদেশ দিল গান থামাতে; কিন্তু ওরা দ্বিগুণ জোরে শুরু করে দিল যৌথ সঙ্গীত। ওদিকে মাঠের ওপ্রান্তে মেয়ে দুটি তখনও আপ্রাণ চিল্লাচ্ছে! হঠাৎ কি খেয়াল হল সার্জেন্টের! সে ওদের গুন্‌তি শুরু করল। এর প্রতিষেধকও স্থির করা ছিল। বন্দীরা বারে বারে লাইন ভেঙ্গে এগিয়ে-পিছিয়ে যাচ্ছে —যাতে ঠিকমত গুন্‌তি করা না যায়।

সার্জেন্টের সন্দেহ এতক্ষণে ঘনীভূত হয়েছে। মাজা থেকে রিভালভারটা বার করে সে মেজর ফ্যালেনসার বুকের সামনে ধরে কঠিন কণ্ঠে বললে: ক্লাস হল্ট!

থামতে হল ওদের। সার্জেন্ট গুন্‌তি শুরু করল এবার: দুই··· চার···ছয়·আট···

একবার, দুবার! না, ভুল নেই—বন্দীদলে একজন অনুপস্থিত! এসেছিল চব্বিশজন, ফিরে যাচ্ছে তেইশজন!

সেই চতুর্বিংশতিতম বন্দী রেড-ডেভিল ওয়েরা ইতিমধ্যে পনেরটি মিনিট সময় পেয়েছে। পনের মিনিটে সে দেড় মাইল জনহীন প্রান্তর পার হয়ে ওপারের ঘন পাইন বনে বিলীন হয়ে গেছে।

সে রাত্রে 'গ্রিস্‌ডেল হল' বন্দী-শিবিরে কারও চোখে ঘুম ছিল না। মুহুর্মুহুঃ পুলিশের গাড়ি, মিলিটারি ভ্যান, ব্লাড হাউণ্ডের দল সমস্ত এলাকাটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছে; কিন্তু সারারাত্রের মধ্যে পলাতক বন্দীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

পরদিনও নয়। এবং তার পরের দিনও নয়।

তিনদিন তিনরাত্রি অতিবাহিত হয়ে যাবার পর ওরা ধরে নিল ওয়েরা জঙ্গলে কোথাও গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে, অথবা কেউ তাকে আশ্রয় দিয়েছে, লুকিয়ে রেখেছে। বাস্তবে দুটোর একটাও

কিন্তু সত্য নয়। অস্নাত অভুক্ত ভন ওয়েরা একশ' এক ঘণ্টা ধরে লুকিয়ে বসে ছিল একটা পরিত্যক্ত ভাঙা কুটিরে। প্রচণ্ড শীতের রাত্রে সাহস করে সে আগুনটুকু পর্যন্ত জ্বালায়নি।

চতুর্থ দিনে ধরা পড়ল ওয়েরা। রাত এগারোটার সময়। তীব্র একটা টর্চের আলো এসে পড়ল তার মুখে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই এগিয়ে এল একটা রাইফেলের নল। দুজন ব্রিটিশ হোমগার্ড তাকে দুদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। ও উঠে দাঁড়াবার আগেই একজন ওর কব্জিতে শক্ত করে বেঁধে দিল একগাছা দড়ি।

সিনেমার নায়ক ছাড়া এ অবস্থায় কেউ পালাবার চেষ্টা করে না। 'গানস্ অফ নাভারোন' চিত্রে পরিচালকের বদান্যতায় এ্যান্টনি কুইন নাৎসী পুলিশের বিরুদ্ধে যে কেরামতিটা দেখিয়েছিল, অবিকল সেই কসরৎটাই দেখাল এবার নাৎসী ভন ওয়েরা। জোড়াপায়ে রাইফেলধারীর তল পেটে মারল লাথি এবং একই সঙ্গে তার সঙ্গীর হাতের টর্চটা নিল ছিনিয়ে। হাত-পা একযোগে কাজ করত তার। বৈমানিক সে। আজ্ঞে হ্যাঁ, এ বিবরণ ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স থেকেই সংগৃহীত।

রাতের অন্ধকারে পুনর্বার মিলিয়ে গেল ওবার লেফটানেন্ট ভন ওয়েরা; তিনদিনের অনশন-জর্জরিত: টেরার অফ দ্য আর. এ. এফ.।

আরও দুদিন পরে একজন মেষচারক এসে মিলিটারি ক্যাম্পে খবর দিল ডাডন উপত্যকার এক নির্জন পার্বত্য গুহায় একটা লোককে সে লুকিয়ে থাকতে দেখেছে। লোকটার একমুখ দাড়ি, ছেঁড়া প্যান্ট, শরীর খুব দুর্বল—মনে হয় অনেকদিন অভুক্ত আছে সে। ও নাকি দূর থেকে দেখেছে। তৎক্ষণাৎ কুড়িজন মেশিনগানধারী বীরপুরুষ মিলিটারী ট্রাকে করে রওনা হয়ে গেল। চারদিক থেকে পাহাড়টাকে ঘিরে ফেলল ওরা। ছয়দিন উপবাসের পর একা ভন ওয়েরা খালিহাতে কিছুই করতে পারল না। ধরা পড়ল।

তিন সপ্তাহের নির্জন কারাবাস। মানুষটাকে চেনা যায় শুধু তার হাসিতে।

ইতিমধ্যে আরও নিরাপদ শিবিরে তাকে আটক রাখার অভিপ্রায়ে ওকে সরিয়ে আনা হল 'গ্রিস্‌ডেল হল' থেকে সোয়ানউইক-এ।

সোয়ানউইক ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে সবচেয়ে সুরক্ষিত বন্দী-শিবির। চারদিকে দুই সারি কাঁটাতারের বেড়া—প্রতিটি দশফুট উঁচু। দিবারাত্র তাতে ইলেকট্রিক কারেণ্ট চার্জ করা থাকে, মাটি থেকে তিন ফুট উঁচুতে। নিচের তিন ফুটে বিদ্যুৎ প্রবাহ না থাকার কারণ, ঐ দুইসারি কাঁটাতারের গলিপথে ছাড়া থাকে সুশিক্ষিত ব্লাড হাউণ্ডের দল। দেড়শ' ফুট তফাৎ তফাৎ গুমটি ঘর। তার মাথায় সার্চ-লাইট, ভিতরে দূরবীণ হাতে লং-রেঞ্জ রাইফেল ও অটো-মেটিকধারী প্রহরীর দল। তিন শিফট-এ চব্বিশ ঘণ্টার নিরবচ্ছিন্ন প্রহরা-ব্যবস্থা।

এখান থেকে পালাবার কথা যে ভাবে সে হয় বদ্ধ উন্মাদ, নয় ভন ওয়েরা।

বন্দিশালার কমাণ্ডার ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। ওর রেকর্ডটা দেখে একগাল হেসে বললে, সুস্বাগতম্। আপনি যে আসছেন তা আগেই খবর পেয়েছি। আমাদের আপ্যায়নে কোন ত্রুটি নেই, ব্যবস্থাপনাটা আশা করি ঘুরে দেখে নিয়েছেন? ও—ভাল কথা। আপনার কাছে স্কোয়াড্রন লীডার হক্‌সের এক বোতল শ্যাম্পেন পাওনা হয়েছে, না? কবে আমরা আপনার স্বাস্থ্যপান করছি?

শীর্ণকায় ভন ওয়েরাও একগাল হাসল। বললে, হের মেজর। আপনি দু-দুটো ভুল করছেন। প্রথমত স্কোয়াড্রন লীডার হক্‌স আমার চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপ্ট করেননি। দ্বিতীয়ত আমার সর্ত ছিল ছয় মাসের মধ্যে পালাব। এখনও চার মাস বাকি!

ক্যাম্প কমাণ্ডার গোঁফ চুমড়ে বলেন, বটে! তুমি তো খুব রসিক ছোকরা হে! তা তুমি কি আমার সঙ্গেও ঐ সর্তে বাজি রাখতে রাজী আছ? এই সোয়ানউইক থেকে?

: শ্যিওর। এক বোতল ম্যাগনাম-সাইজ শ্যাম্পেনের বদলে এক প্যাকেট সিগ্রেট।

: সাট আপ য়ু ইনসোলেণ্ট ম্যাডক্যাপ!—এই, কে আছিস? একে নিয়ে যা।

দুজন প্রহরী ওর বাহুমূল ধরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ে ওয়েরা, ওখান থেকেই বলে, এই দেখুন স্যার, আপনিও খামকা চটে গেলেন। ফ্রম এ স্পোর্টসম্যান টু এ স্পোর্টসম্যান! আপনিও কিন্তু চ্যালেঞ্জাটা এ্যাকসেপ্ট করলেন না হের মেজর!

প্রত্যুত্তরে গর্জন করে ওঠেন বন্দী-শিবিরের রক্ষক: টেক হিম এ্যাওয়ে—

নির্জন ঘরের নিঃসঙ্গতায় ভন ওয়েরা বসে ভাবে তার ছাব্বিশ বছরের জীবনটার কথা। যুদ্ধ বাধার বছর চারেক আগে সে নাম লিখিয়েছিল 'লাফতাফ'-এ। বস্তুত ঐ দুর্ধর্ষ বিশ্বত্রাস লাফতাফের জন্মমুহূর্ত থেকেই সে যুক্ত আছে বৈমানিকের কাজে। ঢুকেছিল একুশ বছর বয়সে, এখন সে জার্মানীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈমানিক। বিমানবাহিনীর একাধিক প্রাইজ সে পেয়েছে, পেয়েছে খাতির, সম্মান এবং অর্থ। বিমান নিয়ে কায়দা দেখাতে তার জুড়ি নেই। সখ করে সে ব্রীজের তলার ফাঁক দিয়ে উড়ে আসে, অহেতুক আকাশে ডিগবাজি খায়। শহরের সবচেয়ে জনবহুল রাস্তার ক্রশিং-এর কেন্দ্রবিন্দুতে সে দশ হাজার ফুট উপর থেকে ভেঙে পড়ার অভিনয় করে। রাস্তার লোকজন যখন চীৎকার চেঁচামেচিতে সড়কটা সরগরম করে তোলে, রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম করে ড্রাইভারের দল

ঊর্ধ্বমুখে ওর পাক খেতে খেতে পড়ার দৃশ্য দেখে, তখন ও হঠাৎ সোজা হয় আর উড়ে পালায়! এজন্য দু-একবার মৃদু ভর্ৎসনাও শুনতে হয়েছে তাকে। তবে পাগলা ওয়েরাকে কেউ বড় একটা ঘাঁটায় না। ওর আর একটা প্রিয় খেলা ছিল তার গার্ল ফ্রেণ্ডের বাড়ির কার্নিস-ছুঁয়ে বিমান ওড়ানো। নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েটি এগারোতলা বাড়ির ছাদে জলের চৌবাচ্চাটার উপর উঠে রুমাল নাড়ত। আর ওয়েরা তার দশ-পনের ফুট কাছ দিয়ে উড়ে যাবার সময় ককপিট থেকে ছুঁড়ে দিত চকোলেট বার। পাড়ার লোক ভীড় করে দেখতে আসত ওর সেই মৃত্যুমুঠোয় নিয়ে অদ্ভুত খেলা। সব কিছুতেই তাব বাহাদুবী দেখানো চাই! আর পাঁচজন কুকুর, বেড়াল, পাখী পোষে-ও পুষেছিল সিংহের বাচ্ছা—সিম্বাকে। মিত্রপক্ষের রিপোর্টে এজন্য তাকে বারে বারে ভেনগ্লোরিয়াস, অহমিকায় ভরা বলা হয়েছে, আসলে এগুলো ছিল তার তারুণ্যের সেফ্‌টি-ভাল্ব! যুদ্ধ বাধাব পর এসব পাগলামি সত্ত্বেও তার কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে সমব-দপ্তব তাকে 'নাইটস্-ক্রশ' উপাধি দেবার কথা ঘোষণাও করেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সামরিক অনুষ্ঠানের আগেই সে শত্রুহস্তে বন্দী হয়েছে। দিবারাত্র সে শুধু ভাবে—তাকে পালাতে হবে, ছয়মাসের মধ্যেই। বার্লিনে স্বয়ং ফ্যুরার স্বহস্তে তাকে ঐ দুর্লভ সম্মান দেবার জন্য যে প্রতীক্ষা করছেন! যুদ্ধ শেষ হবার আগেই সেটা ওকে পেতে হবে। এই ওর জীবনের লক্ষ্য! আপাতত।

সোয়ানউইক বন্দিশালায় সে সময় সর্বসমেত দেড়শ'জন বন্দী ছিল। পালাবার চেষ্টা তো দূরের কথা, চিন্তাই কেউ করেনি। সবাই ধরে নিয়েছিল, সেটা অসম্ভব। পর পর দুই সারি কাঁটাতারের বেড়া, দশ ফুট উঁচু। সেই তার আবার ছোঁয়া যাবে না,—বৈদ্যুতিক তার। তার উপর দুই সারি কাঁটাতারের মাঝখানে ছাড়া থাকে ব্লাড-হাউণ্ডের দল। সর্বোপরি, মাত্র দেড়শ' ফুট তফাৎ তফাৎ ওয়াচ টাওয়ার। সেখানে তিন শিফটে অতন্দ্র পাহারা।

ভন ওয়েরা যখন একদিন পালাবার প্রসঙ্গটা তুলল, সবাই হেসে ওঠে। কিন্তু বন্দীদলে সবসময়েই থাকে দু-চারজন দুঃসাহসী। দু-চার দিনের ভিতরেই তেমনি কয়েকজনকে দেখা গেল ওর সঙ্গে ঘুর-ঘুর করতে। তারা আকৃষ্ট হল, মন দিয়ে শুনল ওয়েরার পরিকল্পনা। ক্রমে তার প্ররোচনায় বন্দী-শিবিরের ভিতরে অতি সঙ্গোপনে জন্ম নিল একটি গোপন সংস্থা। ওদের ভাষায় Swanwick Tiefban AG. অর্থাৎ সোয়ানউইক মাইনিং কোম্পানি। মাইনিং কেন? খনির সঙ্গে ওদের এ প্রচেষ্টার সম্পর্ক কি? সম্পর্ক ছিল। কূটকৌশলী ভন ওয়েরার পরিকল্পনা হচ্ছে ঐ বন্দী-শিবির থেকে গর্ত খুঁড়ে দু-সারি কাঁটাতারের বেড়ার রাজ্য ভূগর্ভ-পথে পার হয়ে একেবারে ওপারে পৌঁছনো।

তারুণ্যের তাগিদে ভন ওয়েরা পৃথিবীর বুক থেকে একদিন উঠেছিল আকাশে। আকাশটাকে সে গুলে খেয়েছে! আজ সে বিপরীত পথের অভিসারী। সে যেতে চায় পাতালে। আসলে পথটা তো উপলক্ষ্য—লক্ষ্য হচ্ছে মুক্ত পৃথিবী।

ইস্কাবনের টেক্কার হিসাবটি নিখুঁত: তাদের নৈশ আবাস থেকে গর্ত খুঁড়ে দু-ফের্তা কাঁটাতারের বেড়াব তলা দিয়ে ওপারে উঠতে হলে পাক্কা বিয়াল্লিশ ফুট গর্ত খুঁড়তে হবে। ওয়েরার মতে গর্তটা শুরু হবে ব্যারাকের একটি পরিত্যক্ত ঘরের মেঝে থেকে। ঘরটা ইঁদুরের আড্ডা, অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে অনেকদিন। তার চারপাশে প্রচুর রাবিশও জমেছে। এটা সুলক্ষণ, রাবিশের উচ্চতা দৈনিক দু-এক ইঞ্চি বাড়লে তা নজরে পড়বে না। দুর্ভাগ্যক্রমে গর্তটার নির্গমনমুখ থাকবে একটি ওয়াচ্ টাওয়ারের প্রায় মুখো-মুখি। তা হ'ক, ওখানে কিছু আগাছা জন্মেছে—কিছুটা আড়াল হবে তাতে।

ভন ওয়েরা নিখুঁতভাবে ছকে ফেলল তার পরিকল্পনা। ওর সঙ্গে যোগ দিল আরও চারজন, তার মধ্যে মেজর ক্র্যামার হচ্ছেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ। স্থির হল দুজন যাবে গ্লাসগো, দুজন জুড়ি বেঁধে

লিভারপুল। তারা ঐ দুটি বন্দর থেকে কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজে চেপে পালাবে—আর ভন ওয়েরা যাবে একা।

ওরা পাঁচজনে পালা করে গর্তটা খুঁড়তে থাকে। অতি সাবধানে, রক্ষীদলের নজর এড়িয়ে। রাবিশ যা উঠে আসে তা রাত জেগে গুঁড়ো করে। হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। গর্তটার ব্যাস মাত্র দেড় ফুট। বুকে হেঁটে সাপের মত পার হতে হবে বিয়াল্লিশ ফুট পথ। ওরা যখন গর্ত খোঁড়ে ওদের বন্ধুরা তখন গান-বাজনা, হৈ-হুল্লোড় করে, তাসের আড্ডা জমায়। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে মেপে দেখা গেল গর্তটা বিয়াল্লিশ ফুট দীর্ঘ হয়েছে। অর্থাৎ অজান্তে যদি এঁকে-বেঁকে না গিয়ে থাকে তবে এবার উপরে উঠলেই আকাশ!

ইতিমধ্যে মেজর ক্র্যামার তাঁর একটি হীরের আংটি মাত্র এক পাউণ্ডে বেচে দিলেন একজন ইংরাজ প্রহরীর কাছে। ওরা পাঁচজনে সেটা সমান ভাগ করে নিল। মাথা পিছু চার শিলিং। মুক্তিপথের সর্বমোট পাথেয়!

দিন স্থির হল অমাবস্যার কাছাকাছি যে কোন একটা রাত—যে রাতে সন্ধ্যার দিকে সাইরেন বাজবে! কারণ, বিমান-আক্রমণের ধ্বনি হলে ওয়াচ্ টাওয়ারে সার্চ লাইট জ্বালানো যাবে না। আর সন্ধ্যারাত হলে গোটা রাতটা হাতে পাওয়া যাবে। পরদিন সকাল ছটার সময় গুন্তি হওয়ার আগে খবরটা জানাজানি হবে না।

মেজর ক্র্যামার প্রশ্ন করেন, তুমি কি স্থির করলে ওয়েরা? কোন্ বন্দরে গিয়ে জাহাজ ধরবে?

ওয়েরা অম্লানবদনে বললে, না হের মেজর, আমি জাহাজে পালাবার কথা আদৌ চিন্তা করছি না। যেতে হলে প্লেনেই যেতে হবে!

: সেটা কেমন করে সম্ভব?

: সম্ভব করতেই হবে। জাহাজে অনেক বখেড়া।

স্বল্পভাষী মেজর ক্র্যামার আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেননি।

ওয়েরা কিন্তু তার পরিকল্পনা আদ্যোপান্ত ছকে ফেলেছিল, মনে মনে। কাউকে কিছু বলেনি।

ইতিমধ্যে সে একটা ফ্লাইং স্যুটও জোগাড় করে ফেলেছে। কারাপ্রাচীরের বাইরে পৌঁছেই সে একজন ওলন্দাজ পাইলটের ভেক ধরবে। গল্পটা হবে এইরকম: মিত্রপক্ষের হয়ে প্লেন নিয়ে সে আকাশযুদ্ধ করছিল—প্লেন ভেঙে মাটিতে পড়েছে। এটা খুব কিছু অবিশ্বাস্য মনে হবে না—কারণ, যুদ্ধের সেই পর্যায়ে অনেক চেক, ওলন্দাজ, নরওয়েবাসী এবং পোলিশ পাইলট ইংলণ্ডের মূল ভূখণ্ড থেকে মিত্রপক্ষের হয়ে লড়াই করছে। তাদের য়ুনিটের নামও জানা আছে 'মিক্সড স্পেশাল বম্বার স্কোয়াড্রন, কোস্টাল কমাণ্ড'। ওলন্দাজদের ভাষা সে জানে না, কিন্তু সেটা ধরবে কোন্ শা—! ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতেই সে কাজ হাসিল করবে। একমাত্র অসুবিধা হচ্ছে সনাক্তকরণ কাগজপত্রের। ওর কাছে আইডেন্টিটি কার্ড থাকা চাই, এবং ভালকানাইজড্ ফাইবারের তৈরি আইডেন্টিটি ডিস্ক বা গোলাকৃতি চাকৃতি গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। ভালকানাইজড্ ফাইবার বেচারা কোথায় পাবে জেলখানার ভিতর? তাই পিসবোর্ড কেটে একটা নকল চাকৃতি বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নেবার ব্যবস্থা সে করেছিল। অল্প আলোয় দূর থেকে সেটাকে জাল বলে সহজে বোঝা যেত না। কোনক্রমে ওলন্দাজ বৈমানিকের পরিচয়ে সে যদি একটা আর. এ. এফ. বিমান-বন্দরে পৌঁছতে পারে, আর হাতের কাছে পেট্রোলভর্তি একটা প্লেন পায়, তাহলেই কেল্লা ফতে! ককপিটে উঠে বসলে কার বাবার সাধ্য ওকে তাড়া করে ধরে? আধঘণ্টার মধ্যে সে অবতরণ করবে বার্লিন এয়ার-ফিল্ডে। এ একেবারে নির্ঘাৎ!

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪০। কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি। রাত নয়টার সময় ককিয়ে উঠল সাইরেন। আঃ, কি মিষ্টি আওয়াজ! যেন স্বদেশগামী কোন জাহাজের ভোঁ! সাইরেন বাজতেই নিভে গেল ওয়াচ্ টাওয়ারের সার্চ-লাইট। তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেওয়া হল এক

ডজন ব্লাড-হাউণ্ডকে ঐ গলিপথে—দুই সারি কাঁটাতারের মাঝখানে। নিরন্ধ্র অন্ধকারেও তারা নাকি দেখতে পায়, গন্ধ পায়। মনে মনে হাসল ভন ওয়েরা। ব্লাড-হাউণ্ডের বাবারও সাধ্য নেই তিন ফুট মাটির তলা দিয়ে যারা বুকে হেঁটে পালাবে তাদের গন্ধ পাওয়ার।

সাইরেন বাজার দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা একে একে নেমে পড়ল সেই সুরঙ্গ-পথে। বন্ধুরা তখন কোরাসে গান ধরেছে: Muss-i denn, muss-i denn, Zum stadtele hinans! অর্থাৎ —'আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার—'

চার-পাঁচ মিনিট পরেই যেন খরগোশেব গর্ত থেকে বার হয়ে এল পাঁচটি প্রাণী। ভুট ভুট করে উঠে এল উপরে। নিরন্ধ্র অন্ধকার! নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। তা না যাক—কাঁটাতারের ওপারে ব্লাড-হাউণ্ডের দল কিন্তু ঠিক টের পেয়েছে। প্রচণ্ড চীৎকার জুড়ে দিয়েছে তারা! ওয়েরা অন্ধকাবেই ওদিকে ফিরে একবার মুখ ভ্যাঙচালো। আপন মনেই বললে, আয় না শালারা! দশ ফুট বেড়া টপকে আয়! দেখি তোদের কেরামতি!

একদল প্রহরী কুকুরদের শান্ত করছে। আলো জ্বালার উপায় নেই। আকাশে জার্মান বিমানের শব্দ। শিবিরের ভিতরে তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে জার্মান যৌথ সঙ্গীত।

প্রায় দুশ' গজ প্রাণপণ দৌড়ে ওরা পাঁচজনে এসে থামল একটা ঝাঁকড়া ওক গাছের নীচে। আধ মিনিটের ভিতরেই পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে, করমর্দন সেরে ওরা সংক্ষিপ্ত বিদায় নিল। যে-যার পথে রওনা হল। দুজন যাবে গ্লাসগো, দুজন লিভারপুল। আর ভন ওয়েরা নিকটতম আর. এ. এফ. বেস্-এ। সেটা কোন্ চুলোয় কে জানে?

বন্ধুরা চলে যাবার পরেও ওক গাছতলায় বসে রইল ওয়েরা। তার হিসাব অন্যরকম। অন্ধকারে সে তার চোখকে আরও কিছুটা সইয়ে নিতে চায়। তাছাড়া সে জানে বিমান-সঙ্কেতের ভিতরে নড়চড়া করলেই হোমগার্ডদের নজরে পড়ে যাবে। বিপদমুক্তির

সঙ্কেত হওয়ামাত্র মানুষজন নামবে পথে। তখন ভীড়ের মাঝে মিশে যাওয়া অনেক সহজ। সারাটা রাতই তো পড়ে আছে সামনে। তাড়া কিসের? কাল সকালের আগে তো আর গুন্‌তি হবে না।

বেচারি জানতো না, রাত এগারোটার সময়েই সোয়ানউইক ক্যাম্পে পাগলাঘন্টি বেজে গেছে। সেখানকার ঝাড়ুদারটা পর্যন্ত জানে: পাঁচ কয়েদী ভাগল বা!

কারণ ছিল। রাত সাড়ে দশটার ভিতরেই ধরা পড়ে গিয়েছিলেন মেজর ক্র্যামার। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে—পথের ধারে লাইট-পোস্টে হেলান দিয়ে রাখা আছে একটা ঝক্‌ঝকে সাইকেল। রাতারাতি খানিকটা পথ পাড়ি দেবার লোভ সামলাতে পারলেন না তিনি,—বিশেষ সাইকেলটায় তালা দেওয়া নেই। হাত বাড়ালেন উনি সাইকেলটার দিকে। নিতান্ত দুর্ভাগ্য তাঁর। সাইকেলের মালিক স্থানীয় দারোগাবাবু! লাইট-পোস্টে সাইকেলটিকে হেলান দিয়ে তিনি প্রকৃতির কোন আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিলেন অন্ধকারের সুযোগে।

ভন ওয়েরা শেষরাতের পুরো দেড়ঘণ্টা একটানা মাঠ পাড়ি দিয়ে পুবমুখো হেঁটে চলল। শীতের শেষরাত্রি। তার উপর ব্ল্যাকআউট আর সাইরেন। মানুষজন তো ছাড়, একটা কুকুরের পর্যন্ত দেখা মেলেনি সারা পথে। রাত সাড়ে চারটা নাগাদ সে একটা রেল-লাইনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। যাক বাঁচা গেছে। রেল-লাইন এমন মেঠো সড়কের মত অন্তহীন উদাসী নয়, তার দু প্রান্তে অনিবার্যভাবে থাকবে দুটি স্টেশান। আরও মিনিট পনের হাঁটার পর সে কী একটা স্টেশানে পৌঁছলো। স্টেশানঘরে আলো জ্বলছে। টিমটিমে আলোয় দেখা গেল স্টেশানের নাম 'কডনর পার্ক'। প্লাটফর্মে একটা মাছি পর্যন্ত নেই; কিন্তু সাইডিঙ্‌-এ একটা এঞ্জিন আপন মনে গজরাচ্ছে। ভন ওয়েরা টপ করে লাফিয়ে উঠল এঞ্জিনে।

এঞ্জিন ড্রাইভারের চোয়ালের নিম্নাংশ ঝুলে পড়ে। ঢোক গিলে বললে, কে বাবা তুমি? কী চাও?

ওয়েরা চট করে বললে, আমার নাম ক্যাপ্টেন ভন লট্, আমি একজন ওলন্দাজ পাইলট, বর্তমানে আর. এ. এফ.-এ আছি। এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে আমাকে ফোর্সড-ল্যাণ্ডিং করতে হয়েছে। আমাকে এখনই কোন আর. এ. এফ. এয়ার বেস্-এ রিপোর্ট করতে হবে। জরুরী ব্যাপার। কাছে পিঠে কোথায় টেলিফোন আছে বলতে পার?

ধড়ে প্রাণ এসেছে এতক্ষণে এঞ্জিন ড্রাইভারের। বললে, তাও ভাল! আমি বলি শেষরাত্রে এমন আচমকা···, ইয়ে, টেলিফোন? ঐ স্টেশানেই আছে। দাঁড়াও, আমার ফায়ারম্যানকে দিচ্ছি, সে আলো ধরে তোমাকে পৌঁছে দেবে।

সকাল তখন সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু টেলিফোনের নাগাল পাওয়া গেল না। সেটা মাস্টারমশাইয়ের তালাবন্ধ ঘরের ভিতর। মাস্টারমশাই সকাল ছ'টার সময় ডিউটিতে আসবেন। তার আগে নাকি কোন মালগাড়িও থামছে না। বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হল ওয়েরাকে।

ঠিক ছ'টার সময় মাস্টারমশাই এলেন। পোড়-খাওয়া প্রৌঢ় মানুষটি। মোটাসোটা দেহটা কালো ওভারকোটে ঢাকা। চোখদুটো আধবোঁজা। বেশ বোঝা যায়, তাঁর ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। ভন ওয়েরার বিমান-দুর্ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনলেন চোখদুটি একেবারে বন্ধ করে, কানে একটি পালক্ দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে। বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। এমন কি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে আসায় ঐ ওলন্দাজ বৈমানিকটিকে অভিনন্দন পর্যন্ত জানালেন না। কাহিনী শেষ করে ওয়েরা একটা গলাখাঁকারি দিল। প্রৌঢ় মানুষটি মরা পাবদা মাছের মত ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে বসেই রইলেন।

একটু নড়ে-চড়ে বসে ওয়েরা বললে, দয়া করে নিকটতম আর এ. এফ. বেস্-এ একটা ফোন করে দেবেন কি? ওরা তাহলে একটা গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

মাস্টারমশাই এবার ওভারকোটের পকেট থেকে একটি নস্যদানী বার করলেন। ধীরে-সুস্থে এক টিপ নস্য নিলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা হুক থেকে পেড়ে যন্ত্রটা মুখের কাছে আনলেন। গম্ভীর গলায় অপারেটারকে বললেন: পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্স প্লীজ!

ভন ওয়েরার শিরদাঁড়া বেয়ে কিলবিল করে একটা বিষাক্ত সাপ নেমে গেল।

পুলিশ! পুলিশ কেন?

তড়বড়িয়ে ককনি ইংরাজিতে মাস্টারমশাই পুলিশের সঙ্গে কী যে কথা বললেন ওয়েরা তার সীমিত ইংরাজি জ্ঞানে তার নাগাল পেল না। টেলিফোনটা হুকে ঝুলিয়ে দিয়ে প্রৌঢ় মানুষটি বললেন, ব্যস! এখনই এসে পড়বে।

কোনক্রমে একটা ঢোক গিলে ওয়েরা বললে, ইয়ে, পুলিশ কেন? আমি যে বললাম এয়ারোড্রোমে ফোন করতে।

বাধা দিয়ে মাস্টারমশাই বলেন, জানি, মশাই জানি। কিন্তু এসব ব্যাপারে পুলিশই ভাল। বুঝলেন না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আমি ছাঁ-পোষা মানুষ, উটকো ঝঞ্ঝাটে কেন মাথা গলাই! পুলিশ আসছে, তারাই আপনাকে পৌঁছে দেবে, যে চুলোয় যেতে চান!

উপায় নেই। সেই শীতের রাতে বসে বসে ঘামছে ওয়েরা।

আমাদের গয়াজী অথবা মোকামাঘাটের মাস্টারমশাই হলে যে ভঙ্গিতে হাঁক পাড়তেন—'এ বুধন! হেইজে দো-কাপ চায়ে ভেজ দিহ!' ঠিক তেমনিভাবে প্রৌঢ় মানুষটি গলা বাড়িয়ে চায়ের ভেণ্ডারকে অর্ডার দিলেন। চা এল। একটি কাপ টেনে নিয়ে তাতে লম্বা এক চুমুক দিয়ে মাস্টারমশাই বলেন, আর একবার

বলুন তো স্যার ব্যাপারটা। জমিয়ে শুনি। তখন ঘুমের ঘোরে ব্যাপারটা ঠিক···

কথা বলায় ওয়েরা ওস্তাদ। ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে সে জমিয়ে তুলল গল্পের আসর। মর্মান্তিক এক আকাশযুদ্ধের বর্ণনা দিল। চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মাস্টারমশাইয়ের। কে বলবে আধ-ঘণ্টা আগে এই চোখ জোড়াকেই মরা পাবদা মাছের বলে মনে হয়েছিল। হঠাৎ গলাটা খাটো করে ভন ওয়েরা বললে, হয়তো একথা আপনাকে বলা আমার ঠিক হচ্ছে না, তবু বলি, আমরা গিয়েছিলাম একটা নতুন বম্ব-সাইট টেস্ট করতে। আমার রিপোর্টটা যতশীঘ্র সম্ভব বেস্-এ পৌঁছনো দরকার। কিছু একটা করা যায় না?

মাস্টারমশাইয়ের ঘুমের ঘোর এতক্ষণে একেবারে ছুটে গেছে। একে নস্য, তায় চা এবং সর্বোপরি এমন জমাটি আকাশযুদ্ধের আষাঢ়ে গল্প! বললেন, আলবাৎ! একথা আগে বলতে হয়!

হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা হুক থেকে পেড়ে নামালেন এবং হাক্‌নেল এয়ারোড্রোমে একটা ফোন করলেন। যোগাযোগ হতেই তিনি সংক্ষেপে বিমান-দুর্ঘটনার কথাটা বললেন এবং টেলিফোনটা ওয়েরাব হাতে ধরিয়ে দিলেন সরাসরি কথা বলতে।

দুনিয়ায় এক-একটা লোক থাকে যারা সোজা কথাও বুঝতে চায় না, সব কিছুতেই অবিশ্বাস। যদি বল, 'কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম....' অমনি বলবে, কাল রাত্রে যে তুমি আদৌ ঘুমিয়েছিলে সেটা আগে প্রমাণ হ'ক। হাক্‌নেল এয়ারপোর্টের ডিউটি অফিসার হচ্ছে সেই জাতের মানুষ। নাগাড়ে সে প্রশ্ন করে চলে —কোথায় বিমানটা আহত হয়ে পড়ে, ক'টার সময়, কেমন করে সে কডনর পার্কে এল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওয়েরা বলে, লুক হিয়ার স্যার। আপনি এখনই একটা জীপ পাঠিয়ে দেবেন কি? আমার বেস্-এ এখনই খবর দিতে হবে। আপনার আর যা জিজ্ঞাস্য আছে তা সাক্ষাতেই জানাব।

: অফ কোর্স! এখনই একটা জীপ যাচ্ছে।

কিন্তু হাক্‌নেলের জীপ এসে পৌঁছনোর আগেই এল পুলিশের গাড়ি। দুজন সাদা পোশাকের গোয়েন্দা পুলিশ নেমে এল গাড়ি থেকে। একটা রোগা লম্বা, একটা মোটা বেঁটে। তাঁদের দৃষ্টিতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন বালাই নেই। নৈর্ব্যক্তিক উদাসীন যেন যুগ্ম প্রস্তরমূর্তি। হঠাৎ বেঁটেটা বললে, Sprechen Sie Deutsch?

ভন ওয়েরা হেসে ইংরাজিতেই বললে, হ্যাঁ, অল্প অল্প জার্মান ভাষা বুঝতে পারি আমি, সব ওলন্দাজই পারে।

পুলিশ অফিসারটিও হাসল। আসলে তার জার্মান ভাষার জ্ঞান ঐ একটি বাক্যেই সীমাবদ্ধ। ওর সঙ্গী লম্বুটা বললে, কোথায় তোমার প্লেনটা ভেঙে পড়েছিল বল তো ভাই?

ওয়েরা বললে, তোমার কি ধারণা, আমি তোমাদের গ্রামের জিওগ্রাফি মুখস্থ করে বসে আছি? একটা ফাঁকা মাঠ। এখান থেকে পাঁচ-সাত মাইল দূরে, এটুকুই বলতে পারি।

লম্বুটা বললে, তা বটে! তুমি কেমন করে জানবে? আচ্ছা দেখি তোমার কাগজপত্র?

: কাগজপত্র! কিসের কাগজপত্র?

: তোমার আইডেন্টিটি কার্ড, ইউনিটের নম্বর, তুমি যে সত্যিই আর. এ. এফ.-এর—

বাধা দিয়ে ওয়েরা বললে, রসিকতা করছ? জান না, কোনও বম্বার প্লেনের পাইলটকে তার কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না? একটা পুরানো বাসের টিকিট কিম্বা সিনেমা টিকিটের কাউণ্টার-ফয়েল পর্যন্ত ফেলে দিয়ে যেতে হয়। ধরা পড়লে সব যে ঐ শেয়ালমুখো নাদা-পেটা জেরিদের হাতে পড়বে।

শেয়ালমুখো নাদা-পেটা জেরি! আর. এ. এফ.-এর প্রচলিত খিস্তিটা শুনে ওরা আশ্বস্ত হল; আরও নিশ্চিন্ত হল একথা শুনে যে, ইতিমধ্যে সে হাক্‌নেল এয়ার বেস্‌-এর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে। সেখান থেকে ওকে নিতে জীপ আসছে।

বেঁটে গোয়েন্দাটা তবু স্টেশানমাস্টারকে প্রশ্ন করে, হাক্‌নেল এয়ারোড্রোম থেকে ওকে নিতে জীপ আসছে? তুমি ঠিক জান?

ঃ কেন জানব না? ও তো এখান থেকেই ডিউটি অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলল।

এতক্ষণে গোয়েন্দা-যুগলের সব সংশয় ঘুচে গেছে। ভন ওয়েরার সঙ্গে করমর্দন করে লম্বুটা বললে, কিছু মনে ক'র না, আমাদের কাজই হল মানুষজনকে সন্দেহ করা। আসলে কি হয়েছে জান, কাল রাতে এই কাছে-পিঠের জেলখানা থেকে পাঁচ-পাঁচটা শেয়ালমুখো নাদা-পেটা ভেগেছে। তাই তোমাকে এত জেরা করছি!

ওয়েরার মনে হল ওর ফ্লাইং কিট-এর ভিতর শিরদাঁড়ার কাছে সেই সাপটা এখনও আছে। নেমে যায়নি মোটেই। এখনও সির সির করছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে একটা খিস্তি ঝাড়ল।

তাতে আরও নিশ্চিন্ত হল গোয়েন্দারা। ভাবলে খিস্তিটা বুঝি ঐ পলাতক শেয়ালমুখোদের উদ্দেশেই ঝাড়িত। হেসে বললে, আর কী দুঃসাহস বেটাদের! আমার বন্ধুর সাইকেলখানা হাতাবার তালে ছিল!

ঠিক সেই মুহূর্তেই এসে পৌছল হাক্‌লেন এয়ার বেস্‌-এর জীপ। ড্রাইভার সামরিক অভিবাদন করে বললে, হাক্‌নেলের গাড়ি এসেছে স্যার।

ওয়েরা প্রত্যভিবাদন করে জীপে উঠে বসল। ড্রাইভারের পাশে। হঠাৎ তার নজর পড়ল পিছনে মেশিনগান হাতে বসে আছে একজন নির্বিকার সৈনিক।

ঃ ও কে?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে ওয়েরা।

নির্বিকারভাবে ড্রাইভারটা বলে, ও আমাদের য়ুনিটের। হাক্‌নেলেই যাচ্ছে। ওকে একটা লিফ্‌ট্‌ দিয়ে দিচ্ছি।

ওয়েরা নিশ্চিন্ত হল। ও স্বপ্নেও ভাবেনি ড্রাইভারটা তার নির্দেশমত শেখানো জবাব দিল। আসলে ঐ লোকটিকে ডিউটি

অফিসার বিশেষ কারণে জীপের সঙ্গে পাঠিয়েছে। বস্তুত ডিউটি অফিসার ওয়েরার গল্প আদৌ বিশ্বাস করেনি। তাই এত সাবধানতা। সোয়ানউইক বন্দিশালা থেকে জার্মান পি. ও. ডাব্‌লু-দের পালানোর খবরটা এখনও এসে পৌঁছয়নি হাক্‌নেলে। দূরত্বটা প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল। তা হ'ক, কিন্তু এ চৌহদ্দিতে কাল রাত্রে কোনও বিমান-যুদ্ধও যে হয়নি এ বিষয়ে ডিউটি অফিসার ওয়াকিবহাল। হাক্‌নেলে একটি শক্তিশালী রাডার যন্ত্র বসানো আছে। বিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যে কাল রাত্রে কোন বিমান-যুদ্ধ হয়ে থাকলে সেটা সবার আগে তারই জানার কথা। ডিউটি অফিসার গাড়ি পাঠিয়েছে ওকে সাহায্য করতে নয়, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে। তাই ঐ বন্দুকধারীর ব্যবস্থা। ওয়েরা এ খবর আদৌ জানে না।

এ-পথ সে-পথ দিয়ে জীপটা এসে পৌঁছল হাক্‌নেল বেস্‌-এ।

ডিউটি অফিসার ওর জন্য তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিল।

ইতিমধ্যে সে তার ঘরের ফায়ার-প্লেসে প্রচুর পরিমাণ কয়লা ঢেলেছে। ঘরটা গন্‌গনে গরম। ডিউটি অফিসার আশা করে বসে আছে এত গরমে আগন্তুক তার ফ্লাইং-কিটস্‌ খুলে বসতে বাধ্য হবে —তাহলেই দেখা যাবে নিচে তার কী জাতের ইউনিফর্ম পরা আছে।

ওয়েরা দ্বারপথে আবির্ভূত হতেই ডিউটি অফিসার বললে, ভ্যান লট্‌, নিশ্চয়? আসুন! আপনার সৌভাগ্যকে অভিনন্দন! খুব বেঁচে গেছেন যা হোক। বসুন ঐ চেয়ারটায়। হ্যাঁ, ফ্লাইং-কিট্‌টা খুলে আরাম করে বসুন। ঘরটা ভীষণ গরম।

ঘরটা সত্যই ফার্ণেসের মত গরম, কিন্তু ওয়েরা সে ফাঁদে পা দিতে পারে না। ফ্লাইং-কিটের নিচে কয়েদীর পোশাক। বললে, কী দরকার? আমি বেশ আছি। এ্যাবাডীন থেকে এখনই আমার প্লেনটা এসে পৌঁছবে। আপনাকে বিরক্ত করা নিষ্প্রয়োজন,

আমি বরং কণ্ট্রোল-টাওয়ারের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করি। পাঁচ-সাত মিনিটের তো ব্যাপার।

ঃ তার কোন দরকার নেই। আপনার প্লেন আমাদের কণ্ট্রোল-টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা মাত্র ওরা আমাকে টেলিফোনে জানাবে। ততক্ষণ বরং আপনার বিমান-যুদ্ধের কথাটা ভাল করে শুনি। টেলিফোনে সব কথা বুঝতে পারিনি।

তীক্ষ্ণধী ওয়েরা বুঝতে পারে লোকটা ওকে সন্দেহ করছে। বলে, গল্প করার মত কিছু নয়।

অমায়িক হেসে লোকটা বললে, আপনি বুঝতে পারছেন না, আমাকেও তো একটা রিপোর্ট লিখতে হবে আপনার বিষয়ে!

ওয়েরা চট করে বলে, তার কি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে? পুলিশই তো আমার আদ্যপ্রান্ত রিপোর্ট লিখে নিল।

ঃ পুলিশ! পুলিশের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করেছেন ইতিমধ্যে?

ঃ নিশ্চয়ই। এসব ব্যাপারে সর্বপ্রথমেই পুলিশে ফোন করার নির্দেশ দেওয়া আছে আমাদের।

ডিউটি অফিসার কোন জবাব দিল না। টেলিফোন তুলে নিয়ে থানায় ফোন করল। ইতিমধ্যে বেঁটে-লম্বু থানায় ফিরে গেছে। তারা স্বীকার করল। অনেকটা আশ্বস্ত হল ডিউটি অফিসার। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ যখন জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্তুষ্ট হয়েছে, তখন তার দায়িত্বটা কম। সে স্বপ্নেও ভাবেনি ওয়েরা গোয়েন্দাদ্বয়কে নিশ্চিন্ত করেছিল এয়ার বেস্-এর গল্প শুনিয়ে। তা হ'ক, তবু ডিউটি অফিসার নিয়মমাফিক কাজ করে যেতে প্রস্তুত হল। প্রথমত সে এ্যাবাডীনে একটি ট্রাঙ্ককল করে ভ্যান লটের গল্পটা যাচাই করে নেবে, দ্বিতীয়ত আগন্তুকের আইডেন্টিটি ডিস্কটা দেখে তার নম্বর টুকে রাখবে। যেন খেজুরে গল্প করছে তেমনি ভঙ্গীতে ডিউটি অফিসার প্রশ্ন করে, কাল রাত্রে এখানে কতগুলি শত্রু-বিমানের সম্মুখীন হয়েছিলেন আপনারা?

ওয়েরা বিমান-যুদ্ধের সব কিছু গুলে খেয়েছে। সে বুঝতে পারে, হাক্‌নেলের বিশ-পঁচিশ মাইলের ভিতর কোন বিমান-যুদ্ধ হলে তার পূর্ণ বিবরণ এতক্ষণে এয়ার বেস্‌-এ পৌঁছে যাবার কথা। তাই বললে, এখানে তো কোন বিমান-যুদ্ধ হয়নি। আমার এয়ার ক্রাফ্‌ট্‌-এ একটা ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। নরওয়ে থেকে এতদূর কোনক্রমে এসেছি। এখানে বাধ্য হয়ে ফোর্সর্ড-ল্যাণ্ডিং করতে হল।

তারপর যান্ত্রিক ত্রুটির এমন একটা কাল্পনিক অথচ নিখুঁত বিবরণ সে দিল যার মধ্যে কোন ফাঁক নেই।

ডিউটি অফিসার এরপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে অ্যাবাডীনের নম্বর চাইল। ওয়েরা উশ্‌খুশ করছে। ইতিমধ্যে গরম দু পেয়ালা চা এসে গেল। ডিউটি অফিসার চায়ের কাপটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে একখানা রেজিস্ট্রার বার করে বললে, আপনার আইডেন্টিটি ডিস্‌কটা দয়া করে দেখাবেন!

ওয়েরা হাসল। বললে, কিছু মনে করবেন না, আপনি একটু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত!

প্রত্যুত্তরে ডিউটি অফিসার কিন্তু হাসল না। গম্ভীর হয়েই বললে, ডিউটি ইস্‌ ডিউটি।

ওয়েরা অবশ্য এজন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। তার গলায় ঝুলছে পিস্‌বোর্ডের নকল তক্তি। সে একটু কাত হয়ে বসে, যাতে চাক্‌তিটায় ঠিকমতো আলো না পড়ে। ফ্লাইং কিট্‌-এর গলার কাছে টানা-জীপ্‌টায় আঙুল ছুঁইয়েই তার রক্ত হিম হয়ে গেল। এতক্ষণে ওর দেহের উত্তাপে আর ঘামে কাগজের তক্তিটা একেবারে ভিজে চুপ্‌সে ন্যাতা হয়ে গেছে! ত্বরিৎগতিতে বুদ্ধি খাটালো সে। জামার জীপ্‌টা আটকে গেছে! কিছুতেই খুলছে না! ডিউটি অফিসারের কিন্তু কোন তাড়াহুড়ো আছে বলে মনে হল না। স্থিরভাবে সে প্রতীক্ষা করছে।

ভাগ্যক্রমে তখনই বেজে উঠল টেলিফোন। ডিউটি অফিসার সেটা তুলে নিয়ে বললে, দিস্‌ ইস্‌ হাক্‌নেল বেস্‌ ··ইয়েস·· ইস্‌

ছ্যাট এ্যাবাডীন?···হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি! শুনুন, কাল রাত্রে আপনাদের একখানা বম্বার প্লেন:···

ভন ওয়েরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে উত্তেজনায়!

তিন-চার সেকেণ্ডের মধ্যেই সে ধরা পড়ে যাচ্ছে! নির্ঘাৎ! এখনই এ্যাবাডীন উত্তরে জানাবে—কাল রাত্রে তাদের কোন প্লেন খোয়া যায়নি, জানাবে—ওদের মিক্সড-কমাণ্ডে ভ্যান লট্ নামে কোন ওলন্দাজ বৈমানিক আদৌ নেই।

ঃ হ্যালো এ্যাবাডীন! হ্যালো এ্যাবাডীন···যাঃ! লাইন কেটে গেল!

কেটে যে যাবে তা জানত ওয়েরা। ইতিমধ্যে পা দিয়ে সে ছিঁড়ে দিয়েছে টেলিফোনের তার। ডিউটি অফিসার এখনও সেটা টের পায়নি।

জামার জীপ্‌টা এখনও খোলা যায়নি। ভন ওয়েরা বললে, এক মিনিট!

'জেণ্টেলম্যান' লেখা টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেল সে। ডিউটি অফিসার ইতিমধ্যে একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছে। হঠাৎ চালু টেলিফোনটা কেন এমনভাবে বিগড়ে গেল তাই সে পরীক্ষা করতে লেগেছে।

ওয়েরা টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেল। সশব্দে দরজাটা খুলল এবং না ঢুকেই সশব্দে সেটা বন্ধ করল। তারপর যেই দেখল ডিউটি অফিসার নিচে তারের লাইনটা পরীক্ষা করছে, অমনি স্যুট্ করে বেরিয়ে গেল বাইরে।

বারান্দায় সশস্ত্র প্রহরী। দৌড়লেই সন্দেহ হবে। দু-পকেটে দুটি হাত দিয়ে শিস্ দিতে দিতে সে এগিয়ে গেল বারান্দার ও-প্রান্তে। প্রহরীর দৃষ্টিপথের বাইরে গিয়েই দ্রুতপায়ে চলতে থাকে সে।

সামনেই লম্বা রানওয়ে; বাঁয়ে কণ্ট্রোল-টাওয়ার। মিলিটারি ট্রাক আর জীপ ছোটাছুটি করছে। সর্বত্রই কর্মব্যস্ততা। লোকজন

বড় একটা কম নয়। ডানদিকে পর-পর গোটাকতক হ্যাঙার। সেখানে একসার ঝকঝকে 'হারিকেন'। কে জানে কোন্‌টা মেরামতের জন্য এসেছে, কোন্‌টায় পেট্রোল ভরা নেই! ঐদিকে তাকাতে তাকাতে দ্রুতপায়ে সে হ্যাঙারের এলাকাটা পার হয়ে গেল। তারপরেই একটা বেড়া দেওয়া অংশ। উপরে সাইন-বোর্ডে ঘোষণা : 'রোলস্ রয়েস্ এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশান'। এখানেও একসার 'হারিকেন' ফাইটার প্লেন।

একজন মেকানিক কাজ করছিল। মুখ তুলে তাকালো সে আগন্তুককে দেখে।

: গুড মর্ণিং! আমি ক্যাপ্টেন ভ্যান লট্, একজন ওলন্দাজ পাইলট। সম্প্রতি এখানে বদলি হয়ে এসেছি। তবে হারিকেন আমি কখনও চালাইনি। এ্যাডজুটেণ্ট-সাহেব আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন ওটা নেড়ে-চেড়ে দেখতে। কোন্‌টা উড়বার মত অবস্থায় আছে?

মেকানিকটি রোলস্ রয়েস্ কোম্পানীর লোক, মিলিটারির নয়। তাই অবাক হয়ে বললে, আপনি বোধহয় ভুল জায়গায় এসেছেন। মিলিটারি শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং তো এখানে দেওয়া হয় না!

: সেকথা আমি জানি। কিন্তু এ্যাডজুটেণ্ট-সাহেব আমাকে আপনাদের কাছেই যে পাঠালেন একখানা হারিকেন নেড়ে-চেড়ে দেখতে।

: ও বুঝেছি! আমরা যেটা মেরামত করছিলাম সেটা ডেলিভারি নিতে চান?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে।

: বুঝেছি, আসুন আমার সঙ্গে।

মেকানিক ওকে নিয়ে গেল ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের কাছে। বললে, এ্যাডজুটেণ্ট একে পাঠিয়েছেন ঐ হারিকেনখানা ডেলিভারি নিতে। যেটা মেরামত হয়ে গেছে।

ম্যানেজার ওকে আপ্যায়ন করে বসালেন। বললেন, হ্যাঁ, সেটা মেরামত হয়ে গেছে, পেট্রোলও ভরা আছে। কই, ডেলিভারি নোট দিন!

ওয়েরা হাসল। বললে, আপনারা ভুল বুঝছেন। আমাকে ওটা উনি ডেলিভারি নিতে আদৌ পাঠাননি। নেড়ে-চেড়ে দেখতে বলেছেন শুধু, ওটা ঠিকমত মেরামত হয়েছে কিনা তাই দেখে আসতে বলেছেন।

ওয়ার্কস্ ম্যানেজার একটু আহত হয়ে বললে, এটা রোলস্ রয়েস্ কোম্পানির অফিস! এখানে কোন মেরামতি হলে সেটার তদারক করার প্রয়োজন হয় না!

কী মিস্টি হাসল ওয়েরা। বললে, স্যার, সেটা কি আমি জানি না? রোলস্ রয়েস্-এর নাম কে না জানে? আপনারা ক্রমাগত আমাকে ভুল বুঝছেন! আমি আগেই ওঁকে বলেছি —বিশ্বাস না হয় ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন—আমি কখনও হারিকেন ওড়াইনি। এ্যাডজুটেন্ট-সাহেব সেকথা শুনে বললেন, বাপু হে, তুমি রোলস্ রয়েস্ কোম্পানির ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের কাছে গিয়ে আমাব নাম করে বল, সেখানে একখানা হারিকেন মেরামত হচ্ছে, এতক্ষণে হয়তো হয়েও গেছে। উনি লোক ভাল, তোমাকে তার যন্ত্রপাতি সব দেখিয়ে দেবেন!

এতক্ষণে ঠাণ্ডা হলেন ওয়ার্কস্ ম্যানেজার। বললেন, সেকথা বললেই হয়! ঠিক আছে, আমাদের ভিসিটার্স বুকে সই দিয়ে আসুন আপনি।

ঃ সই দিতে হবে? কী দরকার? ওসব বরং ফিরে এসে করব।

ঃ না। ভিসিটার্স বুকে সইটা আগে করতে হবে।

অগত্যা আরও মিনিট তিনেক দেরী হল। এখন প্রতিটি সেকেণ্ড মূল্যবান। এতক্ষণে হয়তো ডিউটি অফিসার টের পেয়ে গেছে। হয়তো চতুর্দিকে তার খোঁজ শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

কোনমতে সে যদি ঐ পেট্রোলভর্তি হারিকেনটার ককপিটে উঠে বসতে পারে তাহলে কারও বাবার সাধ্য নেই তাকে রোখে। বিশ-পঁচিশখানা বিমান ওর পিছু তাড়া করলেও ও পৌঁছে যাবে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে। এটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে।

এল ভিসিটার্স বুক। ভন ওয়েরা তাতে সই দিল ক্যাপ্টেন ভ্যান লট্-এর নামে। ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের নির্দেশে একজন মেকানিক ওকে নিয়ে গেল একটি ফাইটার বিমানের কাছে। ভন ওয়েরা একলাফে উঠে বসল ককপিটে। চমৎকার যন্ত্রটা! ওর মনের মত। ফুয়েল-ইন্‌জেকশান পাম্পের সুইচটা টিপে দিল। স্টার্ট হল এঞ্জিন! কিন্তু সামনেই পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক। ওটা না সরে গেলে টেক-অফ্ সম্ভব নয়! ওয়েরা বললে, ঐ ট্রাকটাকে একটু সরিয়ে দিন।

ঃ ট্রাকটা সরিয়ে কি হবে? আপনি তো আর এখন ট্যাক্সিঈং করবেন না?

ঃ একটু করে দেখতাম!

লোকটা নেমে গেল ট্রাকটা সরাতে।

আর দুই থেকে তিন মিনিট! হে ঈশ্বর! এটুকু সময় আমাকে দিও!

কিন্তু ঐ তিন-মিনিট সময় আর পায়নি ওয়েরা। হঠাৎ উপর থেকে বজ্রগম্ভীর স্বরে কে যেন বললে ঃ হ্যাণ্ডস্ আপ্!

চম্‌কে উপর দিকে তাকাল ভন ওয়েরা।

দেখল—চক্‌চকে একটা পিস্তল উদ্যত হয়ে আছে ককপিটের উপর। তার পিছনে ডিউটি অফিসারের দুটি অচঞ্চল নীল অক্ষিতারকা!

ঃ এক চুল নড়লে খুলি উড়িয়ে দেব কিন্তু!

এক মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল এতদিনের এত প্রয়াস!

স্টেনলেস্ স্টীলের একজোড়া হ্যাণ্ডকাফ্ উঠে এল ওর হাতে। ঘণ্টাখানেক বাদে সোয়ানউইক থেকে এসে উপস্থিত হল একটা

প্রিজন ভ্যান। লোহার খাঁচায় ওকে ঢুকিয়ে দেওয়ার সময় ডিউটি অফিসার একটু ব্যঙ্গ করার লোভ সামলাতে পারলে না। বললে, নিরাপদ পৌঁছনো সংবাদটা দিও বন্ধু!

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল রেড-ডেভিল, আলবৎ! কথা দিলাম—বন্ধু বলে যখন ডেকেছ তখন মুক্ত পৃথিবীতে পৌঁছেই তোমাকে সবার আগে চিঠি দেব!

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে চট্-জলদি জবাবে। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি রেড-ডেভিল কথার পিঠে কথা মোটেই বলেনি; তার জবাবটা ছিল আন্তরিক। বস্তুত দীর্ঘ চারমাস পরে সে তার প্রতিশ্রুতি বর্ণে বর্ণে পালন করেছিল। সে প্রসঙ্গে যথাসময়ে আসা যাবে।

ভন ওয়েরার কীর্তি-কাহিনী যখন পড়তে বসি, তখন স্বতই মনে পড়ে লিলিয়াঁথাল অথবা ব্লেরিয়োর কথা। ও ক্রমাগত ধরা পড়েছে—ঠিক যেভাবে বারে বারে আছাড় খেয়ে পড়েছেন লিলিয়াঁথাল অথবা ব্লেরিয়ো। শুধু সেটুকুই নয়—ব্যর্থতা তার অদম্য উৎসাহকে গলা টিপে মারতে পারেনি। এক মুহূর্তের জন্যও সে ভোলেনি—ছয় মাসের ভিতর শত্রুপক্ষের বন্ধন ছিন্ন করে তাকে মুক্ত পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। সে যে বাজি ধরে বসে আছে!

শুধু ওবার লেফটানেন্ট ওয়েরা অথবা ক্যাপ্টেন হিলারীই নয়, যুদ্ধের ইতিহাসে এমন অসংখ্য বৈমানিকের ইতিকথা খুঁজে পাই, যাদের দুঃসাহস, অদম্য উৎসাহ, বীরত্ব, দক্ষতা অথবা আত্মদান কোন অংশেই লিণ্ডেনবার্গ, আর্মস্ট্রং অথবা য়ুরি গ্যাগারিনের চেয়ে কম নয়। তফাৎ এই যে, তাদের নাম এ্যাভিয়েশান-ইতিহাসে লেখা হবে না; তফাৎ এই যে, সারা পৃথিবীতে তাদের নিয়ে কোন সাড়া জাগেনি। ইংরাজ, জার্মান, ফরাসী, নরউইজিয়ান, মার্কিন,

জাপানী, ভারতীয়—সব, সব জাতের ইতিহাসেই আছে ঐ ধরনের অখ্যাত অজ্ঞাত বৈমানিকদের ইতিকথা।

মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে এ্যাডমিরাল তাকিজিরো ওনিশীর নাম, কিংবা বাইশ বছরের তরুণ বৈমানিক লেফটানেন্ট উকিও সাকীর কথা। উইনস্টন চার্চিলের লেখা সুবৃহৎ নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁদের নাম নেই—কিন্তু তাই বলে কি তাঁদের উপেক্ষা করা চলে? ওদের কথা এবার বলি—পৃথিবীর একেবারে অপরপ্রান্তে; জাপানের কথা। বিশ্বযুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শেষ হয়ে এসেছে জাপানের সহ্যের শেষ সীমা। মার্কিন বাহিনী প্রকাণ্ড নৌ-বহর নিয়ে তিল তিল করে এগিয়ে আসছে চির অজেয় মূল ভূখণ্ডের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে জাপানী বৈমানিকের দল যে ইতিহাস রচনা করেছিল বিশ্ব-এ্যাভিয়েশান ইতিহাসে তার উল্লেখ অপরিহার্য—চার্চিল-সাহেব যতই নীরব থাকুক না কেন!

১৯শে অক্টোবর, ১৯৪৪। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মাবালাকাট এয়ার বেস্-এ এসে থামল একটা কালো রঙের সামরিক চক্রযান। গাড়ি থেকে নেমে এলেন এ্যাডমিরাল তাকিজিরো ওনিশী। বয়স ত্রিশ পার হয়েছে, চল্লিশ পৌঁছয়নি। ছোট্ট মানুষ, দাড়ি-গোঁফ কামানো, যেন পাথর খুদে বার করা একটা দৃঢ় অচঞ্চল মর্মরমূর্তি। জাপানী বিমান-বহরের একজন দুর্ধর্ষ কর্মকর্তা—ফার্স্ট এয়ার-ফ্লিটের কমাণ্ডার। বজ্র-কঠিন সেনাপতি হিসাবেই সবাই চেনে তাঁকে, অতি অল্প লোকে খবর রাখে ওনিশী মূলত একজন কবি। তিন-চার লাইনের 'তানাকা' জাতীয় কবিতা রচনা তাঁর একমাত্র বিলাস। নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণের ভিতর তিনি নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে ডায়েরিতে তিন-চার লাইনের কবিতা লিখে চলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই দিন-পঞ্জিকাটি দেখে অবাক হয়ে গেছে উত্তরপুরুষেরা। সেনাপতি এয়ার বেস্-এ এসেই বৈমানিকদের সমবেত হতে অর্ডার দিলেন।

২০১নং জাপ এয়ার গ্রুপের বাইশজন পাইলট সার দিয়ে এসে দাঁড়াল। দৃঢ় অচঞ্চলভাবে সেনাপতি ওনিশী বললেন, বন্ধুগণ! মহান জাপ-সম্রাটের শেষ নিরাপত্তার জন্য ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। অবিলম্বে এ্যাডমিরাল কুরিকার নেতৃত্বে আমাদের যুদ্ধ-জাহাজগুলি মার্কিন নৌ-বহরকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে; কিন্তু ওরা সংখ্যায় বেশি। তাই যুদ্ধারম্ভের আগেই তাদের সংখ্যা কিছু কমিয়ে ফেলা দরকার! সেটা পারে একমাত্র আমাদের বৈমানিকের দল—তোমরা। গতানুগতিক পদ্ধতিতে সেটা সম্ভবপর নয়। তবে উপায় আছে! একমাত্র সমাধান—

সেনাপতি তাঁর তরুণ বৈমানিদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেন। নিষ্পলকনেত্রে তারা তাকিয়ে আছে ওঁর দিকে। তারা জানতে চায়—কী সেই সমাধান! সেকথা তখনই বললেন না তিনি। বরং বললেন, বন্ধুগণ! একটা কথা খোলাখুলি বলে নিই। মাতৃভূমিকে রক্ষা করার ক্ষমতা আছে আজ একমাত্র তোমাদেরই—তারুণ্যে ভরপুর শুধুমাত্র তোমাদের! মূল ভূখণ্ডে বসে যেসব মন্ত্রীর দল আর বড় বড় সেনাপতিরা পাঁয়তারা ভাঁজছেন, অথবা আমার মত যাঁরা বক্তৃতা ঝাড়ছেন তাঁদের মুঠোর মধ্যে আজ আর এ যুদ্ধ নেই। হাওয়া পাল্‌টে গেছে। এখন জাপানকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র—'কামিকাজে'!

কামিকাজে! তার অর্থ? অর্থ প্রাঞ্জল—আত্মঘাতী বাহিনী। 'কামিকাজে' শব্দটার আক্ষরিক অর্থ 'স্বর্গের হাওয়া'—'অপার্থিব ইঙ্গিত'! কমাণ্ডার ওনিশীর পরিকল্পনা: প্রতিটি বিমান আড়াইশ' কিলোগ্রাম বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে উড়ে যাবে এবং সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুপক্ষের নৌ-বহরের উপর! একটি ফাইটার প্লেন এবং একজন বৈমানিকের বদলে হাজার-হাজার টনের এক-একটি যুদ্ধ-জাহাজ তার সমস্ত সমর-সম্ভার ও নৌ-সৈন্য সমেত সলিল-সমাধি লাভ করবে!

এমন আত্মঘাতী বৈমানিকের কথা ইতিপূর্বে কেউ কখনও শোনেনি। ওনিশী তাঁর বক্তব্য শেষ করা মাত্র কমাণ্ডার তামাই বললেন, এখন সন্ধ্যা ছ-টা, রাত ন-টার সময় আমার বৈমানিকেরা তাদের বক্তব্য আপনাকে জানাবে। তিন ঘণ্টা সময় তাদের দিন এ প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার জন্য।

কমাণ্ডার তামাই হচ্ছেন ওদের য়ুনিটের লীডার। এবার তাঁর অধীনস্থ বৈমানিকদের দিকে ফিরে বললেন, আমরা কাউকে বাধ্য করতে চাই না। প্রত্যেককে একখানা করে সাদা খাম ও কাগজ দেওয়া হবে। যে আত্মঘাতী হতে সম্মত সে নিজ নাম ও নম্বর লিখে খামটায় ভরে দেবে। যে যুদ্ধান্তে বেঁচে থাকতে চায় সে যেন সাদা কাগজখানাই ভরে দেয়। চক্ষুলজ্জার প্রয়োজন নেই, কারণ—যারা নাম লেখাবে না তাদের অবিলম্বে এ য়ুনিট থেকে বদলি করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেব আমি।

তিন ঘণ্টা পরে বাইশখানি সীলমোহর করা খাম এসে পৌঁছল কমাণ্ডার ওনিশীর টেবিলে। খুলে দেখলেন তার ভিতর মাত্র দুখানি সাদা কাগজ। একখানিতে আবার একজন সর্তসাপেক্ষে যোগদান করতে সম্মত হয়েছে।

তাকেই প্রথম ডেকে পাঠালেন সেনাপতি। বাইশ বছরের সুদর্শন একটি বৈমানিক এসে দাঁড়াল। 'এটা জিমা'র নেভাল এ্যাকাডেমীর গ্র্যাজুয়েট, লেফটানেণ্ট উকিও সাকী। সামরিক অভিবাদন করল সে।

ঃ কী সর্তে তুমি কামিকাজে বাহিনীতে যোগ দিতে চাও লেফটানেণ্ট ?

ঃ আমাকে প্রথম আত্মঘাতী হবার সুযোগ দিতে হবে।

একটু থমকে গেলেন ওনিশী। এ জাতীয় প্রস্তাব আসতে পারে তা বোধহয় তিনি আশঙ্কা করেননি। বললেন, বাকি উনিশ জনের চেয়ে তোমার দাবী অগ্রগণ্য বলে মেনে নেব কোন্ বিচারে ?

জবাব দিতে একটু ইতস্ততঃ করল সাকী। চোখটা নেমে এল মাটির দিকে। তবু স্পষ্ট স্বরে বললে, স্যার, আমি জানি আমার চেয়ে দক্ষতর বৈমানিক আছে আমাদের য়ুনিটে। তাদের সার্ভিস্-রেকর্ড আমার চেয়ে ভাল—

ঃ তাহলে ?

ঃ পরের সপ্তাহে আমার ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা। তার আগেই—

করুণভাবে সে একবার তাকালো তার য়ুনিটের কমাণ্ডার তামাই-এর দিকে। দেখল, বেদনার্ত হয়ে উঠেছে তামাই-এর মুখ। তিনি এ্যাডমিরাল ওনিশীর দিকে ফিরে বললেন, আমি বুঝিয়ে বলছি। গত মাসে লেফটানেণ্ট সাকী ছুটি নিয়ে টোকিও যায়। সেখানে সে বিয়ে করেছে; কিন্তু জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে হনিমুনের আগে তাকে এখানেই ফিরে আসতে হয়েছে। আগামী সপ্তাহে সেজন্য ওর ছুটি মঞ্জুর হয়ে আছে।

কুলীশকঠোর কমাণ্ডার ওনিশী কবি। তাঁর অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠতে চাইছে। কিন্তু কোনরকম বাহ্য প্রকাশ হল না সে ভাবের। স্বাভাবিক স্বরেই বললেন, তোমার দাবী মঞ্জুর।

২৫শে অক্টোবর প্রথম 'কামিকাজে' দলের ছ-টি বিমান আকাশে উড়ল। দক্ষিণ মিরাণ্ডাও-এর দাভাও বিমান-বন্দর থেকে। দলের পুরোভাগে বাইশ বছরের তরুণ বৈমানিক লেফটানেণ্ট সাকী। রেডিওতে তার শেষ কণ্ঠস্বর ভেসে এল কণ্ট্রোল-টাওয়ারে—'ছ-খানা শত্রুপক্ষের এয়ারক্রাফ্ট্-কেরিয়ার আমাদের নজরে পড়েছে। সম্রাটের নাম নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ঐ সেই এয়ারক্রাফ্ট্ কেরিয়ার থেকে ওদের জঙ্গী-বিমান উড়ল।'

টোকিও শহরপ্রান্তে তখন সাকীর সদ্য-বিবাহিত বধূ বোধকরি তার হনিমুন কিমানোতে নক্সাকাটা ফুল সেলাই করছে।

মার্কিন বৈমানিকরা সেদিন একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। জাপানী ফাইটার প্লেনগুলো আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করল না।

পালাবার পথ তারা খুঁজল না। এ কী বে-আইনী যুদ্ধরীতি! একের পর এক তারা ঝাঁপ খেয়ে পড়ল যুদ্ধ-জাহাজগুলোর উপর। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তিন-তিনটে এয়ারক্রাফ্‌ট্‌-কেরিয়ার ধ্বংস হয়ে গেল মুহূর্তে। মার্কিন সমর-দপ্তর স্তম্ভিত! এ কী পাগলামি!

সে রাত্রে এ্যাডমিরাল ওনিশী তাঁর দিন-পঞ্জিকার পাতায় যে তানাকাটি রচনা করেছিলেন তাতেও লেগেছিল আগুনের ছোঁওয়া। সে আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠা শত্রুপক্ষের যুদ্ধ-জাহাজের আগুন নয়, প্রজাপতিরঙ লাল কিমানোর আগুন:

"বিহঙ্গ-বাসনা ব্যর্থ! আকাশেতে মেলি দিয়া পাখা
কেন রে ছোটাস্ তোর বিমান ও?
প্রতীক্ষিতা প্রেয়সীর স্বপ্নে তোর স্বর্গ আছে ঢাকা।
প্রজাপতিরঙ লাল কিমানো।"

একমাত্র ওকিনাওয়ারার যুদ্ধেই ১,৮০০ জন কামিকাজে আত্মঘাতী হয়। নিউইয়র্ক টাইমস-এর হিসাবমত এ-যুদ্ধে ১৬৪ খানি যুদ্ধ-জাহাজ কামিকাজের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল। আত্মসমর্পণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত রণাঙ্গণে মোট ২,৫১৯ জন কামিকাজে এইভাবে দেশের জন্য আত্মদান করে। এ্যাডমিরাল ওনিশী যুদ্ধক্ষেত্রের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঐ আত্মঘাতী বাহিনীর জন্য লোক সংগ্রহ করেছেন। তারা একের পর এক মৃত্যু বরণ করেছে। জাপান এশিয়া শাসন করতে চেয়েছিল কি না, তার পার্ল-হারবার আক্রমণ অযৌক্তিক কি না এসব প্রশ্ন ছাপিয়েও কি মনে হয় না, ঐ সব বৈমানিকদের উদ্দেশে আমাদের মাথার টুপি খোলা উচিত? ওনিশীর মাথা থেকেই ঐ পরিকল্পনার উদ্ভব। দিবারাত্র তিনি কামিকাজে সংগ্রহ করে চলেছেন। অথচ আশ্চর্য, —একান্তে ডায়েরিতে যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী:

"চেরিফুল যে হারিয়ে গেল আজ,
হারিয়ে গেছে ফুজিয়ামার বরফমোড়া তাজ।

ও কবি! তোর অঙ্গে এ কী সাজ।
মানুষ মারার কাজ!

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫-এ জাপ-সম্রাটের আত্মসমর্পণের বাণী রেডিওতে ঘোষিত হবার ঘণ্টা-ছয়েক পরে সংবাদটা এসে পৌঁছল পঞ্চম এয়ার ফ্লীট কমাণ্ডার এ্যাডমিরাল উগাকীর কাছে। ওঁর এ্যাডজুটেণ্ট যখন ছুটে এসে ঐ মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা দাখিল করল, উনি তখন ওঁর অধীনস্থ কামিকাজে-বাহিনীর সঙ্গে মিটিং করছিলেন। রিপোর্টটা বাড়িয়ে ধরে এ্যাডজুটেণ্ট বললে, স্যার, স্যার, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে!

মুহূর্তে লাফিয়ে ওঠেন উগাকী। কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর উবুড় করে রাখলেন। বললেন, আমি এ আদেশ এখনও দেখিনি। আমি এখনই প্লেন নিয়ে রওনা হব। কে কে আমার সঙ্গে শহীদ হতে চাও?

উপস্থিত প্রত্যেকটি বৈমানিক তাদের হাত তুলে সায় দেয়।

এ্যাডজুটেণ্ট ইতস্ততঃ করে বলে, স্যার, এটা আদেশ অমান্য করা নয়?

বজ্রদৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকিকে দেখলেন উগাকী। তারপর বললেন, আমার আদেশে হাজার হাজার কামিকাজে প্রাণ দিয়েছে! কোন্ মুখে তাদের পরিবারের সামনে গিয়ে দাঁড়াব আমি?

ধীরে ধীরে তিনি য়ুনিফর্ম থেকে প্রতিটি সম্মানসূচক সামরিক চিহ্ন খুলে ফেললেন। তুলে দিলেন সেগুলি তাঁর এ্যাডজুটেণ্টের হাতে। দেখাদেখি তাঁর বাহিনীর সবাই খুলে রাখল তাদের সামরিক সনাক্তকরণ চিহ্ন। তারপর ওরা একে একে উঠে বসল এক-একটি বিমানের ককপিটে। দল বেঁধে ওরা উড়ে চলল উৎসবমগ্ন মার্কিন নৌ-বহরের দিকে। ওরা কেউ আর ফেরেনি!

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় টোকিওর নির্জন গৃহে এ্যাডমিরাল ওনিশী ডেকে পাঠালেন তাঁর একান্ত সহচর এডিকং-কে। এতদিনে সামরিক প্রমোশন পেয়েছেন ওনিশী, এখন তিনি নেভাল জেনারেল স্টাফের

ভাইস-চীফ। যুদ্ধের অন্যতম কর্ণধার। নতমস্তকে এসে দাঁড়াল ওঁর একান্ত সহচর। বেতার-ঘোষণা সেও শুনেছে। ওনিশী ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন সীলমোহর করা একটি খাম। বললেন, এটা আমার স্ত্রীকে দিও।

তাতে আঁটা আছে ছোট্ট একটি ফটো, আর তাঁর শেষ তানাকা।

আর বাড়িয়ে ধরলেন তাঁর শেষ বাণী; বললেন—এটা থাকবে আমার ভস্মাধারে।

তাতে লেখা ছিল, "আমার ভূতপূর্ব অনুগামী বৈমানিকদলের আত্মার প্রতি আমার শেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা বীর, তারা মহৎ! যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মাধ্যমে আমি তাদের প্রতি এবং তাদের হতভাগ্য পরিবারবর্গের প্রতি ক্ষমাপ্রার্থী!"

এডিকং-কে সাক্ষী রেখে ওনিশী হারাকিরি করলেন।

আমূল ঢুকিয়ে দিলেন তাঁর সামুরাই তরবারি নিজ উদরদেশে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এল সবাই। ডাক্তার এলেন মরফিয়া ইনজেকশন নিয়ে--প্রত্যাখ্যান করলেন ওনিশী। এডিকং তাঁর সেই মর্মান্তিক মৃত্যু-যন্ত্রণার দৃশ্য সহ্য করতে পারল না—ছুটে এল রিভলভার হাতে। তাকেও বারণ করলেন। অস্ফুটে বললেন, আমাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে দাও। অসীম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! একমাত্র সান্ত্বনা!

ভাইস-চীফ ওনিশীর শেষ তানাকায় লেখা ছিল ঃ

"আজ যে ফোটে কাল সে তো হয় লীন,
জীবন—সে যে ফুলের মত ক্ষীণ!
ভাবছ কি তার গন্ধ অমলিন
রইবে চিরদিন?"

ভন ওয়েরার পলায়ন-কাহিনীটা এবার শেষ করি ঃ

সোয়ানউইক থেকে যে পাঁচজন সে রাত্রে পালিয়েছিল তাদের

প্রত্যেকেই চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর ধরা পড়ে আবার ফিরে আসে। তাদের প্রত্যেককে চৌদ্দ দিনের নির্জন কারাবাস দেওয়া হয়। একমাত্র ভন ওয়েরাকে ঐ নির্জন কারাবাস-অন্তে দীপান্তরে পাঠানোর কথা স্থির হল; ইংল্যাণ্ডে তাকে রাখা নিরাপদ নয়। 'ডাচেস্ অফ ইয়র্ক' জাহাজযোগে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল অতলান্তিকের ওপারে—কানাডায়। দেখা যাক এবার সে কেমন করে পালায়!

'ডাচেস্ অফ ইয়র্ক'-এ সর্বসমেত ১,০৫০ জন যুদ্ধবন্দী। তার ভিতর শুধুমাত্র ভন ওয়েরাকে পাহারা দেবার জন্যই তিনজন প্রহরী নিযুক্ত ছিল। ও যে কেবিনটায় থাকত তার সম্মুখে তিনজন বন্দুক-ধারী পালা করে পাহারা দিত। আশ্চর্যের কথা, সে কেবিন ছেড়ে আদৌ বার হয়নি। দিবারাত্র সে শুয়ে থাকত তার কেবিন-সংলগ্ন স্নানাগারের বাথটবে। বরফ-গলা জলে সেটাকে পূর্ণ করে। আত্মজীবনীতে সে লিখেছে—জাহাজটা কানাডার উপকূলে পৌঁছনোর আগেই সে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে বলে স্থির করে, তাই সমুদ্রের শীতল জলে সে শরীরকে সইয়ে নিচ্ছিল।

এগারো দিন পরে কানাডার হ্যালিফ্যাক্স বন্দরে এসে ভিড়ল জাহাজ ; কিন্তু অতন্দ্র প্রহরায় সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার সুযোগ পেল না ওয়েরা। হ্যালিফ্যাক্স থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন বন্দীদের নিয়ে রওনা দিল পশ্চিমমুখো। সমুদ্রোপকূল থেকে বহুদূরে জনমানবহীন তুষাররাজ্যের এক বন্দী-শিবিরে রাখা হবে ওদের। ট্রেনে উঠবার সময়েই প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালে টাঙানো মানচিত্রটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে ওয়েরা। কুইবেক, মনট্রিল পার হয়ে জন্সটাউনের কাছা-কাছি ট্রেনটা এসে পড়বে কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে। সেখান থেকে কানাডার সীমান্ত মাত্র ত্রিশ মাইল। সেণ্ট লরেন্স নদীর ওপারেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকা তখনও যুদ্ধে নামেনি, সেটা একটা নিরপেক্ষ রাজ্য। অর্থাৎ ভন ওয়েরার ভাষায়—মুক্ত পৃথিবী।

ট্রেনের প্রতিটি কামরায় তিনজন করে বন্দুকধারী প্রহরী। স্টেশানে গাড়ি দাঁড়ালে বন্দীদের নামতে দেওয়া হচ্ছে না। দরজায় তালা দেওয়া। জানালায় গরাদ নেই ; কিন্তু ডবল কাচের জানালা। জানুয়ারির শীতে বাইরে বরফ পড়ে জানালা জাম বেধে গেছে—ওঠানো বা নামানো যায় না। ট্রেনের ভিতর অবশ্য গরম হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা আছে। পুরো দেড়দিন ওয়েরা নিশ্চুপ বসে রইল। সহযাত্রীদের অনেকেই তাকে চেনে। কেউ কেউ তার নাম জানে। রেড-ডেভিল বা 'এস-অফ-স্পেডস্' নামে চেনে। তাদের মধ্যে একজন সকৌতুকে ওর কানে কানে বলে, তুমি কি এখনও পালাবার কথা ভাবতে পারছ ?

ওয়েরা বলে, ভাবছি। তবে এখনই নয়, ট্রেনটা জন্সটাউনের কাছে পেঁছিলে, তখন।

ওর সহযাত্রী বুঝে উঠতে পারে না—ও রসিকতা করছে কিনা।

কিন্তু রসিকতা আদৌ করেনি ওয়েরা। ট্রেনটা জন্সটাউনে এসে পেঁছিনোর ঘণ্টাখানেক আগেই সে একটি জানালার ভিতরের পাল্লাটা ইঞ্চিখানেক উঁচু করে দিয়েছে। ফলে কামরার গরম হাওয়ার সংস্পর্শে তিল তিল করে সেই জানালাটার বাইরের দিকের পাল্লার বরফ গলে যেতে থাকে। প্রহরীরা কেউ খেয়াল করেনি। ট্রেনটা জন্সটাউনে দাঁড়ালো। ওয়েরা ঠিক সেই জানালার নিচে গিয়ে বসল কম্বলমুড়ি দিয়ে। ট্রেনটা ছাড়বার মুহূর্তেই ওর সঙ্গী প্রহরীকে বললে, বাথরুমে যাব। প্রহরী তাকে সাবধানে নিয়ে গেল বাথরুমে। ঠিক তখনই ছাড়ল গাড়িটা। কয়েক সেকেণ্ড পিছন ফিরে ছিল প্রহরী। তারই ভিতর কাচের জানালাটা একবার মুহূর্তের জন্য উপরে উঠল আর নামল। তৎক্ষণাৎ চলন্ত ট্রেন থেকে বাইরের তুষারস্তূপে গড়িয়ে পড়ল কম্বল মুড়ি দেওয়া একটা মূর্তি। তখন ট্রেনটা সবেমাত্র প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসেছে। নরম তুষারস্তূপে ওর আঘাত লাগেনি মোটেই। ট্রেনটা চলে গেলে আকাশের তারার অবস্থান দেখে নিয়ে ও সোজা দক্ষিণদিকে হাঁটতে শুরু করে।

রাত তখন দশটা। প্রচণ্ড হাড়কাঁপানো শীত। তুষারপাত হচ্ছে কানাডায়। সমস্ত রাত হেঁটে সে মাইল ত্রিশেক পাড়ি দিয়ে এসে উপস্থিত হল একটা নদীর কিনারায়। ম্যাপে আগেই দেখা ছিল, বুঝল—নদীটা সেণ্ট লরেন্স। যার এ-পারে কানাডা, ও-পারে যুক্তরাষ্ট্র। নদী জমে বরফ। ওয়েরা হেঁটেই নদী পার হতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বেচারির, দেখা গেল ওপারে হাত-দশেক আন্দাজ অংশে নদী তখনও জমেনি। তুষারগলা খরস্রোত। ওয়েরা নদীর কিনারা ধরে হাঁটতে থাকে। ঘণ্টাখানেক সন্ধানের পর সে যা খুঁজছিল তার সন্ধান পায়—একটা প্রকাণ্ড চুরুটের আকারে জমাট-বাঁধা বরফের স্তূপ। কিছু শুক্‌না ডালপালা কুড়িয়ে এনে সে ঐ স্তূপের চারপাশে ছড়িয়ে আগুন জ্বালল। কিছুটা বরফ গলে যেতেই বার হয়ে পড়ল একটা উপুড়-করা নৌকো। দাঁড় ছিল নৌকোর তলাতেই। প্রচণ্ড শক্তিতে সে নৌকোটাকে সোজা করল, ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল নদীর কিনারায়। এরপর আর বেগ পেতে হয়নি। অনায়াসে সে পার হল সেণ্ট লরেন্স। নামল ওপারে। তখন সবে ঘোলাটে চোখ মেলে সূর্য উঁকি দিচ্ছেন।

তারিখটা ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৪১। ওয়েরা জানত না—জানবার কথাও নয়, ঠিক সেই সময়েই পৃথিবীর একেবারে উল্টোপ্রান্তে, ১৫০° ডিগ্রি তফাতে ওরই মত আর একজন পলাতক বন্দী ঠিক ঐ রকমই একটা বরফ-গলা নদী পার হবার চেষ্টা করছেন ভন ওয়েরার মত তিনিও মিত্রশক্তির চিহ্নিত পয়লা-নম্বর শত্রু। বরফ-গলা নদীটার নাম কাবুল, পলাতক বন্দীর নাম : জিয়াউদ্দীন।

আশ্চর্য ঘটনাচক্র!

ও-পারে কী একটা আধাশহর। নদীর এ-প্রান্তে পৌঁছেই ওয়েরা দেখতে পেল একজন তরুণী নার্সকে। সেই সাত-সকালে খুট্‌খুট্ হাইহিলে নৈঃশব্দকে মুখর করে চলেছেন হস্পিটাল ডিউটিতে।

ওয়েরা মাথার টুপি খুলে তাকে বাও করল। একগাল হেসে বললে, মাপ করবেন সিস্টার, এটা কি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র?

মেয়েটি দুর্ধর্ষ তরুণটিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, আপনি কি ভেবেছিলেন? মঙ্গলগ্রহ?

: আজ্ঞে না। আমি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম মাত্র। সেণ্ট লরেন্স নদীর এ-পারেও তো কোন কোন অংশ কানাডার অন্তর্ভুক্ত।

: এখানটায় নয়। এটা অগ্‌ডেনবার্গ, নিউইয়র্ক স্টেট। কোথা থেকে আসছেন আপনি?

বত্রিশপাটি দাঁত বার করে ওয়েরা বললে, ও-পার থেকে। আমি জার্মানীর এয়ারফোর্সের একজন অফিসার। আসলে আমি হচ্ছি··· না, না, হচ্ছি নয়, ছিলাম—একজন যুদ্ধবন্দী!

আমেরিকা তখনও যুদ্ধে নামেনি। পার্ল হারবারে তখনও 'টোরা-টোরা' শোনা যায়নি। ফলে আমেরিকা ছিল নিরপেক্ষ। কিন্তু ওয়েরা জানত না—তার অবস্থা আদৌ নিরাপদ নয়। ইতিপূর্বেই বিনা ভিসায় আমেরিকায় প্রবেশের অপরাধে একজন জার্মান পলাতক যুদ্ধবন্দীর তিনমাসের জেল হয়েছে, এবং কারাভোগের পরে তাকে পুনরায় কানাডায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। এমন মর্মান্তিক সংবাদটা জানা থাকলে ওয়েরা নিশ্চয় তার বত্রিশপাটি দাঁত বার করে সুন্দরী মেয়েটির কাছে ওভাবে আত্মঘোষণা করত না।

সৌভাগ্যবশতঃ ভন ওয়েরার ক্ষেত্রে তেমন কোন ব্যাপার ঘটেনি। তাকে রক্ষা করেছে তার সুনাম,—বলতে পারেন, দুর্নাম! মার্কিন ইমিগ্রেশন অথরিটি ওর আত্মঘোষণার কথা শুনে তাকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে গেল স্থানীয় থানায়। কিন্তু পূর্বেই সেখানে ভীড় জমিয়েছে মার্কিন সংবাদপত্রের প্রেস-রিপোর্টারের দল। ক্লিক্-ক্লিক্ ফটো উঠছে! নিউইয়র্ক থেকে জার্মান কন্সাল তৎক্ষণাৎ অগ্‌ডেনবার্গে তাঁর একজন বিশিষ্ট সহকারীকে পাঠালেন ওকে উদ্ধার করে আনতে। পাঁচ-হাজার ডলার বণ্ড দিয়ে জামিনে ওকে খালাস করে নিয়ে আসা হল নিউইয়র্কে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভন ওয়েরাকে নিয়ে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জার্মানীর সমস্ত সংবাদপত্রে ওর পলায়ন-কাহিনী ফলাও

করে ছাপা হচ্ছে। জার্মানীতে সে তখন একজন জাতীয় বীর। তার সংবর্ধনার জন্য জার্মানী প্রস্তুত। যুক্তরাষ্ট্রেও নানান পত্রিকায় ঐ দুর্ধর্ষ বৈমানিকের কীর্তি-কাহিনী ছাপা হচ্ছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট-এর কাছে এটা একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। ব্রিটেন ক্রমাগত কূটনৈতিক চাপ দিতে শুরু করল—ওয়েরাকে তাদের হাতে ফেরত দেওয়া হ'ক, সে পলাতক যুদ্ধবন্দী। কানাডা তার এম্ব্যাসীর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে জানালো ভন ওয়েরার বিরুদ্ধে তাদের গুরুতর অভিযোগ আছে—সে নাকি সেণ্ট লরেন্স নদীর ওপার থেকে রোয়িং-ক্লাবের একটি নৌকো চুরি করেছে! নগদ পঁয়ত্রিশ ডলার দাম! সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হলে একজন মার্কিন পত্রলেখক কৌতুক করে সম্পাদককে চিঠি লিখলেন: আপনারা দয়া করে কানাডা-সরকারকে জিজ্ঞাসা করুন ঐ পঁয়ত্রিশ ডলার ব্যাঙ্ক-ড্রাফট্-এ নিতে তারা রাজী আছেন কিনা। আমি নিজেই টাকাটা দিতে রাজী। কানাডা-সরকারের এতবড় লোকসানটা হতে দেব না, যদিও আমার বিশ্বাস স্রোতের টানে ঐ পরিত্যক্ত নৌকোটা ও-পারেই ফিরে গেছে।

একদিন ওয়েরাকে ডেকে পাঠালেন নিউইয়র্ক-স্থিত জার্মান কন্সাল-জেনারেল। বললেন, ওহে, খবর খারাপ। তোমার জামিনের পরিমাণ পাঁচ হাজার ডলার থেকে বাড়িয়ে হঠাৎ পনের হাজার ডলার করা হয়েছে।

ওয়েরা প্রশ্ন করে, শ্যাম-চাচার বুলিয়ান-মার্কেটে আমার দাম হঠাৎ তিনগুণ হয়ে গেল যে?

: আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের আঁতাত বেড়েছে। ওরা তোমাকে আবার কানাডায় ফেরত পাঠাবার তালে আছে।

: বলেন কি! তাহলে?

: তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ এফ. বি. আই. নজরে রাখছে। যে কোন মুহূর্তে তোমাকে গ্রেপ্তার করে সীমান্তের ওপারে পাঠানো হতে পারে। তুমি চট করে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে পারবে?

: এখনই! কিন্তু তারপর? জার্মানীতে ফিরব কি করে?

জার্মান কন্সাল ওকে একটি পাসপোর্ট ধরিয়ে দিলেন। বললেন, একজন ইটালিয়ানের পাসপোর্ট। ইটালিয়ান ভাষা জান?

ঃ কাজ চলা মত।

ঃ তাহলে এটার সাহায্যে রায়ো-ডি-জিনেরো চলে যাও। সেখান থেকে রোম। ইটালিয়ান তুমি—দেশে ফিরছ, কেউ সন্দেহ করবে না। আর ইটালি তো আমাদের মিত্রপক্ষ। ওখান থেকে বার্লিন যাওয়া তো ছেলেখেলা!

যে কথা সেই কাজ। স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড যাকে রুখতে পারেনি, এফ. বি. আই.-ও তাকে আটকাতে পারল না। ইটালিয়ানের ছদ্মবেশে ভন ওয়েরা রায়ো-ডি-জিনেরো, রোম ঘুরে এসে পৌঁছল বার্লিনে।।১৮ই এপ্রিল, ১৯৪১-এ। ঠিক তার পনের দিন আগে সেই জিয়াউদ্দীন—রোম-মস্কো ঘুরে এসে পৌঁচেছেন ঐ বার্লিনেই। ঐ ইটালিয়ান সেজেই। এবার জিয়াউদ্দীনের নাম ছিল ঃ ম্যাজোট্টা।

কূটনৈতিক কারণে ওয়েরার আগমন-সংবাদ প্রথমটায় গোপন রাখা হয়েছিল। পরে অবশ্য তাকে নিয়ে যথেষ্ট হৈ-চৈ হয়। মুলতবি সামরিক সম্মানসভাটা এতদিনে অনুষ্ঠিত হল। স্বয়ং গোয়েরিঙ ওকে সেই সম্মানপদক দিলেন। ফ্যুরার নিজে হাতে ওকে দিলেন 'নাইট্স্ ক্রশ' সম্মানপদক—ওর দুঃসাহসিক পলায়ন-সাফল্যের জন্য। ওয়েরা এরপর বন্দী-শিবিরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে। নানারকম পরিবর্তনের সুপারিশ করে। ইংরাজ ইণ্টারোগেটারদের কাছে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা অবলম্বন করে অনেক কিছু সংশোধন করায়। এরপর সে একটি গ্রন্থ রচনা করে জার্মান ভাষায় ঃ Meine Flucnt England—অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড থেকে আমার পলায়ন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—কবি এ্যাডমিরাল ওনিশী যেমন মানবিকতার উচ্চ মালভূমিতে দাঁড়িয়ে এই বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক অবক্ষয়ীরূপের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই ঐ দুর্ধর্ষ রেড-ডেভিল নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় তার অভিজ্ঞতার কথা ছিল। ইংরাজ জাতি এবং ইংরাজ অফিসারদের বিরুদ্ধে

কোনও জাতিগত বিদ্বেষের কথা বলেনি, সম্মান ও শ্রদ্ধা নিয়ে তাদের কথা লিপিবদ্ধ করেছিল। সবচেয়ে অবাক-করা খবর হচ্ছে এই যে, প্রকাশ-মাত্র তার গ্রন্থটি নাৎসী সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেন! অপরাধ: ওয়েরা শত্রুপক্ষের মহানুভবতাকে ছোট করেনি; জাতিগত বিদ্বেষ প্রচার করেনি। সবচেয়ে বড় অপরাধ: সে যুদ্ধান্তে মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল। নাৎসীশাসিত পৃথিবী নয়।

দেশে ফিরে আসার ছ'মাস পরে হল্যাণ্ডের উত্তরে উড়োজাহাজ ভেঙে পড়ায় ভন ওয়েরা জীবন্তে সলিল-সমাধি লাভ করে। বিশ্ব-এ্যাভিয়েশান ইতিহাসে ঐ সদাহাস্যময় ভন ওয়েরার স্থান হয়নি। কিন্তু নিউইয়র্কে পৌঁছে সে পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত হাক্‌নেলের সেই ডিউটি অফিসারকে যে কৌতুকপূর্ণ পোস্টকার্ডখানা লিখেছিল সেটি সযত্নে রাখা আছে যুদ্ধস্মৃতি যাদুঘরে। দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া, মৃত্যুঞ্জয়ী বৈজ্ঞানিকের কৌতুক শাশ্বত হয়ে রইল মহাকালের দরবারে—

"হাক্‌নেল বিমানবন্দরের সেই লালটুমার্কা
ফ্লাইং অফিসার-কাম এ্যাডজুটেণ্ট মহাশয়
সমীপেষু—

প্রিয় মহাশয়,

বন্ধুর অকৃত্রিম শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আশা করি শনিবার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪০-এর সেই অবিস্মরণীয় মধুর প্রভাতটির কথা ভোলেননি। নিউইয়র্ক একটা চমৎকার শহর। আমি কী করে এখানে নিরাপদে এসে পৌঁচেছি সেটা অনুমান করবার সুযোগ আপনাকে দিচ্ছি। বোধকরি আপনার প্রথম অনুমানটাই সত্য হবে। শীঘ্রই আপনার সাক্ষাৎ পাব বলে আশা রাখি। আপনার প্রতি শুভেচ্ছা রইল। চিয়ারিও!

ইতি—
ফ্রাঙ্ক ভন ওয়েরা, অর্থাৎ ভূতপূর্ব: ক্যাপ্টেন ভ্যান লট্।
নিউইয়র্ক, ২২শে ফেব্রুয়ারি।"

এ কী শুধুই কৌতুক? আমার তো মনে হয়, তা নয়। ওর 'অকৃত্রিম শুভেচ্ছা' সত্যই আন্তরিক।

ফ্রম এ স্পোর্টসম্যান টু এ স্পোর্টসম্যান।

ইংলিশ চ্যানেলের উপকূল থেকে মাইল পনের দূরে ক্যাপ্টেন হিলারীর প্লেনখানাকে জ্বলন্ত অবস্থায় পড়তে দেখেছিল জনাকয়েক জেলে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে আসছে, তবু কয়েকজন মৎস্যজীবী মাছ ধরার নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। আগেই বলেছি, জ্ঞান হারাবার পূর্বমুহূর্তে হিলারীকে ওরা জল থেকে টেনে তোলে। উপকূলের একটি ছোট হাসপাতালে তার প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ওকে নিয়ে আসা হল লণ্ডন হাসপাতালে। দীর্ঘদিন সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। জ্ঞান হওয়ার পরে সে অনুভব করল তার দুটি চোখ আর মুখ ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। জ্ঞান ফিরেছে, চোখে ব্যাণ্ডেজ—নার্সের কাছে শুনল ও আছে লণ্ডন হাসপাতালে। জিজ্ঞাসা করল, আমাকে কেউ দেখতে আসেনি?

: এসেছিল তো! তোমার মা-বাবা দুজনেই এসেছিলেন।

: মা কি খুব কাঁদছিল?

: না না। তিনি খুব সংযত ছিলেন। হাজার হ'ক তিনি তো তোমার মা!

: তার মানে? তুমি কি ভাব আমি মস্ত বীর?

: বীর নয়! এই বয়সেই 'জেরি'দের সঙ্গে আকাশযুদ্ধ করছ তুমি!

: আমার বয়স কত হবে বল তো!

: বাইশ-তেইশ!

: ঠিক বলেছ। তা তোমার বয়স কত?

: মেয়েদের বয়স বুঝি জিজ্ঞাসা করতে হয়?

: হয়! যখন সেই মেয়ে কারও চোখ বেঁধে রাখে! তোমার নামটা কি?

: আমার নাম নার্স।

: না। তোমার পরিচয় চাইছি না। নাম—

: আমাকে 'সু' বলে ডেক।

আরও দু-সপ্তাহ ওর চোখ বাঁধা থাকল। হাতেও ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। এরই মধ্যে ওর মা-বাবা আবার এলেন দেখা করতে। এল ছোট বোনও। ও তাদের কণ্ঠস্বর শুনল, হাতের স্পর্শ পেল, চোখে দেখতে পেল না।

তারপর একদিন ওর চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। হারিয়ে-যাওয়া পৃথিবীকে আবার দুচোখ মেলে দেখল হিলারী। ব্যাণ্ডেজ খুলে দেবার পর এই প্রথম 'সু'-কে দেখল। অবাক বিস্ময়ে বললে, সু! তুমি তো কখনও বলনি তোমার চোখ এত নীল!

লজ্জা পেল সু। বললে, সেটা আবার একটা বলবার মত কথা নাকি?

সু ওরই বয়সী। কি জানি কেন সু সময় পেলেই ওর কাছে এসে বসে। ওর অভিজ্ঞতার কথা শোনে। ওর কলেজ-জীবনের কথা, বাইচ-প্রতিযোগিতার গল্প, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। নিজেও শোনায় তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কত জাতের কত রোগী দেখেছে সে। যুদ্ধ একটি অভিশাপ নিয়ে এসেছে। হাসপাতালে নিত্য স্থানাভাব। ডাক্তার-নার্সের দল ডব্‌ল্ ডিউটি করেও কাজ শেষ করতে পারছে না। তবু ওরই মধ্যে সময় করে সু এসে বসে হিলারীর কাছে। বলে, তুমি তোমার অভিজ্ঞতার কথা ডায়েরিতে লেখ! খুব উপভোগ্য হবে সেটা!

হিলারী বলে, একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসি আগে।

হিলারী এই সময়ে তার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে। সেটা তার ভাষাতেই আক্ষরিক অনুবাদ করি:

"লণ্ডন হাসপাতালে পৌঁছেই আমি ক্লান্তিতে অজ্ঞান হয়ে যাই। হাউস-সার্জেন আমাকে ঐ সময়ে এ্যানাসথেটিক দেয় এবং আমার

বাঁ হাত থেকে ট্যানিক এ্যাসিড অপসারণ করে। আমার অচৈতন্য অবস্থার ভিতরেই আমি পীটার পীসকে মরতে দেখি ঃ

"সে একটি জার্মান জঙ্গী-বিমানের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছিল তার কক্‌পিটে। তার হাসিটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোথা থেকে একটা জার্মান messerschmitt বিমান তার পিছন দিক থেকে ছুটে এল। আমি আপ্রাণ চীৎকার করে উঠলাম—পীটার সাবধান, পিছন দিক দেখ। ও শুনতে পেল কিনা জানি না। মেসার্চমিট বিমান থেকে হঠাৎ অগ্নিবর্ষণ হল, পীটারের বিমানটি উল্টে গেল—আর সোজা নেমে গেল পৃথিবীর বুকে। যখন জ্ঞান ফিরে এল দেখলাম আমার দুটি হাত দুজন নার্স ধরে আছে। আর ডাক্তারবাবু আমার দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। তাঁদের কাছে পরে শুনেছি আমি স্বপ্নের মধ্যে সত্যই চীৎকার করে উঠি—Peter, for God's sake, look out behind.

"দুদিন পরে কলিনের চিঠি এল হাসপাতালের ঠিকানায়। লিখেছে, তুমি এতদিনে বোধহয় ভাল হয়ে উঠছ। আর লিখেছে, পীটার ঐভাবেই মারা গেছে।"

হিলারী দিন-পঞ্জিকায় দিনের পর দিন তার হাসপাতালবাসের দিনগুলির কথা লিখে গেছে। লিখেছে—রাতের পর রাত জার্মান বোমারু-বিমানের দল নির্বিচারে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যেত। একদিন মনে আছে, সু আমাকে কি একটা ওষুধ খাওয়াবে বলে কাছে এসেছে। হঠাৎ দূর থেকে একটা শত্রু-বিমানের শব্দ পাওয়া গেল। দূর থেকে পর-পর কয়েকটা প্রচণ্ড ইন্‌সেন্‌ড্রিয়ারি বোমার শব্দ ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে। প্রথম বিস্ফোরণ বেশ কয়েক মাইল দূরে, দ্বিতীয়টা বেশ কাছে, তৃতীয়টা যেন হাসপাতালের ঠিক বাইরে। হঠাৎ সু ভয় পেয়ে আমার বুকের উপর উবুড় হয়ে পড়ল। ওর হাতের ওষুধটা পড়ল ছিটকে। ভাগ্যক্রমে চতুর্থ বোমাটা পড়ল না। সু লজ্জা পেয়ে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। সলজ্জে বলল, ওষুধটা পড়ে গেল।

আমি কাউণ্টার থেকে আবার দু-বোতল বিয়ার আনতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই টের পেলাম 'ও' আসছে! আকাশ থেকে শূন্যমার্গে এঞ্জিনের হুইসিলের মত শীৎকার মুখে নিয়ে সে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। বার-মেডটা লাফ দিয়ে নামল টেবিলের নিচে। আমি মেঝেতেই উবুড় হয়ে পড়লাম দুহাতে কান ঢেকে। তবু প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যেন আমার কানের পর্দা ছিঁড়ে গেল। ভাঙা কাচের শব্দ। কোথায় একটা দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে পড়ল, আমার মাথার উপর দিয়ে সুইংডোরের একটা পাল্লা ছুটে বেরিয়ে গেল। ঝন্‌ঝন্ শব্দে একটা মদের আলমারি আছাড় খেল মেঝেতে।

একটু পরেই উঠে দাঁড়ালাম। দেখাদেখি সকলেই উঠল। পারল না শুধু ঐ বার-মেড। সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাকে স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে গেল। আমি 'বার' থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেখি দরজাটা নেই। প্রবেশ-পথের সমস্ত প্রাচীরটাই এখন খোলা প্রস্থান-পথ। রাস্তায় বেরিয়ে পথে এসে দাঁড়াতেই কে যেন আমাকে বললে, আপনার যদি জরুরী কাজ কিছু না থাকে তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করবেন? পাশের বাড়িতে বোমাটা পড়েছে। বোধহয় কেউ ওখানে চাপা পড়েছে।

তাকিয়ে দেখি হেলমেট মাথায় একজন ওয়ার্ডেন। অক্সিলারী ফায়ার সার্ভিসের। আমি এবং আমার ট্যাক্সি-ড্রাইভার দুজনেই হাত লাগালাম। আরও কারা যেন আমাদের সঙ্গে ঐ ধ্বংসস্তূপ সরাচ্ছিল। তারা কে, কোথা থেকে এল জানি না। আমরা প্রায় আধঘণ্টা অন্ধকারে কাজ করে ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে উদ্ধার করলাম চাপা পড়া মানুষটাকে। প্রথমে একখানা পা। মেয়ের পা। তারপর বের হল তার সমস্ত শরীরটা। মধ্যবয়সী একটি মহিলা; না, মহিলা নয়—মা! খাটের উপর উবুড় হয়ে শুয়ে ছিল সে। তার বুকের তলা থেকে বার হল তার সন্তানটি। অত্যন্ত সাবধানে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে আনল ওয়ার্ডেন। বাচ্চাটা অনেকক্ষণ মারা

গেছে। তার মায়ের জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমেই সে হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে খুঁজল। তারপর বুকফাটা হাহাকারে ভেঙে পড়ল। ও বুঝতে পেরেছে ওর বাচ্চাটার কী হয়েছে! আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য হাতটা ওর মাথায় বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। ও জলভরা দুচোখ মেলে এতক্ষণে আমাকে প্রথম দেখল—এবং দেখেই আঁৎকে উঠল!

আমার খেয়াল ছিল না। এতক্ষণে মনে পড়ে গেল—আমার মুখটা ওরাঙ-ওটাঙের মত হয়ে গেছে! অন্ধকারে এ মুখ দেখলে লোকের আঁৎকে ওঠারই কথা! আমি আজ কোয়াসিমোদো!

দুহাতে মুখটা ঢেকে আমি বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। আমার ছুটতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু দ্রুতপদে আমি হাঁটতেই থাকি।

বুঝতে পারছি—আমার সব কিছু বদলে যেতে শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, আমার অন্তরলোকে তিল তিল করে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে আমার জীবনদর্শন! অন্ধ আক্রোশে আমি ফুঁসছি! ঐ মেয়েটির মৃত্যু—তার সন্তানের এই মর্মান্তিক মৃত্যু একটা অন্যায়, একটা অপরাধ, একটা পাপ।

হিলারী এরপর তার দিন-পঞ্জিকায় লিখছে—"That that woman should so die was an enormity so great it was terrifying. It was not just the German bombs, or the German Air Force, or even the German mentality, but a feeling of the very essence of anti-life that no words could convey. This was what had filled me with unutterable rage. For I had recognised in that moment what Peter and the others had recognised as evil and to be destroyed utterly. I saw now that it was not crime, it was evil itself. With awful clarity I saw myself suddenly as I was. Great God, that I could have been so self-centred, so arrogant!"

ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে মৃতসন্তান-ক্রোড়ে মুমূর্ষু জননীকে উদ্ধার করে হিলারীর দৃষ্টির পূর্ণ পরিবর্তন হল। দিন-পঞ্জিকায় ও বলল—আমার এ যুদ্ধ জার্মান বোমার বিরুদ্ধে নয়, জার্মান বিমান-বহরের বিরুদ্ধেও নয়, এমন কি নাৎসী জীবনদর্শনের বিরুদ্ধেই শুধু নয়—মানুষের বাঁচবার অধিকারকে যারা তুপায়ে মাড়িয়ে যেতে চায় তারাই আমার শত্রু! পীটার একদিন যীসাস্-এর কথা বলেছিল, তখন তাকে আমি ব্যঙ্গ করে হেসে উঠেছিলাম। আজ আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি আবার আকাশে উড়ব! আবার লড়ব! যারা আমার তুনিয়াকে বিষবাষ্পে পঙ্কিল করে তুলছে তাদের বিরুদ্ধে আমার আমৃত্যু সংগ্রাম! আমাকে ওরা ওরাঙ-ওটাঙের বাচ্চায় পরিণত করেছে বলে প্রতিশোধ নিতে নয়—যারা প্রাক্তন-আমার মত সুন্দর তাদের সুন্দরভাবে বাঁচবার সুযোগ দিতে মরতে হবে আমাকে! যীসাস্ তুমি করুণার অবতার! তবু তুমি এ যুদ্ধে আমার সহায় হও!

—উনিশ শ' তেতাল্লিশে ওর সেই ওরাঙ-ওটাঙের মত মুখের উপর কফিনের কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। বিমান-যুদ্ধেই হিলারী প্রাণ দেয়।

* * *

কবি ওনিশী তাঁর তানাকায়, ভন ওয়েরা তার বাজেয়াপ্ত-স্মৃতিচারণে এবং ক্যাপ্টেন হিলারী তার মরণোত্তর গ্রন্থে আমার স্বপ্ন-সমস্যার শেষ সমাধান করে দিয়ে গেছে। আমিও আজ বুঝতে পারছি—কেন দেখি আকাশে ওড়ার ঐ অদ্ভুত স্বপ্ন!

মানুষ আকাশ ছেড়ে এতদিনে মহাকাশ জয় করতে ছুটেছে। তা ছুটুক! আমার সে হিসাবে কোন প্রয়োজন নেই। কবি ওনিশীই তো বলে গেছেন—'বিহঙ্গ বাসনা বৃথা!' মানুষ চায় বাঁচতে, ভালভাবে বাঁচতে, সকলকে নিয়ে বাঁচতে। আনন্দের অভিসারী সে—আর সে আনন্দ মিশে আছে ধরণীর প্রতি ধূলিকণায়, আকাশে নয়। আকাশ জয় করতে চেয়েছিলাম শুধু আরও ভালভাবে

বাঁচতে। বিবর্তনের তাগিদে। আমি না উড়তে শিখলে—ওরা তা শিখত।· আকাশ পথে উড়ে এসে ওরা আমাদের বধ করত। ওরা কারা? ওনিশী, ওয়েরা, হিলারী নয়—তারা সবাই আমার বন্ধু। শত্রু হচ্ছে ঐ যারা যুদ্ধ বাধায়—মানুষকে শাসন করবার লোভে, মানুষকে অত্যাচার করবার বাসনায়, মানুষকে পদদলিত করে রাখার অভিলাষে। তারা ইংরাজ, জার্মান, জাপানী নয়—ওভাবে তাদের জাত নির্ণয় হয় না; তাদের জাত নেই—সারা দুনিয়ায় তাদের একটিমাত্র জাত—তারা বজ্জাত! তাই হিটলার, মুসোলিনি, তোজো, আইসেনহাওয়ার আর চার্চিলই শুধু নয়, তাদের পিছনে সার দিয়ে দাঁড়ানো মিলওনার আর মিলিওনেয়ার আমাদের শত্রু; —যারা যুদ্ধাস্ত্র বেচে ব্যবসা চালায়, মানুষের কপালের ঘাম আর বুকের রক্ত যাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আভিজাত্যের পুঁজি।

এ সত্যটা আমরা সেবার বুঝে উঠতে পারিনি, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা হেরে গেছি। আমি ওনিশী-উগাকী-ওয়েরাদের কথা বলছি না, বলছি পীটার পীস, কলিন্স আর হিলারীদের কথাও। জাত-জালিয়াতের দল তাই আজও দেশে-দেশে বিভেদ জিইয়ে রেখেছে, যাতে ওদের ফলাও ব্যবসাটা বন্ধ না হয়ে যায়! ব্যবসা ওদের চলেছে ঢালাও—তার কিছু কিছু আভাস ভেসে আসছে ঐ কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, চিলি, কিংবা কিউবা থেকে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনাগত—সে যুদ্ধে যদি ঐ Last Enemy-কে আমরা ঠিকমত চিনে নিতে পারি, সেদিন যদি ঐ ওনিশী-হিলারী-ওয়েরা-উগাকী আর পীটার পীস-এর দল একই স্কোয়াড্রনে পাশা-পাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারে তাহলে থমকে যাবে ঐ তোজো-চার্চিল-আইসেনহাওয়ার-হিটলারের দল! যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সেদিন ক্যালে-লিলিয়াঁথাল-রাইট ব্রাদার্স-এর উত্তর-সাধকেরা। তাহলেই সার্থক হবে শত-শহীদের আকাশজয়ের সাধনা।

সেদিন তাহলে আর অমন করে ব্যর্থ হবে না এই বিহঙ্গ বাসনা।